স্বর্গোদ্দেশে।

—:*:—

শরৎ ও পূর্ণচন্দ্র,

আজ কত দিন হইল, তোমরা এই ক্ষুদ্র পঙ্কিল পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া, ঐ সুদূরবর্ত্তী নক্ষত্রমণ্ডলীতে পরিভ্রমণ করিতেছ। হয়ত তোমরা এ পাপ পৃথিবীর পাপ কথা ভুলিয়া গিয়াছ। এখন হয়ত তোমরা সেই স্বর্গস্থিতা পবিত্রা দেবী ভুবনেশ্বরীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অসার সংসারের মায়াকে চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির গর্ভে নিমগ্ন করিয়াছ। কিন্তু এ জড় হৃদয়ের স্মৃতিপটে, তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা দ্বারা তোমাদের প্রতিকৃতি, সে পূর্ব্বকথা, সে সমুদায় কে যেন এ জন্মের মত অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এত বৎসরের বর্ষাধারেও সে জ্বলন্ত ছবি ধুইয়া গেল না। ধন্য রে স্মৃতি! তোকে সঙ্গে লইয়া কতরাত্রি নীলাকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। বড় বড় দুইটি নক্ষত্রের একত্র সমাবেশ দেখিলেই মনে হইত যেন, তোমরা যুগলরূপে উদিত হইয়া স্বর্গের শোভা বিকীর্ণ করিতেছ। তোমরা কি কখন আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়াছ? স্মৃতির চিহ্নস্বরূপ, তোমাদের নাম এই ক্ষুদ্র সামান্য পুস্তকের শীর্ষে দিয়া, আজ যেন, হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিলাম। ইতি—

চন্দননগর ও
হাজারিবাগ,
খৃষ্টাব্দ ১৯১২। | শ্রীহরিপদ ঘোষ।

অশুদ্ধি-শোধন পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬	১	ওই তালিতে	ও ইতালিতে
৩২	১০	যে	সে
৪১	৪	জনাম	জর্নাল
৭৩	২১	মাঠের	বনের
৯৩	৩	নঃ সন্তান	নিঃসন্তান
৯৭	৩	তাহা	তাহাকে
১০৩	২	অট্টালিকা	অট্টালিকাময়
ঐ	২৪	দশের	দেশের
১০৯	৪	কার	প্রকার
১১৯	১৪	পেমে	প্রেমে
১২১	২	সোপনে	সোপানে
ঐ	৮	পরিমত	পরিমিত
১২৮	১৬	বশ্বের	বিশ্বের
১৩১	৬	আবার এ সরাজে	এসরাজে
১৩৭	২৪	লল	লাল
১৪৬	১৩	কার	কারা
১৬৩	১৩	চক্ষে	চক্ষের
১৬৭	২০	কো য়	কোথা
১৭৬	১৯	দিল তখন	দিয়া
২৩৪	১	এ	ও
২৪৭	০	চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ *
২৭১	২১	প্রণয়-বিপণি	প্রণয় বিপণি
৩২০	৮	রামনারায়ণ	ব্রজেশ্বরী, রামনারায়ণ

* একটী পরিচ্ছদের সংখ্যা ভুল হওয়াতে অবশিষ্ট সমুদয় গুলির সংখ্যা ভুল হইয়াছে, তাহাতে পাঠের কোন ব্যাঘাত হইবে না। আরও অনেক ক্ষুদ্র ভুল রহিয়া গেল, তাহা সংশোধন অনাবশ্যক মনে হইল।

শরতের পূর্ণচন্দ্র।

প্রথম খণ্ড।

বাল্য-জীবন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এ সংসারে আমি কে?

যে স্থানে সুবর্ণরেখা নদী বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত প্রশস্ত রাজপথে মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমের অনতিদূরে জলেশ্বর নামে একটী গণ্ড-গ্রাম আছে; গ্রামের তিনদিকে গভীর বন। পশ্চিম ও উত্তর দিকে এই বন পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতে মিলিত হইয়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্য অবধি বিস্তৃত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া উক্ত রাজপথ মেদিনীপুর ও বালেশ্বর হইয়া কটকে উপস্থিত হইয়াছে; তথায়, দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক শাখা পুরী ও অপর শাখা সেতুবন্ধ রামেশ্বর অবধি চলিয়া গিয়াছে। রেল

হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে দোল ও রথযাত্রা উপলক্ষে সহস্র সহস্র স্ত্রী ও পুরুষ সাধারণতঃ পদব্রজে এই রাজপথে পুরী যাইতেন। এই গ্রামে রামনারায়ণ ও তাঁহার কনিষ্ঠ শ্যামনারায়ণ নামে দুইজন ক্ষত্রিয় বাস করিতেন। রামনারায়ণের এক স্ত্রী ও এক পুত্র। পুত্রের বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চদশ বৎসর। শ্যামেরও এক স্ত্রী ও এক পুত্র, অধিকন্তু এক অবিবাহিতা কন্যা ছিল। রামনারায়ণ সঙ্গতিপন্ন লোক। ইংরেজী কিছু জানা ছিল। এইজন্য ইংরেজদিগের প্রথমাবস্থায় "জলকে দুধ ও দুধকে জল" বুঝাইয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করেন। স্ত্রীর নামে দুইখানা তালুক ক্রয় করেন। লোকটী বেশ চতুর, পাছে সহোদরকে বিষয়ের অংশ দিতে হয়, এইজন্য পূর্ব্ব হইতে সাবধান হন। এই কারণ বশতঃ জ্যেষ্ঠের সহিত কনিষ্ঠের মনান্তর হয়। রামনারায়ণ কোন কার্য্য করিতেন না, বাটীতে বসিয়া থাকিতেন এবং স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির 'দোহাই' দিয়া, এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

শ্যামনারায়ণ একে দুঃখী তাহাতে আবার নির্ব্বোধ। লেখা পড়া নাম মাত্র জানিত; সুতরাং অতি কষ্টেই জীবন যাপন করিত। এ হেন অবস্থায় স্ত্রী আবার কুটিলা। যাতার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সর্ব্বদা হিংসা করিত। স্বামীর সহিত তুমুল কলহ করিত। একদিন রামের স্ত্রীর এক নূতন অলঙ্কার দেখিয়া স্বামীকে কতই তিরস্কার করিল। এইরূপ পুরুষ প্রায়ই স্ত্রীর অতিশয় বাধ্য হইয়া পড়ে। দিনের মধ্যে শ্যামকে দশবার নাকে 'খৎ' দিতে হইত। স্ত্রীর খর্ব্ব নাসিকার উপর সুবৃহৎ নতের তাড়না সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, শ্যাম নাকি কন্যাকে বিক্রয় করিয়া বিলাসিনীর মনোরথ পূর্ণ করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিল। অগত্যা পত্নী তাহাতেই আশান্বিতা হইতে আপনাকে বাধ্য করিয়াছিল।

রামের পুত্রের নাম রতিকান্ত। রতির গঠন প্রণালী অতি চমৎ-

কার, তাহার বুদ্ধি অতিশয় প্রখর। সে স্থানীয় একটী বিদ্যালয়ে পড়িত। এই সুকুমার বয়সে, বাঙ্গালা সংস্কৃত ও ইংরাজীতে অনেকগুলি পুস্তক শেষ করিয়াছিল। শ্যামের পুত্র, রতির সমবয়স্ক; কিন্তু মা সরস্বতীর এমনই অনুগ্রহ যে, তাহার 'রামখড়ীর মুখ দিয়া 'ঞ'র ছবি আর কিছুতেই বাহির হইল না। শ্যাম-পত্নীর এ ক্ষোভ রাখিবার স্থান ছিল না। রতির রূপ গুণ দেখিয়া তাহার হৃদয়ে প্রবল ঘৃণা ও হিংসা উপস্থিত হইল।

এক দিন রামনারায়ণের স্ত্রী পদ্মমুখী প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একজন পরিচারিকা সম্মুখে উপস্থিত হইল। পদ্মমুখী ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"ক্ষান্ত, মা ভাল আছেন ত ?"

ক্ষান্ত। তিনি ভাল আছেন, কিন্তু তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন, তাই তোমায় লইয়া যাইতে আমায় পাঠাইয়া দিয়াছেন।

পদ্ম। অনেক দিন বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছি, মাকে দেখিতে বড়ই সাধ হইয়াছে। ক্ষান্ত, মায়ের জন্য আমার প্রাণ সর্ব্বদাই কেমন করে, কিন্তু কি করিয়া সংসার ফেলিয়া যাই ? শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, ছেলেটী পড়িতেছে ; আমি গেলে হয়ত তাহার পড়া বন্ধ হইবে। যাই হো'ক্ কর্ত্তা আসুন, জিজ্ঞাসা করি।

ক্ষান্ত। মার বড় ইচ্ছা তোমায় একবার দেখেন, আর বয়স অধিক হ'য়েচে কিনা, তাই বলেন—"কখন আছি, কখন নেই, যদি পদ্মর মুখ দেখিয়া মরিতে পারি, তা'হলে মরণে আমার সুখ হয়।"

পদ্মমুখী কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন,—এমন সময়, কাশিতে কাশিতে, কর্ত্তা বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। ভ্রাতৃবধূ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিল, শব্দ শুনিবামাত্র গৃহমধ্যে দৌড়িয়া প্রবেশ করিল। পত্নী ঘোম্‌টা টানিয়া বলিলেন,—

"মা যে নিয়ে যেতে লোক পাঠাইয়াছেন ?"

"হ্যাঁ—কে এসেছে ?"

"এই যে, ক্ষান্ত।"

"কেমন ক'রে যাওয়া হ'বে। এ সংসার দেখিবে কে ? আর তুমি গেলেই যে রতির পড়া বন্ধ হয়।"—এই বলিতে বলিতে শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পদ্মমুখীও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর, কর্ত্তা বলিলেন,—"যদি নিতান্তই যেতে হয়, তা যাও, তবে তুই সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

পদ্ম। তুমি যখনই লোক পাঠাইয়া দিবে, তখনই চলিয়া আসিব। বাড়ী ছাড়িয়া কি আমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব ?

রাম। বেলা ত প্রায় যায়, শীঘ্র তৈয়ারী হ'য়ে পড়।

পদ্মমুখী স্মিত মুখে চুল বাঁধিয়া লইলেন। সাজ সজ্জারও ত্রুটী হইল না। পাল্‌কী চড়িয়া বাহকের স্কন্ধে ভর দিলেন। অমনি 'হুঞ্জর-হুঞ্জর' শব্দ করিতে করিতে শিবিকা চলিয়া গেল। যাইবার সময় পদ্মমুখী দেবর-পত্নীকে মিষ্ট সম্ভাষণ করিতে ভুলিয়া গেলেন না।

সন্ধ্যার সময় রতিকান্ত বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া 'মা-মা' বলিয়া ডাকিতে লাগিল। পিতা আসিয়া পুত্রকে সস্নেহে আহারীয় দ্রব্য দিলেন এবং রতির প্রশ্নোত্তরে তাহার মাতা কোথায় গিয়াছেন তাহার সম্বাদ দিলেন। সহসা যেন রতিকান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল, কিন্তু পিতার স্নেহালিঙ্গনে শীঘ্রই প্রফুল্লচিত্তে পাঠে মনোনিবেশ করিল।

একদিন দুইদিন করিয়া এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। একদিন রতিকান্ত বিদ্যালয়ে চলিয়া গিয়াছে, রামনারায়ণ আহারের পর গৃহমধ্যে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্রকূট সেবন করিতেছেন, এমন সময় ক্ষান্তদাসী বিষণ্ণমুখে বাটী প্রবেশ করিল। কর্ত্তা হুঁকা ত্যাগ করিয়া

ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসিলেন,—"সংবাদ কি ? সকলে ভাল আছে ত ?" দাসী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"দিদিঠাকুরাণীর বড় ব্যারাম—জ্বর বিকার—তোমাকে এখনই যাইতে হইবে ?"

অকস্মাৎ যেন রামের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল। মুখ শুকাইয়া গেল, ভাবী অমঙ্গলে মন পূর্ণ হইল। সবিষাদে বলিলেন,—"বলিস্ কি—আজ কয় দিন হইল ?"

ক্ষান্ত। আজ তিন দিন।

রাম। তবে এতদিন সংবাদ দিস্ নাই কেন ?

ক্ষান্ত। এতদিন ত বাড়াবাড়ি হয় নাই, কাল রাত্রে জ্বর ভারি বৃদ্ধি হইয়াছিল। দিদি একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। চোক কপালে উঠিয়া গেল। ভুল বকিতে লাগিলেন। তাই, মা—তোমার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

রাম। মহামুস্কিল যে ক্ষান্ত! দেখিতেছে কে ?

ক্ষান্ত। সেখানের এক বৈদ্য। তোমাদের গ্রামের কবিরাজকে সঙ্গে নিতে হ'বে।

কর্ত্তামহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া বহুকালের একযোড়া পুরাতন নাগরা জুতা বাহির করিলেন। ধূলি-পটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকাতে, জুতার রং যে কিরূপ তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। মনের এমন্ আবেগ যে, জুতা ঝাড়িতে হইবে, তাহা স্মৃতিপথে উদয় হইল না। একটী মান্ধাতা-আমলের জীর্ণ জামা গায়ে দিলেন। চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া জুতা পায়ে দিলেন। 'শ্রীহরি-শ্রীহরি' নাম করিতে করিতে প্রাঙ্গণে নামিলেন। ভ্রাতৃবধূ গৃহমধ্যে ছিল, এইজন্য আকাশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"রতি গৃহে রহিল, তাহার যেন কোন অযত্ন হয় না। আমি এখন চলিলাম, কাল সন্ধ্যার

আগে নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব।” এই বলিয়া গমনোন্মুখ হইয়াছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে এক গোধিকা “টিক্ টিক্” শব্দ করিয়া উঠিল। রাম আর কথা বার্ত্তা না কহিয়া এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সজোরে দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণেক পরে উঠিয়া পুনরায় দেবতার নাম স্মরণ করিলেন। বিষণ্ণচিত্তে ক্ষান্তকে বলিলেন,—“কি জানি—কপালে কি আছে।” অনতিবিলম্বে তিনি বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

এদিকে রতিকান্ত বাটীতে প্রবেশ করিয়া পিতাকে না দেখিয়া পিতৃব্যাণীকে কহিলেন,—“কাকী মা, বাবা কোথায় ?”

পিতৃ। তোমার মামার বাটী চলিয়া গিয়াছেন ; তোমার মা বোধ হয় এযাত্রা রক্ষা পাইবে না। ভারি ব্যারাম—অজ্ঞান অভিভূত —

রতি আর স্থির হইয়া শুনিতে পারিল না। জলে দুই চক্ষু ভাসিয়া গেল। পিতৃব্যাণী সময় পাইয়া ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—“এত কান্না কেন বাছা, আপনার মার ব্যারাম হ'লে, এ কলিকালে ত কেহ এমন ভাবে অস্থির হইয়া উঠে না।—তোমার বাছা সব অতিরিক্ত।” সুকুমার বালকের হৃদয়ে আজ এই বাক্যগুলি নিদারুণ ব্যথা প্রদান করিল। মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে অন্যত্র উঠিয়া গেল। আজ যে এইকথা নূতন শুনিল তাহা নহে। অনেক দিন হইতে জানিত যে, সে রামনারায়ণের পালক পুত্র ; কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর যত্ন ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এতদিন সে চিন্তা মনোমধ্যে কখনও উদয় হয় নাই। আজ অকস্মাৎ যেন প্রশান্ত নদীবক্ষে উত্তাল তরঙ্গমালা প্রচণ্ড বেগে উত্থিত হইয়া কূলে আঘাত করিতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আজ উদ্বেলিত

হইল। এমন কঠোর ভাবে, এমন পরুষ বচনে এই কথাত কেহ তাহার মুখের উপর পূর্ব্বে বলে নাই। বালক মনে মনে কেবলই ভাবিতে লাগিল,—এ সংসারে আমি কে? আমার পিতা মাতা কে? কেন তাঁহারা আমাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন? আবার কি আমি তাঁহাদিগকে কখন দেখিব?

নিশা প্রায় দ্বিপ্রহর। সমস্ত মেদিনী নিস্তব্ধ; মধ্যে মধ্যে শিবাকুলের কলরব ও ঝিল্লীর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ ভিন্ন, অন্য প্রাণীর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। সকলেই নিদ্রাদেবীর কোমল কোলে সুষুপ্ত। কেবল রতিকান্তের চক্ষে নিদ্রা নাই। ক্ষুদ্র হৃদয়ে এমন চিন্তার স্রোত পূর্ব্বে আর কখন উঠে নাই। ভাবিতে ভাবিতে মস্তক উষ্ণ হইয়া উঠিল। তখন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নৈশ-সমীরণ সেবন মানসে ঘরের বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে আসিল। এমন সময় এক অস্ফুট ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। কৌতূহল এত বৃদ্ধি হইল যে, লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়া শ্যামনারায়ণের কক্ষের দ্বারদেশে কর্ণ সংযোগ করিল। তাহার পিতৃব্যাণী বলিতেছে,—"উত্তর দাও—তোমার যে বাক্ রোধ হইল!"

শ্যাম। তাই ত, এ যে বড় শক্ত কথা!

পত্নী। তবে বিয়ে করিলে কেন?

শ্যাম। তাইত—তাইত—ভয়ানক—

পত্নী। তাইত, তাইতর কর্ম্ম নয়। তুমি না পার—আমি পারিব। তুমি পুরুষ নামের কলঙ্ক। কূয়ার পাড় নাই, রতি প্রাতে বসিয়া যখন কূয়ার নিকট মুখ ধুইবে, তখন তাকে ধাক্কা মারিয়া ভিতরে ফেলিয়া দিবে। এ আর কত বড় কর্ম্ম যে তুমি ভাবিয়া আকুল?

শ্যাম। একেবারে প্রাণে মারিবে?

পত্নী। আধমারা করিলে কি চলিতে পারে? মারিতে হয়ত একেবারে মারাই ভাল। পাপ হয় সেই সর্ব্বনাশীর হইবে—আমাদের পোড়াকপাল, তাই তোমার দাদা সেই ছেলে কুড়াইয়া আনিল। একি কম দুঃখের কথা!

শ্যাম। আহা! ছেলে না যেন রাজপুত্র—তোমার মায়া হয় না?

পত্নী। আবার ঐ এককথা।—রাত্রি প্রভাত হউক, তার পর আমি দেখিব। তুমি ছেলে গুলোকে লইয়া বাটীর বাহির হইয়া যাইও।

প্রত্যুত্তর দিতে শ্যামনারায়ণের আর সাহস হইল না। দূরে পেচকের গম্ভীর ধ্বনি হইল। শিবাকুল তুমূল কোলাহল করিয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য নৈশগগন বিচলিত হইয়া উঠিল। বালক দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভয়ে কাঁপিতেছিল। সমস্ত বিশ্ব চরাচর তাহার নিকট আজ অকস্মাৎ অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। তেমন সুখশশী যেন চিরদিনের তরে অস্তমিত হইল। তাহার সুকোমল দেহ আজ স্পন্দহীন। কোথা হইতে একখণ্ড কালমেঘ আসিয়া নিষ্কলঙ্ক হৃদয়াকাশে বিষাদের ছায়া বিস্তার করিল। কি ভাবিয়া এক সুদীর্ঘ তপ্ত নিশ্বাস ফেলিল, তাহা বালক ভিন্ন আর কেহই বুঝিতে পারিল না। ভাবনায় সে রাত্রে ঘুম হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

পরদিন অপরাহ্ণে রামনারায়ণ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া, রতিকান্তকে না দেখিয়া কিছু বিচলিত হইলেন ; পরে তাঁহার ভ্রাতৃবধূকে উদ্দেশ করিয়া রতিকান্ত কোথায় জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে, ভ্রাতৃজায়া আপন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বল না—আজ রতি সকাল বেলা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহা আমরা কেহই জানি না ; আমাদের কাহাকেও কিছু বলিয়া যায় নাই ; তিনি সেই সকাল বেলায় খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।"

রাম। তাহাকে নিশ্চয় দুর্ব্বাক্য বলা হইয়াছিল, নতুবা তেমন ঠাণ্ডা ছেলে কি রাগ করিয়া যাইতে পারে ?

ভ্রা-ব। বল না—আমরা কিছুই জানি না—আর আমরা তাহাকে কেন দুর্ব্বাক্য বলিব ?

রাম। এখন সে গেল কোথা ? সেত তার মামার বাড়ী যায় নাই। অবশ্য ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে।

তিনি ভ্রাতৃবধূর স্বভাব চরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন, এইজন্য তাঁহার মনে সন্দেহ স্থান পাইল, তিনি অন্য কোন কথা না বলিয়া পল্লীর মধ্যে সন্ধান লইতে বাহির হইলেন।

ভুজঙ্গম চলিয়া গেলে, মণ্ডূক যেমন প্রথমে গর্ত্তের উপরিভাগে মুখ বাহির করিয়া চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করে ও পশ্চাতে নিঃশব্দে পদ

সঞ্চালন করিয়া বহির্গত হয়, শ্যামনারায়ণও সেইরূপ সতর্কপদবিক্ষেপে প্রকোষ্ঠ মধ্য হইতে বাহির হইল। ভয়ে মুখ শুষ্ক ও বিকৃত। স্ত্রীর মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিল। পত্নীরও সেই দশা। অতি কষ্টে ভাব গোপন-করিয়া বলিল,—"এখন উপায় কর—এখানে আর থাকা চলিবে না।"

শ্যাম। উপায়? নিরুপায়। চল এখন বনের মধ্যে গিয়া বাস করিগে। এত বলিলাম, তাত তুমি শুনিলে না? যা ধরিবে তা ছাড়িবে না? এখন ফল হাতে হাতে।

পত্নী। রাত তখন দুপুর, সে যে আড়ি পাতিয়া শুনিবে, তাকি কেউ হাত গুণিয়া বলিবে?

শ্যাম। এযে পাপ, ঈশ্বর কি নাই—পরের মন্দ করিলে আপনার মন্দ আগে হয়, তাকি জান না?

পত্নী। এখন জানিয়া আর কি করিব? তুমি এই বেলা ব্যবস্থা কর, বড় বউএর সঙ্গে আমি ঝগড়া করিয়া তাহার ভিটাতে থাকিতে পারিব না। তুমিত আপনার অংশ আগেই বেচিয়া সাফ করিয়াছ!

শ্যাম। মাঝের পাড়ার গোবরা তেলী তাহার ঘর বেচিবে, চল এখন হাতের বালা বন্ধক দিয়া তাহাই খরিদ করিগে। কপালে যাহা আছে তাহা ত ফলিবে?

পত্নী। কপাল নাচিতেছে।—কুড়ানো ছেলে আর ঘরে ফিরিবে না। ও মিন্সে কতদিন—তার পর কাহার ছেলে পুলে তালুকমুলুক ভোগ করিবে?

শ্যাম। তুমি এখন তাই ভাব্চ? দাদা বাঘের মত ছুটিয়াছে, ফিরে এসে কি করিবে, আমি তাহাই ভাবিতেছি।

পত্নী। সে ভাব্‌লে কি হ'বে; সে যা হবার তা হ'বে। মাঝখান থেকে সুখের আশায় কেন নিরাশ কর?

রাত্রি ক্রমে অধিক হইতে লাগিল, রাম আর ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া, স্বামী ও স্ত্রী চোরের ন্যায় নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পরদিনও রামের প্রত্যাগমন হইল না। দশদিন পরে, রাম ও পদ্মমুখী গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শোকে ও দুঃখে পদ্মমুখী ম্রিয়মাণা। বাটী প্রবেশ করিয়াই পদ্মমুখী রতির নাম ধরিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। পঞ্চদশ বৎসরের পুত্রশোক আজ নূতন হইয়া উথলিয়া উঠিল। রাম উত্তপ্ত চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। রতির কোন দ্রব্য দেখিতে পাইলেই মনে কেমন আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ দেখিতে দেখিতে একখণ্ড কাগজের উপর তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। তিনি চকিত ও ভীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এই যে রতির হাতের লেখা।" সকলে মহাব্যস্ত হইয়া সেই দিকে চক্ষু ফিরাইল। কর্ত্তা কাগজ হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন,—"পিতঃ আসন্নমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আপনার ও মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে বিদায় লইলাম। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে দেখা হইবে।"

কর্ত্তা ক্রোধ ভরে কর্কশস্বরে বলিলেন—"কে ইহার মৃত্যু কামনা করে? পদ্মমুখী শুনিয়া একেবারে রাগে আত্মহারা হইলেন। যাতাকে অনর্থের মূল স্থির করিয়া মহা কলহ উপস্থিত করিলেন। শেষে শ্যামনারায়ণ ও পত্নী বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র আশ্রয় লইল। 'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই' হইলে পর, প্রকাশ্যে বিবাদ মিটিয়া গেল। ইন্ধন অভাবে অগ্নি নিষ্প্রভ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ বালিকা কে?

মনের আবেগে রতিকান্ত প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া কতদূর চলিয়া গেল। পরে পথ ছাড়িয়া কখন বামে কখন বা দক্ষিণে যাইতে লাগিল—বেলা প্রায় দুইটা। পথশ্রমে ও ক্ষুধায় কাতর। এখন বাটী ফিরিবার ইচ্ছা হইতে লাগিল। যাহাদের পিতা মাতা বলিয়াই জানিত এবং যাহারা পুত্র নির্ব্বিশেষে তাহাকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহাদের জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এক ক্ষুদ্র দোকানে উপস্থিত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া লইল। মনের সহিত শরীরের কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শরীরের বলের সহিত মনের তেজ ফিরিয়া আসিল। বালক তখন মনে মনে কত তর্ক বিতর্ক করিল, ভাবিল—আমি কাহার পুত্র? কেন গর্ভধারিণী আমাকে জলেশ্বরের বনে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? আমি কি আজীবন, আমার পিতা মাতাকে জানিতে পারিব না? কৈ—কেহত এই পনর বৎসর আমার উদ্দেশ করে নাই? আমি ত এখন বড় হইয়াছি; একবার কি আমার পিতা মাতার উদ্দেশ করিলে ভাল হয় না? জলেশ্বরে ফিরিয়া গেলেও আমার সমূহ বিপদ। না জানি কি উপায়ে আমার খুড়া আমার প্রাণ নষ্ট করিবে? মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া জলেশ্বরে আর ফিরিব না, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইল; কিয়ৎক্ষণ দোকানে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিল।

যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। পথে থাকিবার মত সুবিধা কোথাও দেখিল না। অগত্যা এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাইতে লাগিল। এই-রূপ পাঁচ দিন অনবরত ভ্রমণ করিয়া শেষে নারায়ণগড়ের জমিদার বাবু নরেন্দ্রলাল রায়ের অট্টালিকাতে উপস্থিত হইল। নরেন্দ্রলাল পঞ্চান্ন বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি যেমন সজ্জন তেমনই পরোপ-কারী ছিলেন। লোকের হিত সাধনে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ শঙ্করনারায়ণ এই স্থানে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করেন। কালে সে রাজ্য মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া মেদনীপুর জেলার সহিত মিলিত হয়। ইংরেজদিগের অভ্যুদয় সময়ে তাঁহার পিতামহ, লর্ড কর্ণ-ওয়ালিস হইতে তাঁহার রাজ্যের পরিবর্ত্তে জমিদারী ফিরিয়া পাইলেন। সেই হইতে তাঁহারা জমিদার হইলেন। যৌবন কালে নরেন্দ্রলাল ব্যবসা বাণিজ্যোপলক্ষে কলিকাতায় থাকিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন। তথায় তাঁহার রেশমের কারবার এখনও চলিতেছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশবশঙ্কর কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার বয়ঃক্রম তখন প্রায় ছাব্বিশবৎসর হইবে। দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণশঙ্কর অষ্টাদশবৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। নারায়ণগড়ের বিদ্যালয়ে তখন সে অধ্যয়ন করিতেছিল। পিতার যাবতীয় গুণ এই যুবা বালক ক্রমে ক্রমে অধিকার করিয়াছিল। পিতা সেই জন্য এই যুবাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। এই দুই পুত্র ভিন্ন, তাঁহার আর কোন সন্তান ছিল না।

নরেন্দ্রলালবাবু রতির চমৎকার গঠন শ্রী, সরলতা পূর্ণ মলিন মুখখানি দেখিয়া একেবারে গলিয়া গেলেন। সস্নেহে বলিলেন, "তুমি কে ?—এখানে কেন আসিয়াছ ? আমি ত তোমাকে কখনও দেখি নাই।" নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, তুমি নিঃশঙ্কে আমাকে তোমার দুঃখ বল।", এই সকরুণ বাক্য শুনিয়া রতির হৃদয় গলিয়া

গেল। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে জীবনের কাহিনী বলিল। তিনি তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই—তুমি নিরুদ্বেগে আমার বাটীতে বাস কর। আমি আজ হইতে তোমার প্রতিপালনের ভার লইলাম। তদবধি রতিকান্ত নারায়ণগড়ে বাস করিতে লাগিল।

রতিকান্তের স্বভাব অতি মনোহর। কিছু দিনের মধ্যে সে সকলের প্রিয় হইয়া উঠিল। কৃষ্ণশঙ্করের সহিত অল্প সময়ের মধ্যে চমৎকার ভ্রাতৃভাব জন্মিল। উভয়ের বয়ঃক্রম প্রায় এক, বিদ্যা এক, স্বভাব দুজনেরই মধুর। কৃষ্ণশঙ্কর বড় তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে অন্যায় কথা কহিতে কাহারও সাহস হইত না। রতিকান্তের এরূপ প্রাখর্য্য একেবারেই ছিল না। অম্ল ও কটু তাহার স্বভাবের কোন স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। মিষ্ট কথায় সহজে ও সুচারুরূপে দুর্দ্ধর্ষ বীরকেও রতিকান্ত বশীভূত করিতে পারিত। কৃষ্ণশঙ্করের প্রভা যেন সূর্য্যের মত প্রখর, অধর্ম্মচারী ব্যক্তি তাঁহার দিকে তাকাইতে ভয় করিত। রতিকান্ত যেন পূর্ণিমার চাঁদ, যতই তাহাকে দেখিবে, ততই তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। এ হেন বালককে অল্পদিনের মধ্যেই নরেন্দ্রলাল পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্নী শঙ্করী কৃষ্ণশঙ্করকে ও রতিকে সমান স্নেহ চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বাটীর পরিজনেরা সকলেই রতির উপর অনুরক্ত হইয়া পড়িল। সকল নিয়মের নাকি ব্যতিক্রম আছে, এই জন্য বুঝি রতিকান্ত কেশবশঙ্করের স্ত্রীর চক্ষের শূল হইল।

বাটীর পরিজন ভিন্ন প্রভাবতী নাম্নী এক সুকুমারী কন্যা বাস করিত। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাদশ বৎসর। প্রভাবতী কাহার কন্যা, কোথা হইতে, কি জন্য এই বাটীতে আসিল, তাহা কেহই জানিত না। আজ আট বৎসর হইল, দ্বিপ্রহর রজনীতে ভৃত্য কানাই নিজের শয়নকক্ষে

বসিয়া রামায়ণ পাঠ করিতেছিল, এমন সময় বাটীর বহির্দ্দেশে অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাইয়া জানালার নিকট উপস্থিত হইল। সে রাত্রি আকাশে মেঘ উঠিয়া চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিয়াছিল। একটী নক্ষত্রও গগনে মিট্ মিট্ করিতেছিল না। দ্বাররক্ষক প্রহরীর দল নিদ্রায় অভিভূত। কানাই কান খাড়া করিয়া এক মনে শুনিতে লাগিল এবং ভাবিতে লাগিল "ব্যাপার খানা কি?" এক জন বলিতেছে—"ঐখানে— ঐ বারান্দার উপর রাখিয়া দাও ভাই!"

দ্বি। না—না—তাকি হয়?

প্র। ভয় কি? এ সময় কে আসিবে, কেহ জানিতেও পারিবে না।

দ্বি। তবেই সর্ব্বনাশ! জানিতে না পারিলে কি হ'বে?

প্র। তবে জানাও আমি চল্লুম, তুমি বড় দয়াল হ'য়েচ!

দ্বি। (অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে) উপযুক্ত বন্দোবস্ত কর, নইলে আমি যাইব না। আমি সব পারি—অনর্থক নির্দ্দোষীকে খুন করিতে পারিব না, ঝড় বৃষ্টিতে হয়ত এখনই মরিয়া যাইবে।

এই সময় তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া কহিল,—"ঐ বারাণ্ডায় রাখিয়া দে, হয় এই রাত্রে, না হয় কাল সকাল বেলা দ্বারবানদের দৃষ্টিতে পড়িবে।

দ্বি। না প্রভু, বালিকাকে কুকুরে মুখে করিয়া লইয়া যাইবে। তাহা হইলে অকারণে প্রাণী বধ করিলাম; আর উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল না।

তৃ। তোমার কথা আংশিক সত্য, কিন্তু তা বলিয়া কি তুমি সকল সময় তর্ক করিবে? সময় যে নাই, এই রাত্রির মধ্যে বিশ ক্রোশ অতিক্রম করিতে হইবে। ইচ্ছা হয়—আকাশভেদী হাঁক দাও, বাটীর লোকেরা ব্যস্ত হইয়া বাহির হইবে; এই অবসরে আমরা চলিয়া যাইব।

দ্বি। হাঁক দিলে সুবিধা না হইয়া অনর্থ হইতে পারে ;—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম।

ক্রমে জগৎ নিস্তব্ধ হইল। যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যেন চলিয়া যাইতে লাগিল। অস্ফুট শব্দও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়া গেল। কানাই দ্বারবানের ঘুম ভাঙ্গাইতে গেল। আজ বেহুঁস হইয়া রজপুত বীর রামসিং নিদ্রা যাইতেছিল। হাঁকা হাঁকি ডাকা ডাকিতে রামসিং কেবল পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। তখন কানাই তাহার উপর চড়িয়া নাসিকা টিপিয়া ধরিল। নাসিকার সিংহগর্জ্জন থামিয়া গেল। বীর চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। কানাইএর কথা শুনিয়া বলিল,—"আমি একা ডাকাত ধরিব নাকি ? লচমন সিংকে উঠাও, লাঠি বন্দুক তরওয়ার লইয়া প্রস্তুত হউক। অন্যান্য সর্দ্দারদের সংবাদ দাও, তাহারাও কোমর বাঁধিয়া আসুক। সদর দরজা খুলে বাহির হওয়া ও মাথা দেওয়া কি সোজা কথা ?" কানাই হাসিয়া বলিল—"ও সিংহ মহাশয় ! শীকার পালাইয়াছে, ভয় নাই, তোমার নাসিকার গর্জ্জনেই তাহারা অস্থির—এখন উঠ—সদর দ্বার খোল ; আমি এই উঠিলাম।"

এই বলিয়া কানাই উঠিয়া পড়িল। রামসিং, লচ্‌মন সিং, অর্জ্জুন সিং, অগত্যা তাহার পশ্চাতে লাঠি ও তরওয়ার লইয়া যাইতে লাগিল। দ্বার খুলিয়া কানাই লণ্ঠন দিয়া চারিদিক্‌ দেখিতে লাগিল। এক চারি বৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা তপ্তকাঞ্চন প্রভায় দশদিক্‌ আলোকিত করিয়া, এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্রের উপর অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। বাটীর পরিজনেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই অবাক্‌ হইয়া সেই বালিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিলেন। সকলেই ভাবিলেন, "এ নিশীথে কে—কাহার অভাগিনী তনয়াকে পরিত্যাগ করিয়া গেল ? কাহার হৃদয় এতদূর কঠিন !"

বালিকার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া যখন একটীও পরিচিত মুখ দেখিতে পাইল না, তখন কাঁদিয়া উঠিল। যখন কিছুতেই তাহার সান্ত্বনা হইল না, তখন নরেন্দ্রলালবাবু তাহাকে কোলে উঠাইয়া পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমার কন্যার বড় সাধ ছিল, আজ সেই সাধ জগদীশ্বর মিটাইয়া দিলেন ; তুমি ইহাকে কন্যা মনে করিয়া লালন পালন কর।"

নরেন্দ্রলালবাবু বালিকাকে বলিলেন,—"তোমার নাম কি ?" অস্ফুটস্বরে বালিকা বলিল 'প্রভা'। সকলে মনে করিল, তাহার নাম প্রভাবতী। সেই অবধি বালিকা সেই গৃহে কন্যার ন্যায় সযত্নে লালিতা পালিতা হইতে লাগিল। তাহার নাম ভিন্ন সে আর কিছুই বলিতে পারে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—):*:(—

ভালবাসার পরিণাম।

কিছুদিনের মধ্যে প্রভাবতীর সহিত রতিকান্তের প্রণয় জন্মিল। সেই প্রণয় দিন দিন জল সেচনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, উভয়ের হৃদয় ক্ষেত্রে মূল বিস্তার করিল। অতি অল্প সময়ের বিচ্ছেদও দারুণ কষ্টের কারণ হইল। কৃষ্ণশঙ্করও প্রভাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিত। তাহারা তিন জনে একত্রে পাঠ করিত, গল্প করিত, উদ্যানে নানারূপ ব্যায়াম ও ক্রীড়া কৌতুক করিয়া বেড়াইত। বাস্তবিক বলিতে কি, প্রভা তাহাদিগের উভয়ের বড় আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিল। শিক্ষা ও স্বভাব গুণে বালা গুণবতী ও যৌবনসমাগমে পরম রূপলাবণ্যসম্পন্না যুবতী হইয়া উঠিল। সুখের সময় শীঘ্র যায়; দেখিতে দেখিতে চারি বৎসর চলিয়া গেল।

প্রভা ও রতিকান্তের জীবনে অনেক সাদৃশ্য ছিল। দুই জনেই পিতৃমাতৃহীন, সংসারে কোথা হইতে, কেমন করিয়া আসিল, তাহা দুই জনেই অনভিজ্ঞ। উভয়ের স্বভাবে কেমন মধুরতা, কেমন কোমলতা ছিল যে, একজন অপরে শীঘ্রই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। প্রভা, দাদা বলিয়া রতিকে আহ্বান করিত এবং সহোদরা যেমন জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ব্যবহার করে, সে ঠিক সেইরূপ করিত।

রতিকে দেখিলে প্রভার মুখ-মণ্ডল প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায়

ফুটিয়া উঠিত। অধরে হাসি ধরিত না। কুন্দদন্তপাতি দিয়া হাসির লহরী উথলিয়া পড়িত। উভয়ে একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে পরস্পরের সুখ দুঃখের কথা কহিত।

ক্রমে প্রভার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। কৃষ্ণশঙ্করকে দেখিলে তাহার সস্মিত মুখখানি আপনা হইতে নত হইয়া পড়িত। গণ্ডদেশ লোহিত হইয়া উঠিত। মুখ তুলিয়া কথা কহিতে বড় লজ্জা বোধ হইত। অথচ তাহাকে অনেকক্ষণ না দেখিলে চিত্ত বিকল হইত। প্রভার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে কৃষ্ণশঙ্কর যেন বিস্মিত ও সংক্ষুব্ধ হইল। সে আর বড় একটা তাহার নিকট যাইত না, বা যাইতে সাহস পাইত না।

কখন কি হয় কে বলিতে পারে? কালের উপর কাহারও ক্ষমতা নাই। সকলেই কালের বশ। এই নিয়মাধীন হইয়া রতিকান্ত জ্বরে আক্রান্ত হইল; ক্রমে রোগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। সকলেই চিন্তাযুক্ত, সকলেরই মুখ ম্লান। তাঁহার জীবনের আশা ক্রমেই কম হইয়া আসিতে লাগিল। প্রথমে সামান্য একজন চিকিৎসক দেখিতেছিল, এখন তাহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া অসম্ভব; এইজন্য আশুতোষ ডাক্তারের জন্য লোক ছুটিল। যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন দেশে ডাক্তার দুই একস্থানে পাওয়া যাইত। মেডিকেল কলেজ তখন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোন কোন সদাশয় ইংরেজ ডাক্তার অতি কষ্ট স্বীকার করিয়া ও যত্ন সহকারে দুই চারি জন উৎসাহী যুবককে শিক্ষা দিতেন মাত্র। আশুতোষ বাবু পিতার সহিত কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি এই সুযোগে ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ডাক্তারের হাত যশ যথেষ্ট ছিল। তবে চিকিৎসকেরা ডাক্তারকে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য নানা কথা প্রচার করিয়া বেড়াইত। আশু বাবু আসিতেছেন শুনিয়া, বাটীর

লোকেরা, এমন্ কি রোগী বুঝিতে পারিল যে, পীড়া খুব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন্ কি জীবন লইয়া সংগ্রাম চলিতেছে।

রতি শয্যাগত হইলেই, প্রভা দিন রাত্রি অভেদে তাহার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। গতরাত্রি সে রোগীকে অনবরত ব্যজন করিয়াছিল; প্রাতে তাহার আলস্য বোধ হইল। শয্যায় শয়ন করিল, কিন্তু নিদ্রা হইল না। শয্যায় কণ্টক ফুটতে লাগিল। উঠিয়া আবার রতির পার্শ্বে গিয়া বসিল। রতির বর্ণ মলিন হইয়াছে, চক্ষের জ্যোতিঃ হ্রাস হইয়াছে, কলেবর ক্ষীণ। নাড়ী কখন আছে, কখন নাই। বক্ষঃস্থল ঘন ঘন নড়িতেছে। শ্বাস খুব প্রবল। মনে হয় যেন প্রাণবায়ু বহির্গত হইতে আর বিলম্ব নাই।

প্রভা পদপ্রান্তে বসিয়া একদৃষ্টে রতির শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। অনর্গল নয়নবারি বিগলিত হইয়া তাহার পদদেশ আর্দ্র করিতেছিল। এক একবার আকুল বচনে ঊর্দ্ধ মুখে ঈশ্বরের নিকট রতির জীবন ভিক্ষা করিতেছিল। রতির সংজ্ঞা ক্ষণেক লোপ পাইতেছিল। তৈলহীন প্রদীপের শিখার ন্যায় একবার নির্ব্বাণ প্রায়—আবার সমুজ্জ্বল হইতেছিল। প্রভার চক্ষে জল দেখিয়া রতি কহিল,—"কাঁদ্‌চ কেন?"

প্র। না, কাঁদিনি।

র। তোমার মুখ লাল, চক্ষে জল।

প্র। (অধোবদনে) না—আমিত কাঁদিনি

র। আমার কি হ'য়েচে?

এবার প্রভা উত্তর দিতে পারিল না। এবার দুনয়নের বারি আর থামাইয়া রাখিতে পারিল না। কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। ক্ষণকাল নত বদনে থাকিয়া সে রোগীর মুখ দেখিয়া ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া

উঠিল। সকলে দৌড়িয়া আসিল। স্ত্রীলোকেরা ভাব দেখিয়া কাঁদিবার বেশ উদ্যোগ করিল। নরেন্দ্রলাল বাবু অবস্থা দৃষ্টে অতি কষ্টে চক্ষের জল সংবরণ করিয়া কানাইকে বলিলেন,—"দেরি নাই, প্রস্তুত হওগে।" এই গোলযোগের সময় কৃষ্ণশঙ্কর আশুবাবুকে লইয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিল। রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন,—"মৃত্যুর বিলম্ব আছে—এই জ্বর কমিয়া গেলে, আর একটা জ্বর আসিবে, সেই জ্বরের অবসানে নাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারে।" কৃষ্ণশঙ্কর ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মহাশয়, উপায় কি কিছু আছে?"

ডা। আছে বৈ কি! নাড়ীকে সবল করিবার ঔষধ দিব, আর যে জ্বর আসিবে তাহাকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে হইবে, ইহার মধ্যে শরীরের পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই হইবে।

ডাক্তারের সহিত রাম সিং চলিয়া গেল। দুই শিশি ঔষধ শীঘ্র লইয়া আসিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রভা ঔষধ সেবন করাইতে লাগিল। অচেতন দেহ প্রায় সচেতন হইয়া উঠিল। এক সপ্তাহ পরে রতিকান্ত শয্যা পরিত্যাগ করিল। কৃষ্ণশঙ্করের আনন্দের সীমা রহিল না। প্রভার মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

এই হাসি কিন্তু প্রভার সর্ব্বনাশ করিল। এত দিনের পর সাক্ষাৎ সরলতার প্রতিমায় যেন কলঙ্কের চিহ্ন প্রকাশ পাইল। এতদিনের পর নির্ম্মল সরসী জলে কলুষ ভাসিয়া উঠিল। নরেন্দ্রলাল বাবুর পত্নীর দুই চক্ষু লাল হইয়া উঠিল। বাটীর দাসী বামা কত ভাবে কত কি বলিতে লাগিল। কেশবশঙ্করের স্ত্রী, রতির নামে কত কবিতা পড়িয়া শুনাইল। নারীপুরে রতিকান্তের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল, অধিকন্তু সে স্থান পরিত্যাগের আজ্ঞা প্রচার হইল।

রতিকান্ত বহির্বাটীতে একাকী বসিয়া আছে। বাটীর ভিতর কি যে

আগুন জ্বলিতেছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। তবে ভিতরে যে একটা গোলযোগ হইতেছিল, তাহা একরূপ বুঝিতে পারিল। ব্যাপার কি, সন্ধান লইবার জন্য উঠিতেছে, এমন সময় বামা ভাতের হাঁড়ীর মত মুখ ভার করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। মুখে যাহা আসিল তাহা শুনাইল, অবশেষে গৃহিণীর আদেশ প্রচার করিয়া গেল। রতি এক বিষম সমস্যায় পড়িল। নরেন্দ্রলালবাবু ও কৃষ্ণশঙ্কর রেশমের কারবার দেখিবার জন্য উভয়ে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। বাটীতে অভিভাবক পুরুষ কেহই ছিল না যে, তাহার সহিত পরামর্শ করিবে। অথচ তাহার অপরাধ যে কি, তাহা বামা পরিষ্কার করিয়া কিছু বলিয়া গেল না। এ স্থলে কি কর্ত্তব্য তাহাই স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া, প্রভাকে দেখিবার জন্য তাহার প্রকোষ্ঠের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। তাহার স্থির বিশ্বাস ছিল, প্রভা উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। অনেকক্ষণ প্রভার আগমন অপেক্ষা করিয়া রহিল; কিন্তু এ দুঃখের দিনে সে বালিকার আর কোনই উদ্দেশ নাই দেখিয়া, রতিকান্ত প্রভার প্রকোষ্ঠের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিল। কতক্ষণ পরে দেখিল, মুক্ত বাতায়নের নিকট সে নতমুখে বসিয়া আছে। মুখে হাস্য নাই, নয়ন-নীলোৎপলে সে জ্যোতিঃ নাই। কবরী আলু থালু, বসন শিথিল। কপোলে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। এ কি ভাব! রতির আর স্থিরতা রহিল না। অনিমেষ লোচনে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে অভাগিনী, "শেষে এই ছিল" বলিয়া আকাশে দৃষ্টিক্ষেপ করিল। অমনি রতিকান্তের সহিত চারি চক্ষের মিলন হইল। রতি ভাবিয়াছিল, প্রভা এইবার তাহাকে সম্বোধন করিয়া অন্ততঃ কিছু বলিবে। কিন্তু বালিকা মুখখানি গাঢ় বিষাদভরে মাটীর দিকে ফিরাইল।

রতি অধৈর্য্য হইয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিল; কিন্তু সে শুষ্ক কমল আর উপরে উঠিল না। এ দুঃখের কি সীমা আছে? ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ও চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নিজের কক্ষে উপবেশন করিল। যে প্রভা তাহার জন্য সর্ব্বদা অস্থির, যে অকাতরে তাহার জন্য সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে পারে, আজ কিনা সে নয়ন নিক্ষেপ করিতেও কষ্ট জ্ঞান করিল? বিষম প্রদাহ উপস্থিত হইয়া তাহার অন্তরে ভয়ানক মর্ম্মপীড়া দিতে লাগিল। মন একান্ত অধীর হইয়া উঠিল। জীবনের জন্য আর তিল মাত্র মায়া রহিল না। বিষণ্ণ মনে, উদাস হৃদয়ে নরেন্দ্রলালের বাটী হইতে চলিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, কেহ যেন শীঘ্রই তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে, অপরাধও তাহার কিছুই নাই। এ আশা যে ছলনা মাত্র, তাহা পথে বাহির হইয়াই বুঝিতে পারিল।

প্রভা সেই বাতায়ন পথে, সেই অধোবদনে বসিয়া আছে। নয়ন-জলে বুক ভাসিয়া গিয়াছে। এক একবার মুখ মুছিয়া ফেলিতেছে। সেই সময়ে বামা অলিন্দে উপস্থিত হইয়া, প্রভা শুনিতে পায়—এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে যেন আপনাপনি বলিতে লাগিল,- "কি বিষম ব্যাপার!— এমন কর্ম্ম কি করিতে হয়? তাই কাহাকেও কিছু না বলিয়া, চুপি চুপি কর্ত্তা কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই বাটী হইতে পলাইয়া গেল।" কথা শুনিয়া প্রভা আর চক্ষে দেখিতে পাইল না, কর্ণে শুনিতে পাইল না, সহস্র বজ্র যেন মস্তকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল,—"রতিকান্ত গিয়াছে, তবে কি আর আসিবে না, জন্মের মত চলিয়া গেল? কে আর মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিবে? প্রভা বলিয়া কে আমায় প্রিয় সম্ভাষণ করিবে? হত-ভাগিনী কাহার কাছে যাইয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিবে? কে

আর ব্যথার ব্যথী হইবে? হা রতি! আমি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব?"

ক্রমে চিন্তা প্রবল হইতে লাগিল। হৃদয়াকাশ অন্ধকারে পূর্ণ হইল। বাসগৃহ শ্মশান সম বোধ হইল। সকলকে শত্রুবৎ মনে হইল। কতক্ষণ শয্যায় মুখ লুকাইয়া রহিল। শেষে করুণ স্বরে বলিল, "কে আমার সর্ব্বনাশ করিতে চায়? কাহার চরণে আমি এত অপরাধ করিয়াছি?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনোদিনী।

নরেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশবশঙ্করের স্ত্রীর নাম বিনোদিনী। তাহার একমাত্র পুত্র, বয়ঃক্রম সার্দ্ধ তিন বৎসর। কেশব যেমন মদ্যপায়ী তেমনই চরিত্রবিহীন। স্ত্রী যুবতী ও সুন্দরী, কিন্তু তাহার চক্ষু সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইত না, সে সুমধুর স্বর শুনিয়া শ্রবণেন্দ্রিয় চরিতার্থ হইত না। তাহার দুই চক্ষু আকাশের চাঁদ হইতে অন্ধকার রাত্রির ক্ষুদ্র খদ্যোতের দিকেও ধাবিত হইত। কোন স্থানে তাহার স্থির দৃষ্টি ছিল না। তাহার জন্য অকালে কত অঙ্গনা বিধবা হইয়াছে, কত অবলা পুত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, কত সুন্দরী স্বামী বা পিত্রালয় ছাড়িয়া বার-বিলাসিনী হইয়াছে। এই সকল কুকর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সদাশয়, উদারহৃদয়, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মপরায়ণ নরেন্দ্রলাল কেমন করিয়া, কোন্ পাপের ফলে এমন কুলাঙ্গার পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে এখনও বৈজ্ঞানিক-দিগের বিলম্ব আছে। নরেন্দ্রলালবাবু ও রাধানগরবাসী গৌরমোহন দত্তের পিতা উভয়ে মিলিত হইয়া কলিকাতায় রেশমের এক কারখানা খুলিয়াছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ভারতের রেশম

প্রভূত পরিমাণে য়ুরোপে রপ্তানি হইত, এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মাণী ওই তালীতে অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত। মুরসিদাবাদ ও মেদিনী-পুরের স্থানে স্থানে সাহেবদিগের রেশমের কুঠী ছিল। রেশম ভরিয়া বড় বড় জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া ইংলণ্ডে উপনীত হইত। তখন লণ্ডন ও কলিকাতা ছয়মাস রাস্তার ব্যবধানে ছিল। যে দিন হইতে কৃত্রিম রেসমের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারতের রেশমের কুঠীগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র ও গৌরমোহনবাবুর পক্ষে কেশব কলিকাতায় উপস্থিত থাকিয়া এই ব্যবসা চালাইত।

বিনোদিনী আপন শয়ন মন্দিরে বসিয়া আছে। মন কেমন অপ্রফুল্ল, মনে তেমন শান্তি বা সুখ ছিল না। পুত্র শ্রীমান্ ভবশঙ্কর একখানি কাগজে হিজিবিজি লিখিতেছে। বিনোদিনী কতক্ষণ একমনে বসিয়া বসিয়া ভাবিল, পরে অধীরা হইয়া বলিল,—"ভব—ও আমার আঁধারের মাণিক ভব—বলত বাপ, তোর সে কবে বাড়ী আসবে?"

ভব। তোর সে—আমার কে?

বি। সেই যে তোর সে—তাকে কি ব'লে ডাকিস্?

ভ। তুই বল্—আমি কি বলিয়া ডাকি? সে কে মা?—কার কথা বোল্‌চ?

বি। ওরে! সেই যে সে—যে আমার মনোচোর, তোর জন্য যে বাঁশী আনিবে।

ভ। বাঁশী আন্‌বে যে, সে যে আমার বাবা—তোর কে মা?

বি। আমার আবার কে হবে সে?

ভ। এই যে বল্‌লি আমার চোর্—না মা—বাবা তোর কি চুরি ক'রেচে? বাবা কি চোর?

বি। মাণিক—তোর সে কবে বাড়ী আস্‌বে ?

ভ। আজ্।

বি। কোন আঙ্গুলটা ধর্‌বি ? বড়টা না ছোটটা ?

ভব বড় আঙ্গুল ধরিল। বিনোদিনীর মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। অনেক দিন হইল কেশব বাটী আসে নাই। কলিকাতা হইতে নারায়ণগড় আসিতে তখন দুইদিন লাগিত। নৌকা উলুবেড়িয়া অবধি আসিত। সে স্থান হইতে ঘোটকে, গোশকটে, পাল্কীতে বা পদব্রজে আসিতে হইত। কেশবের পাল্কী বেহারাই উপস্থিত থাকিত। কিন্তু এত কষ্ট করিয়া কেশবের মত লোক বৎসরে কয়বার বাটী আসিতে পারিত বা ইচ্ছা করিত। এইবার নরেন্দ্রলালবাবু কলিকাতা গিয়াছেন, তিনি দুই একমাস তথায় থাকিবেন। কাজেই কেশব বাটী আসিবার অবসর পাইবে। এদিকে বিনোদিনীর অন্তরে আশা ও নিরাশার স্রোত পর্য্যায় ক্রমে বহিতেছে। আজ ভব বড় আঙ্গুলটা ধরিয়াছে, বিনোদিনীর হৃদয়ে যেন জোয়ার ছুটিয়াছে। সময় যায় না, সুতরাং বিনোদিনী ভবের সঙ্গে নানা কথা জুড়িয়া দিল। কিন্তু ভবের লেখাপড়ায় এমন দারুণ মনোযোগ উপস্থিত হইল যে, সে আর তাহার মায়ের কথার উত্তর দিতে সাবকাশ পাইল না। অধীরা যুবতী তখন বালকের কাগজ কাড়িয়া লইল এবং ছিন্ন করিয়া ফেলাইয়া দিল। বালকের রাগ এমন প্রচণ্ড হইয়া উঠিল যে, একটা টীনের বাক্স দেরাজের উপর হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। কাঁচের দ্রব্যে বাক্স পূর্ণ ছিল, তাহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গেল। বিনোদিনী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া 'পোড়ার মুখো' বলিয়া এক মুষ্ট্যাঘাত তাহার পৃষ্ঠে দিল। বালক গলা ছাড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিল। বামা দৌড়িয়া আসিয়া ভবকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল, এবং বহির্দ্দিকে চলিয়া গেল। কতক্ষণ পরে নিদ্রিত বালককে শয্যায় শয়ন করাইল,

এবং যুবতীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। দুই জনের বড় সদ্ভাব, কারণ দু'জনেই কুটিলা।

বিনোদিনীর পিতা অতিশয় দরিদ্র ছিল। একটী মাত্র দুহিতা রাখিয়া ইহসংসার ত্যাগ করে। হতভাগিনীর মাতা নরেন্দ্রবাবুর নিকট দুরবস্থা প্রকাশ করিয়া কন্যার সহিত কেশবশঙ্করের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিল। তিনি বংশমর্য্যাদা ও রূপের পক্ষপাতী হইয়া বিনোদিনীকে মহাসমারোহে বাটীতে আনিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন! দরিদ্রের কন্যা রাজপুত্রবধূ হইল। অবস্থার সহিত স্বভাবও ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইল। হিংসা ও গর্ব্ব হৃদয়ের ষোল আনা অধিকার করিল।

বিনোদিনী বামাকে কহিল,—"দেখ্—এই বেলা প্রভার একটা বিলি ব্যবস্থা কর্, তাহা না হইলে শেষে কি অনর্থ হইবে, তা বলা যায় না।"

বামা। হাঁ দিদি, প্রভা কোথা থেকে এল, ওর বাপ কে?

বি। ওরে! সে বড় পুরাণ কথা, আমার বিবাহের অনেক আগে সে আমাদের বাটীতে আসিয়াছে। সে যে কে, তাহার এখনও কোন সন্ধান হয় নি।

বা। সে বড় মানুষের মেয়ে, তার যেমন রূপ তেমনই তেজ, যৌবনও তেমনই ভরা, তার সুমুখে আমার কথা কহিতে ভয় হয়। হাঁ দিদি, অমন আইবুড়া মেয়ে নিয়ে তোমার শ্বশুর কি করিবেন?

বা। ভয় আমার তাই। পাছে আমার তার হৃদয় অধিকার করিয়া ব'সে সেই ভয়ে আমি বড়ই ব্যস্ত। একটা কৌশল ক'রে ওকে বাড়ী হইতে অন্য স্থানে পাঠাইতে হবেই হবে। তা না হ'লে আমার মাথাটা কোন্ দিন খাবে। রতিকান্ত থাকিলে প্রভাকে বাহির করা বড় শক্ত হইত; সেইজন্য কেমন কৌশলে তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছি।

একটা ষড়যন্ত্রের চেষ্টা আরম্ভ হইল, কিন্তু শেষ না হইতে হইতেই কেশবশঙ্কর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। চন্দ্রোদয়ে বিনোদিনীর হৃদয়-সমুদ্র তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু চতুরা সে ভাব গোপন করিয়া মানে ঝাঁপ দিল। কেশব স্ত্রীকে জব্দ করিবার জন্য, বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধে আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিল। বিনোদিনী অত্যন্ত অস্থিরা হইয়া বলিল—"এতদিনের পর মনে পড়িল—হা আমার অদৃষ্ট!"

কে। বাড়ীতে এলে যে সুস্থ হইব, তাহার উপায় নাই। নিকেশ দিতে দিতে প্রাণটা গেল। আমি হাকিমও নই, কেরাণীও নই—আর তুমিও আমার সাহেব মুনিব নও, যে কথায় কথায় কৈফিয়ৎ তলব করিবে? এত হিসাব নিকাশ দিতে গেলে আর বাড়ী আসা চল্‌বে না। তবুও বলিয়া রাখি যে, কার্য্য কর্ম্মের ভয়ানক ভিড়, আসিতে পারি নাই।

বি। ঐ এক কথা, কখনও ত ভাল বাসিলে না, কাজেই বলিবে কাজ কর্ম্মের ভিড়। তোমার ত মন ঘরের দিকে নাই—কোথা যে যায়, আর কোথায় যে থাকে, তা ভগবানই জানেন।

কে। বেঁচে আছি, তাই মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলে না? দাঁত থাকিতে দাঁত না থাকার কষ্ট কি কেউ বুঝিতে পারে? আজ যদি আমি মরি, কাল তোমার পোষাক পরিচ্ছদ, আহার বিহার, সব ঘুচিয়া যাইবে। তখন বুঝিতে পারিবে স্বামী জিনিসটা কি?

বি। পেয়েছিলে পুরুষ শাস্ত্রকার—তাই আপনাদের দিকে সব সুবিধা করিয়া লিখাইয়া লইয়াছ? যা ইচ্ছা খাইবে, পরিবে—যতবার ইচ্ছা বিয়ে করিবে,—যেখানে ইচ্ছা বেড়াইবে,—তাহাতে ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইবে না। আর আমাদের যদি পান থেকে চূণ খসিল,

অমনি সে দোষের আর ক্ষমা নাই। অমনি স্ত্রী পরিত্যাগ ও দ্বিতীয় বার বিবাহের ঘটা পড়িয়া গেল।

কে। আজ কাল কলিকাতাতে বক্তৃতার ছড়াছড়ি, পাদরী সাহেব ও মেম সাহেবদিগের বক্তৃতা ত গলি গলি চলিতেছে, তার উপর ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। আবার অন্তঃপুরেও বক্তৃতার স্রোত ঢুকিল দেখ্‌চি। এখন পৈতৃক প্রাণটা কোথায় জুড়াই তাই ভাব্‌চি।

বি। কেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের বক্তৃতা কি মন্দ নাকি?

কে। পণ্ডিত মহাশয়, থাম, আর হাড় জ্বলিও না। আমি এখনই কলিকাতায় চলিলাম, আমার অদৃষ্ট মন্দ—তাই তোমার মত বিদূষী স্ত্রী এখনও আমার কাঁধে চড়িয়া আছে।

এই বলিয়া কেশব উঠিল; বিনোদিনী একটু ব্যস্ত ও একটু ভীত হইয়া পড়িল, ভাবিল—হারানিধি বুঝি আবার চলিয়া যায়। সেও উঠিয়া সম্মুখে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। তখন ছোট খাট একটা যুদ্ধ উপস্থিত হইল। একি প্রকৃত, না কৃত্রিম যুদ্ধ, তাহা ঠিক বুঝা গেল না। কেশব যেন রাগ করিয়া বলিল—"আমি চলিলাম।" বিনোদিনী যেন কাতর কণ্ঠে বলিল,—"এই আমি রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইলাম।" কথা হইতে হাতাহাতি যুদ্ধ উপস্থিত হইল। চীৎকারে ভবশঙ্করের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষুরুন্মীলন করিল। কেশবকে দেখিয়া মহোল্লাসে বলিল,—"বাবা, বাঁশী দাও।"

পিতা সস্নেহে ভবকে কোলে তুলিয়া লইল। যুদ্ধের কথা একেবারে ভুলিয়া গেল। ব্যাগ হইতে একে একে চারিটা বাঁশী বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিল। আহ্লাদের সীমা নাই। বাঁশীতে ফুঁ আর নাচ। বালকের এই আনন্দটুকু যেন কেশব বাস্তবিকই অনুভব করিল। ক্ষণেকের জন্য স্বর্গীয় প্রেম তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত

করিল। বিনোদিনী পুত্রকে ধরিয়া বলিল—"সেই গান্‌টা গাও ত মাণিক?"

"কোন্‌টা"

বিনোদিনী কাণে কাণে বলিয়া দিল—

'বাবা গো তোমার তরে মা আমার প্রাণে মরে
তুমি না দেখিলে বাবা কে দেখিবে বল না
বাবা তুমি ঘরে এস না।'

বালক গান গাবে, না বাঁশীতে ফুঁ দিবে? সে গান না গাইয়া অনবরত বাঁশী বাজাইতে লাগিল। মার এত ইঙ্গিত, এত ভ্রূভঙ্গী, এত অনুরোধ, সব বৃথা হইল। তখন বিনোদিনী রাগ করিয়া বালকের গাল টিপিয়া দিল। সে একটু ব্যথা পাইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল। পিতার নিকট গিয়া বলিল,—"হাঁ বাবা, মা কেন আমাকে মারে? আমি গান গাব না।" বাপের আদরে ভব শান্ত হইল। বিনোদিনী যেন কোন স্থানেই সুখ পাইল না। একটু খানি নিস্তব্ধে বসিয়া কক্ষান্তরে উঠিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—):!:(—

কে বলে কামিনী কোমলা ?

নরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় কিছুদিন থাকিবেন স্থির করিয়া, কেশব ও কৃষ্ণকে বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। দুই ভাই একত্রে বাটী ফিরিয়া আসিল। কেশব আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে বিলাতী মদ্য সঙ্গে আনিয়াছিল। গ্রাম্য লোক তখন বিলাতী মদ্য সেবন করিতে বড় শিক্ষা পায় নাই, কিন্তু মদ্যপায়ীদিগের লোভ যথেষ্ট ছিল। ক্রমে ক্রমে স্থানীয় বন্ধুগণ মহোল্লাসে একে একে কেশবের বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় বহির্বাটীর এক প্রকোষ্ঠে, কখনওবা পুষ্করণীর চাতালে আমোদের স্রোত প্রবাহিত হইল। কৃষ্ণশঙ্কর দাদার এই ঘৃণিত ও পৈশাচিক ব্যবহার দেখিয়া তাহার মাতুলানীর বাটী চলিয়া গেল, কিন্তু যে স্থানেও অধিক দিন থাকিতে পারিল না, পুনরায় বাটী ফিরিয়া আসিল।

রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছে। মদ্যপানে বন্ধুগণ উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে। আজ আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। শীঘ্রই ঝড় বৃষ্টি আসিবে, এই আশঙ্কা করিয়া, বন্ধুগণ একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল। নিরুপায় কেশব অগত্যা ধীর পদ বিক্ষেপে বাহির্বাটী হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

আহারাদি করিয়া বৃষ্টির পূর্ব্বেই, প্রভা আপনার শয়নপ্রকোষ্ঠে শয্যা বিস্তৃত করিল। কৃষ্ণশঙ্কর কলিকাতা হইতে অনেক প্রকারের পুস্তক আনিয়াছিল, প্রভাবতী সেই পুস্তক হইতে মহাভারত নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিল এবং মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ আরম্ভ করিয়াছিল। শয্যার উপর অর্দ্ধ উপবেশন, অর্দ্ধ শয়ন করিয়া, উপাধানে মস্তক রাখিয়া কীচকবধ পর্ব্বাধ্যায় পড়িতে লাগিল। কোন কোন পণ্ডিত বলেন,—পুস্তকের সহিত মস্তিষ্কের এমন সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে যে, পুস্তক হাতে লইলেই, চক্ষু আপনা হইতে বুজিয়া আইসে, এবং কোন প্রকার পূর্ব্বাভাস না দিয়া নিদ্রাদেবী পাঠকের চেতনা বিলুপ্ত করিয়া লয়। এই স্থানেও সেই রূপ এক অভিনয় উপস্থিত হইল। প্রভার চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। শ্বাস গভীর হইতে গভীরতর হইল। মস্তকের কেশ-রাশি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্রদীপের আভায় দেহের লাবণ্য উদ্ভাসিত হইল। মুখমণ্ডলের অলৌকিক রূপরাশি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় ঘর আলোকিত করিল। অকাতরে প্রভা নিদ্রা যাইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহার বোধ হইল, যেন কীচক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মধুর বচনে তাহার প্রণয় যাচ্ঞা করিতেছে ; যেন হস্তযুগল একত্র করিয়া কাতরে বিনয়ে বলিতেছে, এমন অপরূপ রূপরাশি লইয়া কেন তুমি বিরাট-কন্যার দাসী হইবে ? তুমি আমার প্রতি বিন্দুমাত্র কৃপাদৃষ্টি করিলে, আমি তোমাকে রাজরাণী করিব। প্রভা রোষকষায়িত লোচনে তীব্র ভৎর্সনা করিতে উদ্যত, এমন সময় কীচক তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিল। বিস্ময়ে ও ভয়ে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আশঙ্কিতা হইয়া বলিল,—"বড় দাদা—তুমি এখানে—আমি প্রভা।"

বাহিরে প্রবল বেগে ঝড় হইতেছিল। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। বিজলীর প্রভা ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া এক একবার জগদ্ভাসিত

করিতেছিল। হু হু শব্দে বৃষ্টি পড়িয়া ধরণী ভাসিয়া যাইতেছিল। কেশবশঙ্কর এই কক্ষে স্বেচ্ছায়, কি ভ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলা বড় সহজ নহে। মদ্য পানে চিত্ত বিহ্বল হইয়াছিল। অকস্মাৎ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অসামান্য রূপরাশি দেখিয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। এমন রূপ সে যেন আর জীবনে কখনও দেখে নাই। কোথায় আসিয়াছে ও কি করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা ভুলিয়া গেল। দুই হাতে প্রভাকে আকর্ষণ করিল। প্রভার চৈতন্য হইলে পর বাতাসে প্রদীপ নিবিয়া গেল। তখন সেই ঘন অন্ধকারে অনাথিনীর ন্যায় বালিকা দুর্বৃত্ত তস্করের পদতলে পড়িয়া গেল।

কেশবশঙ্করকে দেখিয়া প্রভার প্রথমে সাহস ও পরে আশারও সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু একটু পরে, প্রদীপের আলোর সহিত, আশার আলোও নিবিয়া গেল। কেশবের যে বাহ্য জ্ঞান ছিল, তাহা প্রভা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দুইটী প্রায় নিমীলিত, মুখে খুব দুর্গন্ধ এবং বাহ্যিক প্রকৃতি দেখিয়া জ্ঞানের কোন লক্ষণই দেখিতে পাইল না। অগত্যা ভীতা হরিণীর ন্যায় চঞ্চলা হইয়া, কক্ষ হইতে পলাইবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু সে প্রয়াসও ব্যর্থ হইল। কেশব বজ্রমুষ্টিতে প্রভার উভয় হস্ত ধরিয়া ফেলিল। ঘন অন্ধকারে সে প্রাণপণে হস্ত ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা পাইল। বল প্রয়োগের পর যখন দেখিল ও বুঝিল, ধর্ম্মের সহিত তাহার জীবন আজ চলিয়া যাইতেছে, তখন ক্রোধ উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। দলিত ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সবলে হস্ত মুক্ত করিয়া লইল এবং বেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা পাইল।

চৈতন্য বিলুপ্ত হউক বা না হউক, কেশবশঙ্করও ত্বরিত পদে দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইল। হরিণীকে ধৃত করিবার অভিলাষে দুই

হাত বাড়াইয়া রহিল। চপলার আলোকে প্রভা তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিল। বাণাহত ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। অপরিমিত বলের সহিত কেশবের বক্ষে এক পদাঘাত করিল। কে বলে কামিনী পেলব অশোক হইতেও কোমলা ? সেই কোমলাঙ্গীর কোমল পদাঘাতে বজ্রসম দৃঢ় পুরুষদেহ কাঁপিয়া উঠিল। কেশব ভূমে পড়িয়া গেল। গৃহ হইতে বেগে প্রভা অন্তর্ধান করিল।

বিনোদিনী স্বামীর আশায় বসিয়া আছে। মনে করিয়াছে, স্বামী বুঝি বাতাসের গতিকে বাহির বাটী হইতে ভিতরে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রভার চীৎকার ও দ্বারের ঝনঝনা শব্দ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল,—"বামা, লণ্ঠন লইয়া শীঘ্র আমার সঙ্গে আয়।" এই বলিয়া দ্রুতগতিতে প্রভার কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখে, কেশবশঙ্কর সাক্ষাৎ কালান্তকের ন্যায় দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। স্ত্রীকে দেখিয়া মুখখানি হেঁট করিল। বিনোদিনী স্বামীকে তদবস্থায় প্রভার কক্ষে দেখিয়া, রাগে ও দুঃখে কপালে করাঘাত করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিল। পিতা মাতার বিয়োগদুঃখ আজ উথলিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি যা ভাবিয়াছি তাহাই কি ঠিক হইল ?—হায় মা ! আমাকে কেন সমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া পলাইয়া গেলে ?—আমার গতি কি করিলে ?—এত দুর্দ্দশা যে আমার অদৃষ্টে রহিয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জানিতে পারিলে না ?" এই বলিতে বলিতে রোষে ও দুঃখে স্বামীর হাত ধরিল। বীরশ্রেষ্ঠ কেশব আজ স্ত্রীর নিকট চোর হইল। সে গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গেল,—সে তেজঃ নষ্ট হইল,—সে জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ হইল। বিনোদিনী স্বামীর হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল এবং সঙ্গে লইয়া নিজ কক্ষাভিমুখে চলিল। বামাকে বলিল,—"দেখ ত প্রভা কোথায় গিয়াছে—সে সর্ব্বনাশী, সে কুলকলঙ্কিনী, সে রাক্ষসী এ বাটীতে

থাকিলে আর আমি প্রাণ রাখিতে পারিব না।" বামা বলিল,—"ও দিদি-ঠাকুরাণী, প্রভা বাহির বাটীতে ছুটিয়া গিয়াছে, আমি দেখিয়াছি, বোধ করি আমাদের সাড়া পাইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে।" বিনোদিনী আবার দুঃখের ও রাগের কান্না জুড়িয়া দিল।

প্রভা বহির্ব্বাটীর এক প্রকোষ্ঠের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিল। গ্রীষ্মের পর হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে বায়ু শীতল হইয়াছিল। কৃষ্ণশঙ্কর এমন সুশীতল রজনীতে শয্যায় শয়ন করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল। আঘাতের উপর আঘাত হওয়াতে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। কৌতূহলী হইয়া বলিল,—"এ নিশীথে তুমি কে?"

"আমি প্রভা—দ্বার খোল।"

"এ কি! এ সময়ে কেন? তুমি কি উন্মাদিনী!"

"আমি একেবারে উন্মাদিনী—আমার মৃত্যু সন্নিকট হইয়াছে।"

দ্বার মুক্ত করিয়া প্রভার আলুলায়িত কেশ ও রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে কৃষ্ণশঙ্কর অন্তরে দাঁড়াইল; বিস্মিত হইয়া বলিল,—"একি! হাতে দর দর রক্ত পড়িতেছে—স্থানে স্থানে শরীর ক্ষত বিক্ষত—চুল আলু থালু—মুখে রক্ত ফুটিয়া পড়িতেছে—জলে চক্ষু ভরিয়া রহিয়াছে—একি প্রভা! কি হইয়াছে?"

তাহার হৃদয়সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। চক্ষু হইতে অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"তোমার দাদা, আমার সর্ব্বনাশ করিতে উঠিয়াছিল।"

কৃষ্ণশঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল—"দাদা—দাদা—।" রাগে নয়নযুগল লোহিত হইল। মুখে এমন ঘৃণা ও রোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইল যে, প্রভা তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিল। কতক্ষণ যুবা কথা কহিতে পারিল না; শরীর থরথর কম্পিত হইতে লাগিল;

চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। ক্রোধ এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, দ্বারের উপর সরোষে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল। কি বলিতে উঠিয়াছিল, কিন্তু কোন কথা মুখ হইতে বাহির হইল না। কতক্ষণ নীরবে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"দাদা,—অবধ্য শত্রু— সকলই নীরবে, অবনত মস্তকে সহ্য করিতে হইবে।"

কতক্ষণ পরে কৃষ্ণশঙ্কর অতি করুণ স্বরে বলিল—"এখন কি হইবে প্রভা ?"

প্র। তুমি বাল্যকালের সুহৃদ্—তোমাকে আমি কি উপদেশ দিব ?—আমি কিন্তু আর এক দণ্ডও এ বাটীতে থাকিব না। আমার জীবনে বড় ঘৃণা হইয়াছে। যে জীবনের মূল্য নাই, এমন জীবন থাকিলেই বা কি, আর গেলেই বা কি ? আমার জন্য তুমি কিছুমাত্র বিচলিত হইও না,—আমি সকল কষ্ট, সকল বিপদ অকাতরে সহ্য করিতে পারি ;—আমি চলিলাম।" এই বলিয়া সেই ঝড়ে, সেই বৃষ্টিতে বহির্বাটীর দ্বার খুলিয়া প্রভাবতী তীব্র বেগে বাহির হইল। কৃষ্ণশঙ্করও মহা ব্যস্ত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া গেল। দুই জনেই রজনীর গাঢ় তিমিরে মিশিয়া গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড।

মধ্যজীবন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নবকুমার দে।

রামনগর অতি প্রাচীন গ্রাম। কথিত আছে যে, রামচন্দ্র বন-বাস গমন সময়ে এই স্থানে কিয়দ্দিন বিশ্রাম করেন। সে সময় চারিদিক ঘন বনে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি চলিয়া গেলে, নানা দিক হইতে লোক সমাগত হইয়া এই নগর নির্ম্মাণ করিল এবং তাঁহার নামে স্থানের নামকরণ করিল। রামনগরে অনেক ভদ্র ও গণ্যমান্য লোকের বাস। গ্রামের মধ্যে প্রশস্ত পথ। তাহারই উভয় পার্শ্বে ধনীদিগের অট্টালিকা। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে, গ্রামের একপার্শ্বে এক সুন্দর অথচ নাতিবৃহৎ দ্বিতল অট্টালিকা ছিল। গৃহ-স্বামী নবকুমার দে পূর্ব্বে সিংভূম জেলার রাজধানী রঘুনাথগড়ে বাস করিত। কোন গূঢ় কারণ বশতঃ, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া রামনগরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দে বংশের সহিত অভাগা রতিকান্তের বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং তাহাদের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিলে ক্ষতি নাই।

নবকুমার একজন সামান্য লোকের সন্তান। শৈশবে পিতৃহীন হইলে তাহার পরিজনেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বনে তাহাকে পালন করে। তাহার ভগিনী উৎফুল্লময়ী রঘুনাথগড়ে এমন একটি জঘন্য কার্য্য করে যে, প্রাণভয়ে তথা হইতে সপরিবারে পলায়ন করিয়া রাম-নগরে উঠিয়া আইসে। একখানি পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়া, কোন প্রকারে এই দরিদ্র পরিবার দিনপাত করিতে লাগিল। মহাদেবকে লোকে পাগল বলে; কিন্তু একা মহাদেব নন, সকল দেবদেবীই পাগল। তাঁহাদের কার্য্যের শৃঙ্খলা বা নিয়ম নাই। তাঁহারা পাগল না হইলে, এত স্থান থাকিতে পদ্মিনী কেন পঙ্কিল সরোবরে জন্মগ্রহণ করিবে? মুক্তাই বা কেন অতল সমুদ্রজলের নিম্নে শুক্তির গর্ভে থাকিবে? চন্দ্রকান্ত মণিই বা কেন চোরের ন্যায় অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিবে? এদিকে আবার সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে, দুগ্ধফেননিভ শয্যার ভিতরে, খট্টামল কেন রক্তপানের জন্য অপেক্ষা করিবে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট কেন প্রচ্ছন্নে মহা সুখে সিন্দুকের মধ্যে কাশ্মীরজাত শাল কর্ত্তন করিবে? কেনই বা দুর্দ্দান্ত টাইমুর লক্ষ লক্ষ মনুষ্যজীবন অকারণে হত্যা করিয়া, অসংখ্য গ্রাম উৎসন্ন করিয়া মরুভূমির সৃষ্টি করতঃ, বীর বলিয়া জগতে পূজিত ও সম্মানিত হইল? কেন তাহার পূজার জন্য পৃথিবীর উপাদেয় বস্তু থরে থরে পুঞ্জীকৃত হইল? আর কেনই বা নির্ব্বিরোধী, শান্তিপ্রিয়, দ্বেষহিংসাপরিশূন্য একজন কৃষকের ঘরের চালে খড় নাই; অজন্মা হেতু গোলাতে একমুষ্টি ধান্য নাই; বহু সন্তান সন্ততি লইয়া কষ্টের শেষ নাই। এই সকল শৃঙ্খলাহীন কার্য্য দেখিয়া কোন কোন কবি দেবতাদিগকে পাগল বলিয়া গিয়াছেন।

আমাদের লক্ষ্মীর কার্য্য ও মহাদেবের মত। বড় বড় ভদ্র পরিবার, পুরাতন মহৎ বংশ পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে, নবকুমারের কুটীরদ্বারে

উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মী সমাগমে নবকুমারের সেই ভগ্ন কুটীরের উপর দ্বিতল অট্টালিকা উঠিল। সামান্য চাকুরী করিতে করিতে সে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিল। এখন অবস্থার সমূহ পরিবর্ত্তন। নবকুমারের সে দুর্নাম, সে বংশহীনতা নাই;—সে এখন দশজনের একজন হইল। নিকটবর্ত্তী এক সম্ভ্রান্ত জমিদার-কন্যার সহিত একমাত্র পুত্র সারদাপ্রসাদের বিবাহ নিষ্পন্ন হইল। জগতে এক চন্দ্র বলিয়া, চন্দ্রের এত আদর। একপুত্র বলিয়া সারদার আদর ও যত্নের সীমা ছিল না। অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক যুবা পুত্র আহার করিতে বসিলে, তাহার মাতা কাঞ্চনমালা মৎস্যের কাঁটা বাছিয়া দিত। এই আদরে সারদার শেষে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার পত্নী বরদা রূপে ও গুণে লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ছিল। এমন গুণবতী, এমন সুন্দরী স্ত্রী সচরাচর দেখা যাইত না। কিন্তু সারদার হাতে পড়িয়া বরদার রূপ গুণের আদর হইল না। কাননে কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে দিক আমোদিত করিল, কিন্তু কেহই মোহিত হইল না। অনাথিনী গিরিতরঙ্গিণীর ন্যায় বালুভূমে শীতল স্রোত শুকাইয়া গেল।

নবকুমারের স্বভাব চরিত্রও ভাল ছিল না। সে কলিকাতায় কার্য্যোপলক্ষে থাকিত। বাটীতে প্রায় আসিত না। তাহার ভগ্নী উৎফুল্লময়ী গৃহরক্ষকের কার্য্য করিত। উৎফুল্লময়ী তাহার নাম, কিন্তু উৎফুল্ল কাহাকে বলে, তাহা সে জানিত না। বর্ণ শ্যাম, দেহ অতিশয় ক্ষীণ, মস্তক কেশশূন্য। হঠাৎ দেখিলে পুরুষ বলিয়া ভ্রম হইত। বয়ঃক্রম আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসর। তাহার স্বর কর্কশ, চক্ষু ক্ষুদ্র ও বক্র। যৌবন কালে সে কি করিয়াছে তাহা সেই জানিত, এখন বৃদ্ধা হইয়া তপস্বিনী-প্রায় হইয়াছিল। তাহার বাহ্যিক আকার যেমন কুৎসিত, অন্তরও সেইরূপ। হৃদয় পাষাণে নির্ম্মিত, স্বভাব সর্পের ন্যায় খল। পরোপকার

কাহাকে বলে, তাহা সে জানিত না। লাভ থাকুক বা নাই থাকুক, পরের মন্দ হইয়াছে শুনিলে বা অপকার করিতে পারিলে, তাহার আনন্দ উপস্থিত হইত। এই এক আনন্দ ভিন্ন, তাহার অন্য কোন প্রকার আনন্দ ছিল না।

এইস্থলে লক্ষ্মীকে পুনরায় তিরস্কার করিতে হইল। লক্ষ্মী এক, না দুই, তাহা আমি স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। পাপ ও পুণ্যের সংসারে কি সেই এক লক্ষ্মী সমান ভাবে বিরাজ করেন? উৎফুল্লের জঘন্য কার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াও, কমলা এখন অবধি স্থির রহিয়াছেন। দেবি! যথার্থই কি তুমি কমলাসনা? না ঘেঁটু ফুলই তোমার বসিবার স্থান?

গিরীশ রামচন্দ্র মিত্রের একমাত্র পুত্র। তাহার ভগিনীর সহিত সারদার বিবাহের পর, সে রামনগর বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার জন্য নবকুমারের বাটীতে আগমন করিল। দুইজনে এক সঙ্গে পাঠ করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের অতুল বিভব। এক পুত্র। এই পুত্র তিরোহিত হইলেই, সমস্ত জমিদারী দে-বংশের আয়ত্তাধীন হয়। উৎফুল্লময়ী ও কাঞ্চনমালা দিবারাত্রি পরামর্শ করিয়া রজনীযোগে এক ভয়ানক কাণ্ড সমাধা করিল। হলাহল-মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া, এক মাত্র ধন গিরীশ অকালে, হায়! নৃশংসীর হস্তে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব তখন বিলক্ষণ। কে কাহার তত্ত্ব লয়? উৎফুল্লময়ী ও কাঞ্চনমালার ক্রন্দনে সকলেই মোহিত হইয়া তাহাদের কথা বিশ্বাস করিল। রামচন্দ্র পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া পড়িল। একে একে তাহার তিন পুত্র তাহার চক্ষের সমক্ষে, কোন অজানিত দ্বার দিয়া সংসার হইতে চলিয়া গেল। গিরীশের মৃত্যু শুনিয়া, রামচন্দ্র নিরন্তর নয়ননীর বিসর্জ্জন করিতে করিতে, শেষে অন্ধ হইল। অবশেষে অনাথের ন্যায় অতুল সম্পত্তি বরদার হস্তে প্রদান করিয়া

মানবলীলা সাঙ্গ করিল। যদি উৎফুল্লময়ী বাল্যকালে মরিত, অথবা মাতৃগর্ভ কলঙ্কিত না করিত, তাহা হইলে অকালে, অন্ধের যষ্টি, পূর্ণিমার শশী গিরীশ পিতামাতাকে গভীর দুঃখসাগরে ভাসাইত না।

যে দিন বরদা পিতার বিভবের অধিকারিণী হইলেন, সেই দিন সারদাপ্রসাদ বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বহির্বাটীর দ্বারোদ্ঘাটন করিল। নগরের সমবয়স্কেরা একে একে জুটিতে লাগিল। পাকওয়াজ ও তবলের বিষম স্বরে পাড়া কম্পিত হইল। তানপুরার বেসুর ঘেং ঘেং শব্দে বনের ভূত অবধি কাঁপিয়া উঠিল। মদ্যপানে সারদা বাবুর দুই চক্ষু অবিরত জবা ফুলের ন্যায় লাল হইয়া রহিল। সুরা-সহচরী কালকূটহৃদয়া বারবিলাসিনী যাতায়াত আরম্ভ করিল। গাড়ী ঘোড়ার ঘর্ ঘর্ শব্দে, মদ্যপায়ী মাতালদিগের বমনে, বহুচারিণী-গণের কিঙ্কিণীর রোলে ও পাকওয়াজের বিষম স্বরে সমুদয় নগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ তারকাসুরের ন্যায় সারদাপ্রসাদ দে রাম-নগরে সমুত্থিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উৎফুল্লময়ী।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘন অন্ধকারে দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া রজনী উপস্থিত। বহির্দ্দিকে আলোর নাম নাই; সুতরাং বৈটকখানার উজ্জ্বল আলোক ঝক্ মক্ করিয়া রজনীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেছিল। গৃহভিত্তিতে বড় বড় ছবি ঝুলিতেছিল। তাহাতে ইয়ুরোপীয় কামিনীগণের নানা মূর্ত্তি নানা ভঙ্গিতে বিরাজ করিতেছিল। চারিদিকে ফুল দেওয়া যোড়া ফানসের দেওয়ালগিরি সমশ্রেণীতে ছবির উপরিভাগে ছিল। মেঝের উপর ফরাস বিছানা পাতা ছিল। তাহার উপরে তাকিয়া ঠেস দিয়া বাবু সারদাপ্রসাদ দে আড় হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার শরীর প্রকাণ্ড, মস্তক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র; ভুঁড়ির সহিত কেহ কেহ হস্তীর উদরের তুলনা করিত। এই প্রকাণ্ড দেহে বুদ্ধি কোন্ স্থানে লুকাইয়া থাকিত তাহা পণ্ডিতদিগের সমস্যার বিষয় ছিল। পারিষদবর্গ লইয়া সারদাপ্রসাদ বেসুরে, বেতালায় নিধু বাবুর শ্রাদ্ধ করিতেছিল। একজন সুরাদেবীর গ্রাস অনবরত প্রদান করিয়া, সকলকে পর্য্যায়ক্রমে উল্লাসিত করিতেছিল।

কত নগর, কত বন, কত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আজ অভাগা অসহায় রতিকান্ত ক্ষুধা তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া, দীন হীন বেশে সারদা বাবুর বৈটকখানায় প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল আলোক তাহার

শ্বেত স্বচ্ছ কান্তিতে পতিত হইবা মাত্র, প্রতিফলিত হইয়া সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল; কিছুক্ষণের জন্য সকলে নীরবে তাহাকে দেখিতে লাগিল। সারদা সে সময় ঘাড় বক্র করিয়া ছিল। দৃষ্টি পৃথিবীর উপর ছিল না। কথাগুলি সাক্ষাৎ অগ্নিকণা বা অহঙ্কারের বৃষ্টি। তীব্র বচনে কহিল,—"কে তুমি, কি চাও?" রতি বিনীত বচনে কহিল,—"মহাশয়, অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছি, কার্য্য কর্ম্মের চেষ্টায় এই নগরে আসিয়াছি। আজ কোথাও আশ্রয় পাই নাই।"

বাবু গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল,—"হাম্ বাগ্, ও কথা শুনিতে চাই না—অন্য কিছু বল।"

রতি। আমি কি বাবুর জমিদারীতে কোন সরকারের কার্য্য পাইতে পারি? আমার ইংরাজীতে সামান্য জ্ঞান আছে।

সার। কে তোমায় জানে?

রতি নিরুত্তর রহিল! কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহাকে দেখিয়া সারদা বাবুর কেমন একটু স্নেহ জন্মিল,—বলিল,—"আচ্ছা—এই চিঠি লইয়া বাজারে যাও, শীঘ্র সযত্নে আমার দ্রব্যগুলি লইয়া আইস—তাহা হইলে বুঝিব তুমি কেমন চতুর ও বিশ্বাসী।"

রতি পত্র হস্তে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বুঝিতে পারে নাই যে, তাহাকে মামার বাড়ী পাঠান হইয়াছিল।

রতি চলিয়া গেলে পর, একজন বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"বাবু, বেটার চোক দুটো ভাঁটার মত ঠিক্‌রে প'ড়্‌ছে।" দ্বিতীয় কহিল,—"রংটা কি ফেকাসে, একটুও মাধুর্য্য নাই।" তৃতীয় কহিল,—"চুল গুলো যেন দুর্গাঠাকুরের অসুরের ন্যায় কোঁকড়ান।" চতুর্থ কহিল,—"দাঁত দেখেছেন, কি ছোট ছোট, বেটা পাঁঠার হাড় কেমন করিয়া চিবায়?" পঞ্চম ব্যক্তি এতক্ষণ নিঃশব্দে ভাবিতেছিল, যখন সকলকার মন্তব্য শেষ

হইল, তখন সে বলিল,—"বাবু, অতিদানে যক্ষবধ, অতি গর্ব্বে হত রাম, অতি বিবাহে ভীষ্ম বধ; অতি শব্দই মন্দ। বেটার সৌন্দর্য্য তেমনই অতি শব্দে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তার একের নম্বর চক্ষু, দ্বিতীয় নম্বর নাক, তৃতীয় নম্বর চুল, চতুর্থ নম্বর দাঁত, এই সকল তরকারীর উপাদানে ফেকাসে বর্ণ হয়েছে লবণাধিক্য, সুতরাং সব তরকারী 'হোলসেল বরবাদ' হয়েছে।"

তাহার কথা শুনিয়া সকলে অপরিমিত হাস্য আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মৃদঙ্গের ঘা। তুমুল কোলাহলে ক্ষুদ্র শিশু ভয়ে মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই সময় রতিকান্ত মদ্যবিক্রেতার দোকান হইতে প্রত্যাগমন করিলে, সকলে উল্লাসিত হইয়া সুরাপান করত গন্তব্য পথ অন্বেষণ করিল।

রাত্রি প্রায় দশটা। সারদা বাবু অন্তঃপুরে গমন করিল। রতিকান্ত মোমবাতি হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। তাহারা দালানে উপস্থিত হইলে, উৎফুল্লময়ী চঞ্চল ও তীব্র নয়নে রতিকান্তের মুখদর্শন করিয়া, যেন এক অভাবনীয় চিন্তায় নিমগ্ন হইল। চিন্তার স্থির বিষয় কিছুই ছিল না, অথচ কত অলীক শ্রেণীহীন চিন্তা এক সময়ে উঠিতে লাগিল। আশু ভাব দমন করিয়া, কর্কশস্বরে কহিল,—"সারদা, এ কে?"

"আমার সরকার—হিসাব পত্র নিজে রাখিতে পারি না, ও ইংরাজী জানে—কাজের সুবিধা হইবে।"

"ও কে? ওর বাড়ী কোথায়? কে তাহাকে জানে?"

"আমি জানি, তোমরা মেয়ে মানুষ, আবার আমার উপর হাত নাড়া দিতে এলে?"

রতিকান্ত ও সারদা আহারাদি করিয়া যথাযোগ্য স্থানে শয়ন করিতে চলিয়া গেল। উৎফুল্লময়ী স্বীয় শয্যায় শয়ন করিয়া, গভীর

চিন্তায় নিমগ্ন হইল। রজনী আগত হইলে, যেমন কোন্ গুহা হইতে অন্ধকার উপস্থিত হয়, তাহা কোন কবি আজ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারেন নাই, সেইরূপ এই অপরিচিতকে দর্শন করিয়া উৎফুল্লময়ীর অন্তরের কোন্ গূঢ় কক্ষ হইতে, কঠোর কল্পনা আসিয়া তাহার হৃদয় আচ্ছন্ন করিল, তাহা কে বলিবে? গত জীবন তাহার পাপমনে উদয় হইল। তখন তাহার মুখ ক্ষণকাল ভার ও বিষণ্ণ হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই কোমল ভাব বিদূরিত হইল। পাষাণীর কঠিন অন্তরে প্রতিহিংসা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আপন মনে বলিতে লাগিল,—"একি সেই? সে কি বাঁচিবে? সে অবস্থায় কি বাঁচিতে পারে? কে বাঁচাইবে? সে বনে কে যাইবে? সে কখনই নয়। কিন্তু গঠন ত এক—যেন এক ছাঁচে দুই মুখ তুলিয়াছে যস্—ঠিক্ ঠিক্—বেশ মনে পড়িয়াছে—তাহার বাম হস্তে ছয়টি আঙ্গুল, বাম পায়ে জড়ুলের বৃহৎ কাল চিহ্ন ছিল। এর কি আছে?"

উৎফুল্ল শয্যা হইতে উঠিল। প্রদীপ হস্তে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া বহির্ব্বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইল। রতিকান্তের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। পরিধের বসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। উৎফুল্ল তীব্র নয়নে, নাসিকা বক্র করিয়া রতিকান্তকে পরীক্ষা করিতে করিতে কহিল,—"আ সর্ব্বনাশ! তবে কি সকল কর্ম্ম পণ্ড হইল? এত যত্ন, এত পরিশ্রম কি শেষে ভস্মে ঘি ঢালার মত হইল? যার জন্য এত অপমান সহ্য করিলাম, ঘর বাড়ী ত্যাগ করিলাম, রামনগরে কুঁড়ে বাঁধিয়া ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইলাম, এখন দেখিতেছি সকলই অকারণে সহ্য করিলাম। ধিক্ ধিক্! আমাকে ধিক্! উৎফুল্ল নামে ধিক্! যে উৎফুল্ল বনের ব্যাঘ্রকে নাচাইতে পারে, যার যাদুতে স্ত্রী পুরুষ

ভুলিয়া যায়, যার অসাধ্য কিছুই নাই, তার অদৃষ্টে কি শেষে এই ছিল? হায়! তার মন্ত্রণাকে ধিক্! হায়! তার জীবনে ধিক্!"

উৎফুল্ল করুণস্বরে যখন এই প্রকার প্রলাপ বকিতেছিল, তখন রতিকান্ত স্বপ্নাবেশে অস্ফুটস্বরে কি কহিয়া, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল। সে আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিল। অন্ধকারে কতক্ষণ সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্রূকুটী করিয়া মুখের শ্রী অন্ধকারে মিশাইতে লাগিল। অস্পষ্টস্বরে কত মন্ত্র পাঠ করিয়া, স্বশয্যায় আগমনপূর্ব্বক শয়ন করিল। জটিল মন্ত্রণা করিতে করিতে সে রাত্রি নিদ্রা আসিল না।

যে দিন অভাগা রামচন্দ্রের পুত্র গিরীশের মৃত্যু হইল, সেই দিন হইতে কাঞ্চনমালা উৎফুল্লময়ীর বন্ধু হইল। অন্তরের নিগূঢ়ভাব উভয়ে প্রকাশ করিত। কোন কার্য্য করিতে হইলে কাঞ্চন পরামর্শ দিত। পনর দিবস হইল, রতিকান্ত দে-বাবুর বাটীতে আসিয়াছিল। কাঞ্চন ও উৎফুল্ল উভয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের দ্বারা তাহাদের সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা রাত্রি এক প্রহরের সময় উভয়ে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। সারদা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গ্রামান্তর হইয়াছিল। উপরের প্রকোষ্ঠে বরদা সারদার আসিবার আশায়, চাতকিনীর ন্যায় অপেক্ষা করিতে করিতে নিদ্রাগতা হইয়াছিল। বহির্ব্বাটীর এক কক্ষে রতিকান্ত শয়ন করিয়া স্বপ্নে প্রভাবতীর চক্ষুজল মুছিয়া দিতেছিল, এমন সময় ভীমা বামা উপস্থিত হইয়া কি বলিতে উদ্যত হইল। তাহাকে দেখিয়াই রতিকান্ত এমন ব্যস্ত হইল যে, তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে পুনরায় নিদ্রাগত হইল। ইতিপূর্ব্বে রতিকান্ত রামনারায়ণের পুত্র, ইহাই উৎফুল্ল শুনিয়াছিল। আজ কাঞ্চন তাহার যথার্থ পরিচয়

অবগত হইয়াছে, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া সঙ্গিনীকে একথা প্রকাশ করিতে পারিতেছে না।

কাঞ্চনের স্বভাব উৎফুল্লময়ী অপেক্ষা অনেক ভাল। তাহার অন্তর আছে। স্ত্রীলোকের কোমলতা গুণই স্বাভাবিক। কাঞ্চনের সম্পূর্ণ না থাকিলেও আংশিক আছে। পরনিন্দা, পরগ্লানি, পরের অপকার করা যেমন কেশশূন্যা বিধবা নারীর জীবনের ব্রত ছিল, কাঞ্চনের সেরূপ ছিল না। তবে সঙ্গদোষে, স্ত্রীসুলভ সকল গুণই হ্রাস হইয়াছিল। গিরীশের হত্যাতে কাঞ্চন লিপ্ত ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সময় তাহাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক কার্য্য করিতে হইয়াছিল। রতিকান্তের পিতার জন্য দে-বংশ কত অপমান ও তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল, তাহা কাঞ্চনের মনে সকলই গাথা আছে কিন্তু তাঁহার যথার্থ পরিচয় দিলে পাছে পিশাচী এক অভিনব হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়, এই ভয়ে কতক্ষণ কাঞ্চন মনে মনে ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিল। স্ত্রীলোকের মনে কখন গোপনীয় কথা থাকে না; এইজন্য পূর্ব্বতন ঋষিগণ কহিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীদিগকে এমন কি পাটেশ্বরীকেও কোন গোপনীয় কথা কখন প্রকাশ করিবে না। বঙ্গের স্ত্রী এই প্রকৃতির, সন্দেহ নাই। অন্যান্য দেশের, বিশেষতঃ ইংলণ্ড ফ্রান্স আমেরিকা প্রভৃতি দেশের স্ত্রীলোকেরা রাজ্য শাসনের অনেক ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। সে সকল বীরাঙ্গনাদিগের সহিত কাঞ্চনের তুলনা অবশ্য কোন মতে হইতে পারে না। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাঞ্চন স্ফুটনোন্মুখ কোরকের ন্যায় অর্দ্ধবিকসিত মুখে কহিল,—"ঠাকুরুণ! এক কথা শুনিয়াছ?"

উৎ। কি কথা—চুপ ক'রে রইলি যে—বল্ না শুনি।

কা। এমন কিছু নয়, তবে কথাটা শক্ত।

উৎ। কি—কি— আবার শক্ত হ'ল।

উৎফুল্ল এক নিমিষে ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আশঙ্কা পর্য্যালোচনা করিয়া কহিল,—"শক্ত কথা আবার কি হ'ল ?"

কাঞ্চনের অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইল। ক্ষণকাল কোন কথা নিঃসৃত হইল না। কিন্তু উৎফুল্লের পুনঃপুনঃ তাড়নাতে বলিতে হইল যে, রতিকান্ত রামনারায়ণের পালক পুত্র। সে জলেশ্বরেব অরণ্য হইতে তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছিল এবং সযত্নে পুত্রবৎ পালন করিয়া আসিয়াছে। উৎফুল্লময়ীর মুখ এক নিমিষে বিকট হইয়া উঠিল। যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই বিষ উঠিতে লাগিল। মনে করিল—শত্রুকে কি একেবারে নির্ব্বংশ করিব ? কেহ কি জানিতে পারিবে ? আমার কোন্ কার্য্য কে কখন জানিতে পারিয়াছে ? একটা সামান্য কাণ্ড কি লুকাইয়া রাখিতে পারিব না ? উৎফুল্লময়ী মনে করিলে কি দুই চারিটা নরবলি দিতে পাবে না ? তবু কি জানি কি করিতে কি হয় ? তবে এখন কি করিব ? আচ্ছা—মানুষের কায কি ঈশ্বর দেখেন ? এত কায করিলাম, কে দেখিল ? ধর্ম্মাধর্ম্ম পরকালে। শত্রুবধে পাপ কি ? শত্রুবধ করিয়া নিজের সম্মান রাখিবে—সংসারের নীতিই এই। এই নীতি কে না দেখে ? রামচন্দ্র বালিকে মারিলেন ; লঙ্কার রাবণকে সবংশে উচ্ছন্ন করিলেন, সেওত আপনার সুখ ও মানের জন্য। দেবতা ও মানুষ সকলেই এক নিয়মে কায করে। তবে শত্রুবধে পাপ কি ? কিন্তু এ আমার কি করিয়াছে ? শত্রুর পুত্রও শত্রু যদি একটু পাপ হয়, গঙ্গাস্নানে মুক্ত হইব। হরিনাম করিলে মহাপাপী মুক্ত হয়। আমার কি হরিনামের বয়স এর মধ্যেই হ'ল। এ বয়সে কত লোক কত রঙ্গ করিতেছে। আমার বয়স কি ? এখনই হরিনামের মালা লইলে লোকে কি বলিবে ? দূর হউক ও সব কথা। এখন কি করি ? প্রতিহিংসা কি এখনও হয় নাই ? নাই কেমন করিয়া বলি ? তেমন সংসারকে লণ্ড ভণ্ড

করিয়াছি ; শোকে দুঃখে—মরিয়া গেল,—এখন উন্মাদিনী প্রায় ; বাকি কি আছে ? ইহাকে মারা না মারা দুইই সমান। শত্রুবংশ কখনই থাকিবে না। এ কখনই সে বংশে আর উপস্থিত হইতে পারিবে না। এতদিন পরে সাক্ষী কে দিবে ?

উৎফুল্ল মুখকে কুটিল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কাঞ্চন এতক্ষণ স্থির হইয়া তাহার মুখভঙ্গি দেখিতেছিল, এখন উঠিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল,—"ঠাকুরুণ, কোথা যাইবে ?"

উৎ। পেছু না ডাকিলে কি চলে না ? কোথা যাব ? ক্রমে বয়স বাড়্‌চে না কম্‌চে ? এত দেখে শুনেও ত জ্ঞান জন্মাল না।

কাঞ্চনমালা একেবারে চুপ,—কোন কথা কহিল না। উৎফুল্ল যষ্টি ও প্রদীপ হস্তে রতির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। শুকপক্ষীর ন্যায় নাসিকা বক্র করিয়া, শিখিনী অপেক্ষা কর্কশস্বরে কহিল—"ওঠ্‌, ওঠ্‌—ঘুম দেখ—আ সর্ব্বনাশ !—যাব কোথা—এই বয়সে এত বিদ্যা—যাও বাহির হও—আমার বাটী হইতে এখনই দূর হও—নতুবা পুলিস ডাকিতে হয় ডাকিব।"

রতিকান্ত ব্যস্ত হইয়া চক্ষু সম্মার্জ্জনা করিতে করিতে, শয্যায় উঠিয়া বসিল, জিজ্ঞাসা করিল—"মা, কি হইয়াছে ?"

উৎ। কি হ'য়েচে, যেন কিছু জানেন না—এই বয়সে এত গুণ, গুণের মধ্যে সব নির্গুণ, কেবল চামড়া কটা। এখনই ওঠ—নয়ত এই রাত্রে মহা বিপদ্ উপস্থিত হইবে।

এই বলিয়া রতিকে ভয়ানক পিড়াপিড়ি করিতে আরম্ভ করিল। রতি বিস্মিত, ভীত ও হতবুদ্ধিপ্রায় হইল। ভগ্নস্বরে বলিল "আমি চলিয়া যাইতেছি, কিন্তু মা আমার অপরাধ কি ?"

বিকট স্বরে ও দন্ত চর্ব্বণ করিতে করিতে বলিল,—"কথার শ্রী

দেখেছ? ওকে সব কথার হিসাব দাও—ওঠ ওঠ আমার সময় নাই—বাহির হও—সদর দরজা বন্ধ করি।”

উপায়হীন রতি অগত্যা বাটীর বাহির হইল। উৎফুল্ল চক্ষু কুঞ্চিত ও দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে দ্বার রুদ্ধ করিল। দ্বিপ্রহর রজনীতে সে একাকী রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিল।

ঠিক এই সময়, একজন সবল কৃষ্ণ ও দীর্ঘকায় পুরুষ কৃপাণহস্তে ধীরে ধীরে রতিকান্তের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। একে আকাশে চন্দ্রমা ছিলনা, তাহাতে মেঘজালে দিঙ্‌মণ্ডল আবৃত হওয়াতে, যামিনী বিভীষিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। রতিকান্ত সেই সময় রাস্তার পার্শ্বস্থিত একটী ক্ষুদ্র গুল্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল; সুতরাং কৃষ্ণ পুরুষ তাহাকে লক্ষ্য করিতে পারিল না। সে সবিস্ময়ে ও সভয়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখে, অনতিদূরে একব্যক্তি দুইটী ঘোটকের বল্গা ধারণ করিয়া, সাবধানের সহিত মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে প্রথমের অনুসরণ করিতেছে। রতি বুঝিতে পারিল, কৃষ্ণ পুরুষ নিঃশব্দে যাইবার মানসে ঘোটকের পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নামিয়াছে। তাহার কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। সেও তাহাদের অনুগমন করিল। অপরিচিত পুরুষ, নবকুমার দের বহির্ব্বাটী পার হইয়া, এক গুপ্তদ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। অঙ্গুলিদ্বারা দ্বারোপরি মৃদু মৃদু তিনবার আঘাত করিল। অনতিবিলম্বে দ্বারোদ্ঘাটিত হইল। ক্ষুদ্র দীপালোক অপরিচিতের মুখে পড়িল। সেই আলোকে রতিকান্ত দেখিল যে, সে একজন অপরিমিত বলশালী ব্যক্তি। তাহার বিশাল শ্মশ্রু বক্ষে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বয়ঃক্রম প্রায় পঁয়তাল্লিশ। চক্ষু আকর্ণ, নাসিকা উচ্চ, কপাল প্রশস্ত, মস্তকে বৃহৎ উষ্ণীষ। পরিধেয় বসন সৈনিক পুরুষের মত। তাহার বাম পার্শ্বে ফলক ও কটিদেশে তরবারি

ঝুলিতেছে। উৎফুল্লময়ীকে সম্মুখে দেখিয়া, কৃষ্ণ পুরুষ শুষ্কমুখে ব্যাকুলভাবে কহিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে,—প্রভাবতীর উদ্দেশ পাইতেছি না।"

উৎফুল্লময়ী চঞ্চল লোচনে বহির্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল,—"চুপ—চুপ—রজনীরও চক্ষু কর্ণ আছে—কতদিন প্রভার উদ্দেশ নাই?"

পুরুষ। আজ একমাস নরেন্দ্রলাল বাবুর বাটী হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

উৎফুল্ল। বল কি—ভিতরে আইস, ভয় নাই—অনেক কথা আছে। পরে মনে মনে কহিল—"আর একদণ্ড অগ্রে আসিলে শত্রুর বংশ সমূলে নির্ম্মূল হইত।" বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইল। ঘোটক ধারণ করিয়া যে পুরুষ আসিতেছিল, তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরদাস।

নিরাশ্রয় রতিকান্ত রাস্তার উপর দিয়া যথেচ্ছা চলিতেছে, আর ভাবিতেছে :—ইহারা কে? ইহাদের কার্য্যের অর্থ কি? ইহারা কি মনুষ্য না রাক্ষস ও রাক্ষসী? উৎফুল্লময়ীকে দেখিয়াই আমার চিত্ত কেমন অস্থির হইয়াছিল, যেন তাহার সহিত আমার জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। প্রভাবতীর সহিত ইহাদের সম্বন্ধ কি? সে এখন কোথায়? সে কেন পলাইয়া গেল? তাহার জন্য ইহারা কেন চিন্তান্বিত? প্রথম রাত্রি উৎফুল্লময়ী আমার শয়নাগারে আসিয়া বিজ্‌ বিজ্‌ করিয়া কত মন্ত্র পাঠ করিল। আমার কথা লইয়া কেন ইহারা বার বার আন্দোলন করে? আমার পরিচয় জানিবার জন্য কেন ইহারা এত ব্যস্ত? আজ আমার পরিচয় পাইয়া কেন নিরপরাধে বাটী হইতে দূর করিয়া দিল? আমি কি কাহারও কিছু করিয়াছি? আমার মা—মা কি আমার সত্য সত্য একজন ছিলেন? তিনি কি এখনও জীবিত আছেন? সেই মা কি ইহাদের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন? হা বিধাতঃ—এই সংসার তোমার খেলিবার স্থান। তুমি আশ্রয়হীন হতভাগ্য বালকের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া তামাসা করিতেছ? আমি পুরুষ, সহিতে পারি, কিন্তু অবলা ক্ষীণা প্রভা তোমার কি

করিয়াছে ? সেই সরলতার স্বর্ণপ্রতিমা কি কখন কাহারও অপকার করিতে পারে ? অনিষ্টচিন্তা কি সেই পবিত্র সরল মনে কখন স্থান পায় ? তবে কোন্ পাপে, কাহার কর্ম্মফলে, নিরপরাধিনী প্রভা বৃন্তচ্যুতা ভূপতিতা মল্লিকার ন্যায় অনাথিনী ? ঈশ্বর ! আমাদের মত কি হতভাগা এ সংসারে আর আছে ? যে দেশে যাই, সেই দেশে দেখি—দীনদুঃখীরও থাকিবার পর্ণকুটীর আছে, পিতা বা মাতা বা দুই এক জন আত্মীয় বন্ধু আছে। কিন্তু আমাদের আমাদের জগতে কেহ নাই। যেখানে যাই সেখানে সকলে শত্রু হইয়া পড়ে— দুর দূর করিয়া সকলে তাড়াইয়া দেয়। কেন—আমাদের অপরাধ কি ? হায় ! এ কথার যদি উত্তর পাইব, তবে আমাদের এ দুর্দ্দশা কেন ?

ভাবিতে ভাবিতে রতিকান্ত গ্রামের বহির্দ্দিকে আসিয়া পড়িল। পশ্চাতে যুগ্ম ঘোটকের পদশব্দে চমকিয়া উঠিল। দুইজন ঘোটকারোহী পুরুষ নক্ষত্রবেগে চলিয়া গেল। মনে মনে ভাবিল,—"ইহারাই আমাদের বিধাতা পুরুষ, কি ভাঙ্গিয়া কি গড়িতেছে, তাহা ইহারাই জানে।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নগর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। ঈশ্বরদাস বাবুর দ্বিতল বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ঈশ্বরদাস একজন ব্রাহ্ম ও পরম সাধু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পরোপকার তাঁহার ব্রত ছিল। কেহ যাচ্ঞা করুক বা নাই করুক, দুঃখী দেখিলেই তিনি আপনা হইতে সাহায্য করিতেন। রামনগরের সমুদয় লোক তাঁহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারিত না। তাঁহার সহিত রতিকান্তের ঘটনাচক্রে একদিন মাত্র দেখা হয়। রতির সমুদয় অবস্থা শুনিয়া এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তাহা দেখিয়া সে তাঁহার গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। সে তাঁহার বাটীর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে কহিল "পাঁড়েজি ?"

পাঁড়েজি প্রদীপ জ্বালিয়া গৃহমধ্যে কি করিতেছিল, কথা শুনিয়া নীরব রহিল। রতি পুনরায় করুণ স্বরে কহিল—"পাঁড়েজি ও পাঁড়েজি, ফটক একবার খোল না ?"

পাঁড়ে। এত রাত্রিতে কে গোলমাল করে ?

রতি। তোমার মুনীব কোথা ?

পাঁড়ে। মুনীব ! রাত্রিতে মুনীব ? কি চাও ?

রতি। একবার দেখা করিতে চাই।

পাঁড়েজি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল,—বলিল,—"বাবু, কাল প্রাতে আসিও, রাত্রে বাবুর সহিত দেখা হইতে পারে না। বাবু কি একবার নিদ্রা যাবে না ?"

রতিকান্ত ভাবিয়াছিল ঈশ্বরদাস বাবুর বাটীতে দিন রাত সদাব্রত চলিতেছে—রাত্রি দ্বিপ্রহরেও তাহার আসিবার বাধা থাকিবে না। এখন ভগ্নমনোরথ হইয়া আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া এক সুগভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

এক সময় ব্রাহ্মজীবন সকলকার আদর্শস্থল হইয়াছিল, সুতরাং সে সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রামনগরে একটী ব্রাহ্মমন্দির ছিল। শিবনাথ তাহার উপাচার্য্য। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, বিশাল চক্ষু ও গম্ভীর ভাব দেখিলে স্বতঃ ভক্তির উদয় হইত। ইনি দরিদ্রের পিতা, সাধুর বন্ধু ও অসাধুর শত্রুস্বরূপ ছিলেন। এই মন্দিরে ঈশ্বরদাস ধর্ম্মপুস্তক হস্তে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেন। তিনি শিবনাথ বাবুর হস্তস্বরূপ ছিলেন। পৌত্তলিক ধর্ম্মে কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। তিনি প্রকৃত 'দুর্গা'নাম ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'ঈশ্বর' পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্রীস্বাধীনতা ভিন্ন, ঈশ্বরদাসের স্ত্রী স্বামীর সমুদায় গুণ লাভ

করিয়াছিলেন। ঈশ্বরদাসের নিতান্ত ইচ্ছা যে, য়ুরোপীয় কামিনীগণের ন্যায় তাঁহার স্ত্রীও স্বাধীনতা লাভ করিয়া, মনের সাধে জুতা পায়ে দিয়া চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান; কিন্তু সামাজিক অবস্থা দৃষ্টে বিজ্ঞ উপাচার্য্য তাহা হইতে তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বলিতে কি, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা দিবার সময় বঙ্গে এখনও উপস্থিত হয় নাই। যে দেশে একটী স্ত্রীলোক একাকিনী পথে বাহির হইলে, সকল শ্রেণীর লোক দেখিবার জন্য ব্যস্ত হয়, যে দেশে স্ত্রীলোককে সম্মান করিতে শিক্ষা পায় নাই, যে দেশের সমাজ স্ত্রীলোকের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না এবং কোন কার্য্যে কেহ স্ত্রীলোকের অভিপ্রায় গ্রহণ করে না বা করিবার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করে না, যে দেশে স্বামী স্ত্রীকে আকস্মিক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার ক্ষমতা রাখে না; সে হতভাগ্য দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা দিবার এখনও বিলম্ব আছে। পূর্ব্বে রাজ্যেশ্বরী সিংহাসনে রাজার বামে বসিয়া, ভর্ত্তাকে শাসন-উপদেশ প্রদান করিতেন; তখন বীরাঙ্গনা-গণ তরবারি ধারণ করিয়া ঘোটকপৃষ্ঠে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইতেন। কিন্তু ভারতের সে দিন গিয়াছে। সে অবস্থার এখন সমূহ পরিবর্ত্তন। সুন্দর অবয়বের এখন কঙ্কাল অবশিষ্ট। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের কি অধঃপতনই হইয়াছে? বঙ্গের জীর্ণ শীর্ণ পতনশীল সমাজ স্ত্রীলোকের দিকে দৃষ্টি করে না। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় দ্বারা বঙ্গসমাজের হীনতা দূরীভূত হইবে তাহার আশা আছে, কিন্তু সে আশা কখন ফলবতী হইবে তাহা বলা বড় দুরূহ। শতকরা দশজন লোকও সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা বড়ই কম। শিক্ষা না বাড়িলে কি কখন সমাজের উন্নতি হইতে পারে? বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীস্বাধীনতা দান করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমি শিবনাথের

কার্য্যকে প্রশংসা করি। অদূরদর্শী যুবাদিগের ন্যায়, স্ত্রীস্বাধীনতা লইয়া শিবনাথ বৃথা সময়ের অপব্যয় করিতেন না।

একটী কথা বলিয়া ঈশ্বরদাসের পরিচয় শেষ করিব। ইহাঁর জন্মস্থান মৌলিকগ্রাম। ইনি রামনগরে বিবাহ করিয়া, শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী পিতার একমাত্র কন্যা, সুতরাং তাঁহার মরণের পর ঈশ্বরদাস তদীয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

একই সময়ে, কেহ উষাকে তিরস্কার করে, কেহ বা আদর করে। সময় কি বহুরূপী? অথবা মনুষ্যের অবস্থা-ভেদই তাহার কারণ? উষাকে আসিতে দেখিয়া, রোমিও বৃক্ষের উপর হইতে কতই তিরস্কার করিতেছে, জুলিয়েট মুখভঙ্গী করিয়া কত গঞ্জনা দিতেছে। আবার কৈকেয়ী উষাকে আলিঙ্গন করিয়া কাণে কাণে কহিতেছে,—"উষে! তোমার প্রভাতে আজ আমি রাজমাতা হইব।" সময় কিন্তু একভাবে এক নিয়মে চলিয়া যাইতেছে। তাহার অনন্ত অঙ্গ পর্য্যায়ক্রমে কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত। কৃষ্ণ ভাগকে রাত্রি, শ্বেত ভাগকে দিবা কহে। সময়ের এই কৃষ্ণ অংশ কাহাকেও সুখী, কাহাকেও দুঃখী করিয়া চলিয়া গেল। গর্ব্বিণী উষা আরক্তিম মুখে পূর্ব্বদ্বার উদ্ঘাটন করিল। নবোদিত সূর্য্য সময়ের শ্বেত অঙ্গ প্রকাশিত করিল। ঈশ্বর বাবুর বহির্দ্বার, দ্বারবান্ মুক্ত করিয়া দেখিল,—বারাণ্ডায় একব্যক্তি শয়ন করিয়া আছে। "তুমি কে?" বলিতে বলিতে দ্বারবান নিদ্রান্বিত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করিল। রতিকান্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষুমার্জ্জনা করিয়া বলিল,—"বাবু কি উঠিয়াছেন?"

"না—উপরের হলে যাইয়া বইস।"

রতি উপরের প্রকোষ্ঠে গমন করিল। গৃহ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। সম্মুখেই রাজা রামমোহন রায়ের বৃহৎ আলেখ্য দোদুল্যমান।

অপরদিকে কোথাও স্থির সমুদ্রের দৃশ্য, কোথাও ঝটিকা-বিঘূর্ণিত সমুদ্র মধ্যে অর্ণবপোত, কোথাও বা উইণ্ডসর দুর্গ, কোথাও বা বকিংহাম রাজপ্রাসাদ ইত্যাদির চিত্র রহিয়াছে। মধ্যে এক মেজ—তাহার উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তকাবলি, হিউমের ট্রিটিজ অব হিউমান নেচার প্রভৃতি গ্রন্থ সকল বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া আছে। রতি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল। মেঝিয়ার একদিকে দেশী কাগজে লিখিত একখানি অর্দ্ধছিন্ন পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। কৌতূহলী হইয়া রতিকান্ত তুলিয়া লইল; বড় বড় অক্ষরে কে যেন কাহাকে পত্র লিখিয়াছে। দুই ছত্র পড়িয়া কৌতূহল এমন বৃদ্ধি হইল যে, তাহা পাঠ না করিয়া ফেলিয়া দিতে পারিল না। এই সময় বাহিরে পদশব্দ হইতে লাগিল, বোধ হইল কে যেন তথায় আসিতেছে। সময় নাই দেখিয়া অগত্যা পত্রকে বস্ত্রের মধ্যে রাখিয়া দিল। এমন সময় ঈশ্বরদাস বাবু আসিয়া পড়িলেন।

আমি নিশ্চয় কহিতে পারি, রামনগরের কোন ব্যক্তি কখন ঈশ্বরদাসের বিষণ্ণ মুখ পূর্ব্বে দেখে নাই। শূন্য হৃদয়ের উচ্চ হাসি, তাঁহার সরলতার পরিচয়, দিন রাত্রি দিত। কিন্তু আজ প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত। সন্ধ্যার সরোজের ন্যায় মুখ ম্লান। বঙ্কিম চক্ষের হাসি হাসি ভাব নাই। হলে প্রবেশ করিয়াই একবার সকল স্থানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন, সেই ত্বরিত লোচনের ভাব দেখিলে ভাবুক বুঝিবে যে, বাবুর কোন দ্রব্য হারাইয়াছে। যাহা হউক প্রকৃতিকে সংযত করিয়া কহিলেন,—"রতিকান্ত, এত প্রাতে কেন আসিয়াছ?"—

"আজ্ঞা—দে বাবুর বাটীতে আমার স্থান হইল না।"

"কেন? কেন?"

অকপটে রতি সমুদয় বলিয়া গেল।

"বটে—বটে—সে স্থান তোমার উপযুক্ত নয়—আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম তোমার মত সুবোধ সচ্চরিত্র সরল বালকের স্থান অন্য কোন উৎকৃষ্ট বাটীতে।—এখন কি চাও?"

"মহাশয়ের শরণ লইলাম—আমাকে কোথাও থাকিবার স্থান করিয়া দিন।"

ঈশ্বরদাস কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন—"তুমি এক কায কর, রাধানগরের গৌরমোহন বাবুর নিকট যাও—তাঁর একজন ইংরাজী শিক্ষিত ভাল লোকের প্রয়োজন আছে, তিনি এবিষয় আমার নিকট একবার প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া তিনি একখানি ক্ষুদ্র লিপি তাহার হস্তে দিলেন। পত্র পাইয়া রতি বিদায় লইল। বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"গেল কোথা—তন্ন তন্ন করিয়া সকল ঘর যে দেখিলাম"—এই বলিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

জমিদারী বিচার।

যে দিন সিংভূম জেলার মহারাজ প্রতাপচন্দ্র রাও বাহাদুর শুনিলেন যে, মীরজাফরের মন্ত্রণায় পলাশীর যুদ্ধে, বীর মোহনলাল হস্তের অসি পরিত্যাগ করিয়া সমর-প্রাঙ্গণ হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, এবং লর্ড ক্লাইব ভারত-লক্ষ্মীকে বাষ্পীয় পোতে উঠাইয়া মুরসিদাবাদ হইতে কলি-কাতায় আনিয়া ফোর্ট উইলিয়মে স্থাপিত করিয়াছেন, সেই দিন তিনি বুঝিলেন যে, ইংরেজ বঙ্গের অজেয় বিধাতা পুরুষ হইলেন। তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করা কেবল অর্থ ও লোক ক্ষয় মাত্র। তিনি যুদ্ধে বিরত হইলেন। হস্তের অসি ভারতের শাসনকর্ত্তা ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে প্রেরণ করিলেন এবং পত্র দ্বারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া পাঠাইলেন। অকস্মাৎ দুর্দ্দমনীয় শত্রু বশীভূত হইল দেখিয়া ক্লাইব ও ও হেষ্টিংস মহা সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা মেদিনীপুরে আসিয়া মহা-রাজের সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন। ইহার দ্বারা মহারাজ সিংভূম জেলার কিয়দংশ করদ রাজ্য স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তথায় তাঁহার ক্ষমতা সম্পূর্ণ রূপে অক্ষত রহিল। ইহা ভিন্ন মেদিনীপুরের মধ্যে কতিপয় স্থানে জমিদারী স্বত্ব লাভ করিলেন।

সেই হইতে মহারাজ প্রতাপচন্দ্র ও তাঁহার বংশধরেরা করদ রাজা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তিনি তাঁহার জমিদারীর অধিকাংশ পত্তনী

বিলি করিলেন। তন্মধ্যে রাধানগরের নিধিরাম বাবু তাঁহার প্রধান পত্তনীদার হইলেন। তাঁহার নামডাক বিলক্ষণ ছিল এবং ক্ষমতাও অধিক ছিল। রাজ সরকারে অনেক দিন হইতে চাকরী করিয়া তিনি বিলক্ষণ অর্থ ও বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার জমিদারী সুশাসিত করিলেন। বর্ত্তমান ভূম্যধিকারী গৌরমোহন বাবু নিধিরামের প্রপৌত্র।

গৌরমোহন বাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী। সম্মুখে নহবত খানা। উভয় পার্শ্বে দেবালয়। বাড়ী,—তিন মহল। প্রথম মহলে,—দ্বারবান ও ভৃত্য-বর্গ বাস করিত; গো, অশ্ব, শকট, ধান্যাদি প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যাদির থাকিবারও স্থান ছিল। দ্বিতীয় মহলে বাবুর কাছারী হইত। জমিদারী সেরেস্তা ও বৈঠকখানা সেই মহলে নির্দ্দিষ্ট ছিল। শেষ ভাগে তাঁহার অন্তঃপুর। বাটীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর এবং তৎপার্শ্বে প্রশস্ত পরিখা, গড়ের উপর একটী পরিষ্কার সেতু। তাহারই সম্মুখ ভাগে প্রকাণ্ড ফটক, লৌহনির্ম্মিত দ্বারে সুরক্ষিত। চোর তস্কর ও বর্গীর হাঙ্গামা হইতে ধন ও মান রক্ষা করিবার জন্য, এই সকল কার্য্য নিধিরাম বাবু করিয়া গিয়াছিলেন।

অট্টালিকার ভিতর বাহির দেখিলে, মনে হইত, এই অট্টালিকা অতি প্রাচীন কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাতায়ন ক্ষুদ্র, প্রকোষ্ঠগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পপরিসরের, গৃহভিত্তি প্রায় দুই হস্তের অধিক প্রশস্ত। প্রত্যেক সিঁড়ির উপর লৌহ দ্বার নির্ম্মিত। সমুদয় অট্টালিকার মধ্যে বাবুর বিহার গৃহ পর্ত্তুগীজদিগের ছাঁচে প্রস্তুত হইয়াছিল। সুখসেব্য নানা বস্তুতে ঘরগুলি সাজান ছিল। বিলাসের দ্রব্যের সংখ্যা ছিল না।

প্রথম মহলে দশজন দ্বারবান নিয়ত পর্য্যায় ক্রমে দ্বার রক্ষা করিত। বাটীর ভিতর প্রায় পঞ্চাশৎ দাস দাসী নিযুক্ত ছিল। এতদ্ভিন্ন গোমস্তা, নায়েব, তহসীলদার, মুহুরী, পদাতিক ও হরকরা

অনেক ছিল। প্রাতঃকালে বেলা ৮টা হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কাছারী বাড়ী লোকে পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতি ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতে করিতে, কোন দিন তিন প্রহর হইয়া যাইত। গৌরমোহন বাবুর বিচার করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। তবে ইংরেজদের অভ্যুদয়ে দেশে যাহাতে অশান্তি, চুরি বা ডাকাতি না হয় তাহার জন্য জমিদারগণ বাধ্য ছিলেন। এই উপলক্ষে বঙ্গের জমিদার প্রজার উপর আধিপত্য করিতে সুযোগ পাইয়াছিলেন, এবং দুর্দ্দান্ত ভূম্যধিকারীগণ নানা অত্যাচারে প্রজাকে জর্জ্জরীভূত করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিতেন। গৌরমোহনবাবুর বৈঠকখানায় দশ পনর জন চাটুকার নিয়ত বসিয়া, কেহ বাবুর অবয়বের সহিত নিষ্কলঙ্ক শশধরের তুলনা করিত, কেহ বা কহিত—লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠ ধাম পরিত্যাগ করিয়া রাধানগরে অবস্থান করিয়াছেন ইত্যাদি। একদিকে শিখা-সমন্বিত মুণ্ডিত মুণ্ড নাড়িয়া, ব্রাহ্মণেরা স্মৃতিশাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা দিতেন। অপর দিকে ঋণগ্রস্ত, পিতৃমাতৃদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণ কাতরে বাবুর সাধনা করিত। তাঁহার একদণ্ড অবসর ছিল না।

ঈশ্বরদাস বাবুর পত্র হস্তে করিয়া, রতিকান্ত অতি উদ্বিগ্ন মনে ছেক্‌ড়াগাড়ীর পরিশ্রান্ত পক্ষীরাজের ন্যায় ধীরে ধীরে রামনগর হইতে রাধানগরে উপস্থিত হইল। ব্যবধান প্রায় তিন ক্রোশ, সুতরাং তখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। দ্বাররক্ষককে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু কোথায়?" সে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল—"বাবু কোথায়, হামি কি জানে, ওকাম হামারা নেই—তোমার ডেরা কোথা আছে?" বাস্তবিকই এতবড় বাবু ভিতরে কোথায় কি করিতেছেন, দ্বারবান দ্বারে বসিয়া কেমন করিয়া সংবাদ রাখিতে পারে? এ কথা যে যুবা জানে না তাহাতে তাহার ভয়ানক অপরাধ, সেই জন্য দ্বারবানজি

ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গালাতে বলিতেছেন,—"তুমি এমন আহাম্মুক, তোমার বাড়ী কোথায়?" আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রতিকান্ত দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করিল, দেখিল কাছারী গৃহে জনতা হইয়া গিয়াছে। একজন স্থূল তেজস্বী বাবু গোঁফের মোটাতাড়া লইয়া বেত্রাসনে বসিয়া আছেন। বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ। সম্মুখে একজন শৃঙ্খলাবদ্ধ যুবা ব্যক্তি ভূমিতে শয়ন করিয়া আছে। তাহার বর্ণ শ্যামল, দেহে বেশ তেজ আছে। মুখেও সৌন্দর্য্য আছে। তাহাকে ছোট জাতি বলিয়া বোধ হয় না, তবে সে জাতিতে কৈবর্ত্ত। দুইজন পুরুষ বংশ হস্তে তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। অপর পার্শ্বে চারি পাঁচ জন ব্যক্তি তাহার বিপক্ষে সাক্ষী দিতে আসিয়াছে। একজন পদাতিক কড়যোড়ে কহিল,—"হুজুর, এই সেই কালাচাঁদ সর্দ্দার। ইহার প্রতাপে নারায়ণগড়, রামগড়, রাধানগর প্রভৃতি স্থানে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এমন বলবান দস্যু প্রায় দেখা যায় না। ইহার অনেক সঙ্গী আছে, কিন্তু তাহারা যে কোথায় থাকে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। আজ এই ব্যক্তি যখন সাধুর ন্যায় ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিতেছিল, সেই সময় আমি ইহাকে ধৃত করিয়াছি। ইহার ভয়ে গ্রামের লোক স্ত্রী ও কন্যা লইয়া বাস করিতে পারে না। চারি পাঁচ জন ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে এই বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধে পোষকতা করিতে লাগিল। কালাচাঁদ যোড়হস্তে বিনীত নম্র বচনে বলিল,— "জমিদার প্রজার পিতার স্বরূপ, এই সকল ব্যক্তিকে আমি চিনি না— কেন যে মিথ্যা সাক্ষী দিতেছে, তাহা বলিতে পারি না। আমি হুজুরের পঞ্চাশ বিঘা জমি চাষ করি ও আনন্দে এতদিন বাস করিয়া আসিতে-ছিলাম। আপনার তহসীলদার অন্য প্রজার নিকট, টাকার লোভে বিলি করিবে বলিয়া, আমার জমি আমা হইতে কাড়িয়া লইতে যায়।" এই সময় একজন লোক চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া

কহিল—“দোহাই ধর্ম্মাবতার, এই কালাচাঁদ গ্রামের লোকদিগকে লইয়া জমিদারের বিরুদ্ধে কিরূপে দাঁড়াইবে, কিরূপে বৃদ্ধি খাজনা না দিতে হয়, বকেয়া হইতে অব্যাহতি পায়, তাহারই পরামর্শ করিতেছিল, আমি বাধা দেওয়াতে সে সবলে বংশখণ্ড আমার মস্তকে মারিল। মাথা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল। আমার চেতনা শূন্য হইল, আমি পড়িয়া গেলাম।” এই বলিয়া মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিল, সকলেই দেখিল এক দারুণ আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কালাচাঁদ পুনরায় যোড়হাতে বিনীত বচনে কহিল,—“ধর্ম্মাবতার, আমি গোলযোগ শুনিয়া আমার বাড়ীতে দৌড়িয়া আসিলাম, দেখিলাম এই ব্যক্তি ভিতর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সঙ্গীয় একজন স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়া আমার স্ত্রীর নিকট যাইয়া, যে সকল কথার প্রস্তাব করিয়াছিল তাহা আমি মুখে উচ্চারণ করিলে—ধর্ম্মাবতারের ও অন্য কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মানের হানি হইবে। সেই জন্য আমি স্ত্রীলোককে পদাঘাত করি এবং এই দুর্জ্জনকে ও শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে বংশখণ্ড লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়াছিলাম। সে পা পিছলাইয়া কাঠের গুঁড়ির উপর পড়িয়া যায়, তাহাতেই তাহার মাথায় আঘাত লাগিয়াছিল। আমার মা আমার সাক্ষী।” এই সময় এক বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বাবুর পদদেশে মাথা লুটাইয়া কালাচাঁদের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার বৃথা চেষ্টা পাইল। বাবু পদাঘাতে বৃদ্ধাকে দূরীভূত করিলেন। কালাচাঁদ নিজের দোষ স্বীকার করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়, ও শাস্তির জন্য ইংরেজ আদালতে পাঠাইতে পারেন; এই জন্য পূর্ব্ব প্রথানুসারে তাহার বক্ষের উপর এক বিশাল বংশখণ্ড স্থাপিত করিয়া দুইদিকে দুইজন চাপিয়া ধরিল। এই সময় বাবু উঠিয়া অন্যকক্ষে চলিয়া গেলেন। পুরুষদ্বয় বংশের দুই দিকে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন বক্ষে এমন চাপ পড়িল যে,

হতভাগ্য কালাচাঁদের মুখ হইতে জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, চক্ষু জবা-পুষ্পের মত হইয়া মুখের ভাব ভয়ানক করিল। ক্রমে কালাচাঁদের মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। মুখের ভাব অধিকতর ভীতিব্যঞ্জক হইয়া উঠিল। সে দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া অনেকে চলিয়া যাইতে লাগিল। কালার মা অশান্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রতিকান্ত ধৈর্য্য ধরিয়া এতক্ষণ সেই পৈশাচিক দৃশ্য দেখিতেছিল। কালাচাঁদ যাতনায় অস্থির হইয়া গোঙ্গাইয়া কহিল—"প্রাণ যায়, প্রাণ যায়—আর যাতনা সহিতে পারি না—কেশবশঙ্কর বাবু আর ধর্ম্মাবতার তোমাদের মনে কি এই ছিল—ঈশ্বর অধীনের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

রতিকান্ত প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, অকস্মাৎ কেশববাবুর নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, মনে মনে বলিল, একি নরেন্দ্রলাল বাবুর পুত্র? সে কি এই অভিনয়ের নায়ক? এই সময় কালা রক্তবমন করিল। সমুদয় মুখ রঞ্জিত হইল। রক্তমাখা পিঙ্গল চক্ষু দুইটী বিকট ভাব প্রকাশ করিল। কালা ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। রতিকান্ত আর দেখিতে পারিল না। ভয়ে দুঃখে ও যন্ত্রণায় কিয়দ্দূর সরিয়া গেল। এই সময় কালার অস্ফুট-স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে বলিল—"মা,—সুন্দরী ঘরে রইল—তার কেউ নাই—ধর্ম্ম, তুমি তাহাকে রক্ষা কর—মা—দুর্গা—অধম সন্তানকে অন্তে দর্শন দাও।"—রতি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখে, দর্শকেরা চলিয়া যাইতেছে, সকলের মুখ ভার, কেহই সন্তুষ্ট নহে। একজন অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে কহিল—"যে দিন মহারাজার মৃত্যু হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই রাজ্যের লক্ষ্মী গিয়াছেন, আর এ রাজ্যে বাস করা শ্রেয়ঃ নহে।"

ঘটনাস্থলে রতিকান্ত পুনঃ উপস্থিত হইয়া দেখে, কালাচাঁদের দেহ

স্থানান্তরিত ও কিঙ্করগণ অন্তর্হিত। কেবল অনাথিনী কালার জননী জ্ঞানশূন্যা হইয়া ভূমে পড়িয়া আছে। রতিকান্ত ধীরে ধীরে ব্যজন করিতে লাগিল। ক্রমে চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে না দেখিয়া চাৎকার করিয়া কহিল—"কে কালা আমার কোথায়? তা'কে যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না—সে কই—হ্যাগা, তুমি জান, আমার কালা কোথায়? সে কি আছে? প্রাণে বেঁচে আছে ত? দেখ্‌তে পাব ত?"

রতি। কেঁদনা—বাড়ার ভিতর গেছে—ভয় কি? এখনই দেখ্‌তে পাবে?

বৃদ্ধা। বাবা, তুমি কে? সে যে আমার এক ছেলে—বংশধর, অন্ধের নড়ি, বাবা সে চোর নয়, তবে কেন তাকে চোরের মত মারিতেছে?

এই কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু কালার নির্গত শোণিতের উপর পড়িল। অমনি ভয়বিহ্বলা হইয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল। শেষে পুনরায় হতচেতন হইয়া ভূমে পড়িয়া গেল। একজন দ্বারবান সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধাকে তুলিয়া লইয়া গেল। রতিকান্ত বিষণ্ণ মনে বাটী পরিত্যাগ করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে দূরে গেল। আপনার বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া গেল। মনের স্থিরতা রহিল না। যে দিকে পথ দেখিল, পা সেই দিকে ধাবিত হইল! গৌরমোহনের নির্দ্দয়তা স্মরণ করিলে, তাহার আশ্রয় লইতে মনের প্রবৃত্তি হয় না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গতরাত্রের অনিদ্রা, পথশ্রান্তি, তাহার উপর মনোকষ্ট তাহাকে অস্থির করিয়া ফেলিল। নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণীতে মুখ প্রক্ষালন করিয়া শীতলজল পান করিল। আম্র বৃক্ষের ছায়ায় বাঁধাঘাটের উপর শয়ন করিল। অমনি বিরামদায়িনী নিদ্রা অভাগাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বিবাহে চ ব্যতিক্রম।

নরেন্দ্রলাল বাবুর বাটী আজ লোকে লোকারণ্য। কত লোক যাইতেছে, কত লোক আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। গ্রামের ও নিকটস্থ প্রদেশের সমুদয় ভদ্রলোক একত্র হইয়াছেন। দেবমন্দির দরিদ্র লোকে পূর্ণ। "ভাত আন, মাছ আন, মিষ্ট আন," এইরূপ শব্দ অনবরত হইতেছে। সকলেই বলিতেছে, কৃষ্ণশঙ্করের বিবাহে বড় ঘটা। কেশবশঙ্কর কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। বিনোদিনী আজ নানা অলঙ্কারে ও বেশ ভূষায় বিভূষিতা হইয়া দাস দাসীর উপর মনোসুখে ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে। গৃহিণী নরেন্দ্রলাল বাবুর সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিতেছেন। কুটিলা বামা তসর কাপড় পরিয়া, গল-দেশে স্বর্ণমালা দোলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কখনও বা ভবশঙ্করকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতেছে,—"রাঙ্গা বউ আসবে—তোমার খুড়ীমা হইবে—তোমায় কোলে করিবে ?" মৃদু মৃদু হাসিয়া ভব বলিতেছে,—"খুইমা—খুইমা আমায় ভালবাসিবে ?"

কৃষ্ণশঙ্করের বিবাহে দশ সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আলোক, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে আহ্বান ও ভোজনের জন্যও এইরূপ অন্যান্য কর্ম্মে তিন সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, আর দরিদ্রগণকে অন্ন বস্ত্র, অনাথিনী বিধবা, পিতৃহীন বালক বালিকার ভরণ পোষণ, বিদ্যাদান, চতুষ্পাঠী ও নিকটস্থ তাবৎ বিদ্যালয় ও এইরূপ

স্থায়ী সৎকর্ম্মের জন্য সপ্ত সহস্র মুদ্রা রাখা হইয়াছে। আধুনিক ধনীদিগের ন্যায় অলীক আমোদে, নৃত্যগীতে, তিনি অর্থ ব্যয় করিতে জানিতেন না। পরলোকে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, পরদুঃখ দেখিলেই তাঁহার মন বিগলিত হইত। তিনি বলিতেন,—"পৃথিবী ঈশ্বরের রঙ্গভূমি। আমরা অভিনেতৃগণের ন্যায় রঙ্গভূমে খেলা করিতেছি। খেলা ফুরাইলে, রাজ-পরিচ্ছদ, রাজসুখ অথবা ভিখারীর বেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে গমন করিতে হইবে। তবে কেন ক্ষণস্থায়ী সুখ দুঃখের জন্য মনুষ্য এত চিন্তা করিবে? অকিঞ্চিৎকর অর্থ হইলেই অভিমানে অজ্ঞান হইবে? দৈন্য দশায় পতিত হইলেই দুঃখে বিহ্বল হইবে?"

রজনী তিন প্রহর অতীত। কৃষ্ণশঙ্কর আপন শয্যায় বসিয়া আছেন। সম্মুখে সামাদানে বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে। বহির্ব্বাটীর দ্বার রুদ্ধ। প্রভাত অপেক্ষা করিয়া পরিজনেরা নিদ্রাগত হইয়াছে। এই রজ-নীর অবসানে, কৃষ্ণশঙ্করের বিবাহ হইবে। ভাবী স্ত্রী অতি সুন্দরী ও গুণবতী। কৃষ্ণশঙ্করের বয়ঃক্রম এখন পূর্ণ দ্বাবিংশতি বৎসর। যৌবন সমাগমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণবিকাশিত হইয়াছে। দেহ বলিষ্ঠ, বক্ষঃস্থল আয়ত, বাহুযুগল লৌহ অর্গলের ন্যায় দৃঢ়। তাঁহার নয়ন যুগল যেন সতত তেজঃ, সাহস ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করে। বাস্তবিক তাঁহাকে দেখিলেই যেন দর্শকের অন্তর নাচিয়া উঠে। তাঁহার স্বর যেমন মধুর, স্বভাব সেইরূপ নম্র। তিনি ধর্ম্মের নিকট সতত অবনত মস্তকে অবস্থান করেন, কিন্তু অধর্ম্মের নিকট ব্যাঘ্র বিশেষ। অধর্ম্মকে জয় করিতে তাঁহার সাহস, পরাক্রম, ধৈর্য্য প্রভৃতি কিছুরই অভাব হইত না। রতিকান্ত বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার দুঃখের ও ক্রোধের সীমা ছিল না। কিন্তু কি কারণে তিনি তাঁহাকে সংবাদ না দিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার কিছুমাত্র কারণ অবগত হইতে পারেন

নাই। বাটীর পরিজন—এমন কি তাঁহার জননীও তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই। প্রভাবতীও নিগূঢ় কারণ জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। যাহা বুঝিয়াছিল—তাহা লজ্জার বা অন্য কারণে কিছুমাত্র কৃষ্ণশঙ্করকে বলে নাই। অগত্যা অনন্যোপায় হইয়া তিনি মনের বেগ সংযত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই সুগভীর রজনীতে আজ তিনি শয্যায় উপবেশন করিয়া কপোলে দক্ষিণ হস্ত প্রদান করত অপার চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। বর্ত্তিকার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ তাঁহার হেমবর্ণে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতেছিল। বামহস্তের উপর ভর করিয়া, না শয়ন, না উপবেশন করিয়া কতক্ষণ একাগ্রমনে কি চিন্তা করিলেন। তাঁহার বসিবার ভঙ্গিটী অতি চমৎকার! যেন মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজী যবন কারাগারে আবদ্ধ হইয়া গভীর নিশীথে পলায়নের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন।

তিনি উঠিলেন, বাতায়ন মুক্ত করিয়া দেখিলেন, আকাশের সুরবালারা নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বদিকে শুকতারা উঠিয়া রজনীর ভালে যেন কহিনুর বা কৌস্তুভমণির ন্যায় চিক্ চিক্ করিতেছে; তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। সৈনিক পুরুষের ন্যায় অঙ্গে লৌহ বর্ম্ম ধারণ করিলেন, মস্তকে বৃহৎ উষ্ণীষ পরিলেন। কটীদেশে করবাল ও একখানি কিরীচ ঝুলাইলেন। কিরীচ খানি বিলাতী। যেমন কার্য্যকর, তেমনই সুন্দর। ধরিবার নিকট 'রিবলবার' সংযোজিত ছিল। তিনি তাহার ছয় মুখ "কারটি্জে" পূর্ণ করিলেন। একটী মণিবেগ ও একখানি চিঠি গ্রহণ করিয়া বহির্ব্বাটীতে নিঃশব্দে নামিয়া আসিলেন। অশ্বশালা হইতে তাঁহার প্রিয় এক সুদৃঢ় ঘোটকী আনয়ন করিয়া, একলম্ফে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। খট্ খট্ করিতে করিতে ঘোটকী রজনীর অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

ক্রমে পূর্ব্বদিক্ লোহিত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া কোন কবি ভাবে গদ গদ হইয়া বলিলেন,—'তপনের আগমন সংবাদ পাইয়া লজ্জায় উষাসুন্দরীর গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।' দ্বিতীয় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন,—'উষার সহিত দিনমণির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে,—প্রাতঃকালে লগ্নস্থির, কাদম্বিনী বরণ করিবার জন্য লাল শাড়ী পরিয়া অপেক্ষা করিতেছে।' তৃতীয় কহিলেন,—'না হে তাহা নয়, আজ সূর্য্যদেব রজনীর বস্ত্রহরণ করিবেন বলিয়া কর প্রসারণ করিয়াছেন, দেখিতেছ না লজ্জায় রজনী ধূসরবর্ণা ও বিবস্ত্রা হইয়া পর্ব্বতের আড়ালে পলাইতেছে?' একজন ন্যায়বাগীশ বাহির হইয়া কহিলেন,—'কবির কল্পনা মিথ্যা—ন্যায় শাস্ত্রে বলিতেছে, কার্য্য দেখিয়া কারণ স্থির করিবে, অথবা কারণ দেখিয়া কার্য্য স্থির করিবে। এখানে অগ্নিবর্ণ আভা কার্য্য—পূর্ব্বদিকে গৃহদাহ হইতেছে—সেই কারণ অগ্নির এই আভা কার্য্য।' এই সময় পাঁজি হাতে করিয়া এক গণক-ঠাকুর উপস্থিত। তিনি বলিলেন,—'এখানে কবি বা ন্যায়ের কিছুরই আবশ্যক নাই,—এক জ্যোতিষই এই বিবাদের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিবে। আজ অমাবস্যা, ভরণী নক্ষত্র, মেষ রাশি—সুতরাং রাহু আসিয়াছেন সূর্য্যকে গ্রাস করিতে। সূর্য্য ক্রোধে মহালাল হইয়াছেন, হইবারই কথা, তিনি গ্রহের রাজা। রাহুকে দেখিয়া ঐ মেষরাশি মেঘের পার্শ্ব দিয়া পলাইতেছেন।'

যখন উষাকে দেখিয়া গঙ্গার সৈকত বেদীতে, কবি, নৈয়ায়িক ও গণক গোলযোগ করিতেছিল, তখন কৃষ্ণশঙ্কর এক ক্ষুদ্র কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া দ্বার ঠেলিতেছিলেন। একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া দিল। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, তাহাকে এক খানা চিঠি দিলেন ও মুখে দুই চারি কথা বলিয়া দিলেন। শেষে

তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন যেন, এই কথা লইয়া সে পাড়ায় গোলমাল ও পত্র দিতে দেরি না করে। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তুরঙ্গী পৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন।

বেলা তিন প্রহর। বাটী হইতে দ্বাদশ ক্রোশ আসিয়াছেন। কত প্রান্তর, সরোবর নদী, নগর পার হইতে হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় ছিল না। কোন স্থানে বালকেরা ঘোটকের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া 'সাহেব সাহেব' করিয়া চীৎকার করিয়াছিল; কোন সরোবরে ফুল্ল কমলিনী সদৃশা কামিনীদল উৎফুল্ল নয়নে অশ্বারোহীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিল, নিমেষে তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন; দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কামিনীগণ স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। ক্রমে তিনি নগরের বহির্ভূত হইলেন। পূর্ব্বগিরির পার্শ্ব দিয়া এক ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ সরল পথে গমন করিলে, পর দিনই রাজধানীতে পৌছিতে পারিবেন, এই স্থির করিয়া তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। যতই যাইতে লাগিলেন, ততই অরণ্য গভীরতর হইতে লাগিল। এই বনভূমি প্রস্থে প্রায় দশ ক্রোশ, পশ্চিমে পূর্ব্বগিরির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, সুতরাং সে দিকে সীমা নির্দ্ধারিত করা দুঃসাধ্য।

তিনি প্রায় দুই ক্রোশ আসিয়াছেন, পথ সঙ্কীর্ণ হইলেও ঋজু। ঘোটকী নক্ষত্র বেগে ছুটিতেছে। দুই পার্শ্বে শালবৃক্ষ নিস্তব্ধে তাঁহার অশ্ববেগ দেখিতেছে। মধ্যে মধ্যে বায়ু আদরে বালকের ন্যায় গাছের পাতা নাড়িতেছে। এই সময় এক ক্ষুদ্র কুটীরে একজন কর্ম্মকার লৌহ পিটিতেছিল। অশ্বারোহীকে দৃষ্টি করিয় উঠিয়া দাঁড়াইল। কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু ঘোটকীর বেগ সংযত হইল না দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,- 'অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইবে? প্রবল স্রোতের গতি কে রোধ করিবে? পরের ভাল করা সকলের ধর্ম্মে সহে না।'

কর্ম্মকার পত্নী স্বামীর কথা শুনিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়া কহিল,—"একাকী কি বকিতেছ ?"

"বক্‌চি ভাল। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া পরলোকের কায করিতে উঠিয়াছিলাম। সাধু বলিয়াছিলেন, পরের বিপদ্ যদি তুমি দেখিতে পাও, তবে তাহাকে সাবধান করিবে। তার কপালের লেখা কে ঘুচাইবে ? আর পরের ভাল করা আমার ধর্ম্মে সবে না।"

"ঘোড়া ক'রে গেল কে ?"

"জানি না—বোধ করি রাজার কোন সিপাহী হইবে, ঘোড়ার এমন তেজঃ কখন দেখি নাই;—সিপাহীর শরীরেও অসাধারণ ক্ষমতা, আমাদের সেনাপতি কোথায় লাগে;—আজ একটা ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হইবে, আমার বামচক্ষু নাচিতেছে।"

পত্নী ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—"একজনে কি করিবে ?"

"হাঁ—তা বটে—তবে আগুন হইলে একটুতে যথেষ্ট।"

"আজ এ ভাব কোথা হইতে এল ?"

"ঐ ঘোড়সওয়ারকে দেখে—সে দেখিবার জিনিস বটে।"

পত্নী গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেল। কর্ম্মকার আপন কর্ম্মে উপবিষ্ট হইল। সে লৌহের ব্যবসা ভিন্ন, পথশ্রান্ত পথিকদিগের জন্য চিড়া, গুড়, কলা প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিত। যে কেন হউক না, অরণ্য পার হইবার পূর্ব্বে একবার কর্ম্মকারের দোকানে প্রবেশ করিয়া তামাক খাইতে বসিবে ; দুর্গম পথের কথা জিজ্ঞাসা করিবে, ব্যাঘ্রভয় কি প্রকার, দস্যু চোর আছে কি না, মাঠের মধ্যে পথ কি প্রকার, দুই চারিদিনের মধ্যে কোন দস্যুতা কি নরহত্যা হইয়াছে কি না,—এই প্রকার এক শত এক প্রশ্ন পথিকেরা হুঁকা হাতে জিজ্ঞাসা করিবে। আর কর্ম্মকার লৌহ পিটিতে পিটিতে ভয়ানক ভয়ানক গল্প খুড়িয়া দিবে

কখন বা পথিকদিগকে উপদেশ দিবে, ভীত দেখিলে সাহস দিবে, সাহসীকে ভয় দেখাইবে। কর্ম্মকারের বয়ঃক্রম প্রায় ষষ্টি বৎসর। সময়ের ভারে কটীদেশ যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, শরীর রুগ্ন; কিন্তু চক্ষু সতেজ, পথিকের অন্তরে প্রবেশ করিয়া মনের কথা টানিয়া আনিতে পারিত। তাহাকে সকলে রামধন কর্ম্মকার বলিয়া ডাকিত। সে ভিন্ন নিবিড় বনে রাস্তার ধারে আর কাহাকেও বাস করিতে দেখা যাইত না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বিজন বিপিনে।

অশ্বারোহী এখন গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন। দুই চারি ক্রোশের মধ্যে জনপ্রাণী নাই। তিনি কর্ম্মকারের দোকান হইতে এক ক্রোশ আসিয়া সম্মুখে দুইটী বর্ত্ম দেখিলেন। যে পথ ডাইন দিকে গিয়াছে, তাহা অতিশয় বক্র ও অপ্রশস্ত। মনুষ্যের পদচিহ্ন নাই। দ্বিতীয় বর্ত্ম অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও পরিষ্কার ও সরল ভাবে অনেক দূর গমন করিয়াছে। গো ও মনুষ্যের পদচিহ্নও অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তিনি সন্দিহান হইলেন। মনে মনে অনেক তর্ক বিতর্ক করিলেন। দক্ষিণে রঘুনাথগড়, বামে পূর্ব্বঘাট। তাঁহার গন্তব্য পথ রঘুনাথগড়ে। সমুদ্র তীরস্থ প্রদেশ হইতে সর্ব্বদাই লোকজন নানা প্রকার কাজ কর্ম্মের উপলক্ষে রঘুনাথগড় রাজধানীতে যাইত। অথচ দক্ষিণের পথ বক্র ও এমন অপরিষ্কার যে, দেখিলে বোধ হয়, কোন কালে কেহ সে পথে গমন করে নাই। অবশেষে এই স্থির করিলেন যে, বামের পথ পশ্চিমোত্তর দিকে কতকদূর যাইয়া, পরে রঘুনাথগড়ের দিকে ধাবিত হইয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি বাম পথে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন. কিন্তু ঘোটকা কিছুতেই সে পথে যাইবে না। অশ্বারোহী ঘোটকার অবাধ্যতা দেখিয়া মনে মনে বড় বিরক্ত হইলেন। পৃষ্ঠে কশাঘাতের ভয় দেখাইয়া বাম বল্গা টানিয়া ধরিলেন, তত্রাচ

ঘোটকী শুনিল না। সে ডাইনের পথে গমন করিবে। কৃষ্ণশঙ্কর তাহার সম্মুখ ভাগ থাবড়াইয়া কহিলেন,—"উর্ব্বশী! বাঁ দিকের রাস্তাই ঠিক্—তুমি আমার অপেক্ষা কি ভাল বুঝিবে? ছি দুষ্টামি করিও না।" উর্ব্বশী মাথা নাড়িল। বুদ্ধিমান সেই মস্তক নাড়া দেখিলে বুঝিতেন যে, সে ইঙ্গিত করিয়া কহিতেছে— 'আমি বুঝিয়াছি—ও পথে আমি যাইব না—ও পথ বিপথ।" কৃষ্ণশঙ্কর তাহার ইঙ্গিতে অগত্যা দক্ষিণ দিকে ফিরিলেন। উর্ব্বশী আহ্লাদে লম্ফ প্রদান করিয়া বক্র রাস্তায় প্রবেশ করিল। অল্পদূর গমন করিয়া রাস্তার অবস্থা, সম্মুখে ক্ষুদ্র নদীর কর্দ্দম ও বালু দেখিয়া তাঁহার স্থির প্রতীতি জন্মিল যে, ইহা প্রকৃত রাস্তা নহে। তখন ফিরিলেন। উর্ব্বশী নিতান্ত অনিচ্ছায় বাম দিকের পথে চলিতে লাগিল। এই সময় ক্রূরগ্রহ রাহু প্রফুল্লচিত্তে কৃষ্ণশঙ্করের মস্তকরন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ মন উদ্বিগ্ন হইল। বামচক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। বাম হস্ত হইতে লাগাম পড়িয়া গেল। ঘোটকী চীৎকার করিয়া উঠিল। এই সকল দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়াও তিনি সাহসে নির্ভর ও তরবারি চুম্বন করিয়া সংযত হৃদয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই স্থানে একটী কথা স্মরণ হইল। অশ্বারোহী ঘোটকের অবাধ্যতা দর্শন করিলে অতিশয় বিরক্ত হন। তিনি মনে করেন, ঘোটকের মতে কার্য্য করিলে, তাঁহার শিক্ষা-চাতুর্য্যের হ্রাস হইবে। এই আত্মগরিমা সময়ে সময়ে সর্ব্বনাশের কারণ হয়। এইজন্য সিম্‌লা পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে লাফাইয়া পড়িবার সময় ককরেল সাহেব চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন। ফিলিপ বিউফোর্ট *

* Night and Morning by Lord Lytton.

অভাগিনী ক্যাথারিণকে কলঙ্কিনী পরিত্যাগ করিয়া অনন্তকালে মিশাইলেন। অশ্বের অবাধ্যতার কারণ অনেক সময় স্থির চিত্তে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। একবার কোন মুসলমান ভূম্যধিকারী তাঁহার জমিদারীতে নূতন বাজার বসাইতে যাইবার জন্য ঘোটকপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ঘোটক কিছুতেই চলিবে না। তিনিও ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। অনবরত কশাঘাত করিতে লাগিলেন। কতক দূর ঘোটক গমন করিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল, আর উঠিল না। তখন তিনি অনেক বিবেচনা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন শুনিলেন যে, নূতন বাজার বসাইতে গিয়া উভয় জমিদারের লোকেরা দাঙ্গা করিয়াছে এবং অপর পক্ষে একজন হত হইয়াছে। তখন তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং প্রফুল্লচিত্তে ঘোটকের মুখচুম্বন করিলেন। আমি একবার পর্ব্বতের মধ্যে পথ হারাইয়া বিষম বিপদে পড়িয়াছিলাম। কিছুতেই যখন পথ স্থির করিতে পারিলাম না, তখন বল্গা ছাড়িয়া দিয়া অশ্বের উপর ভার দিলাম। ঘোটক অনায়াসে সন্নিহিত গ্রামে উপস্থিত হইল। একবার যে পথে অশ্ব গমন করে, তাহা সে কখন ভুলে না। তাহার উপর পশ্বাদির স্বাভাবিক জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের বলে তাহারা আপনাদিগকে সহজে রক্ষা করিতে পারে।

অর্দ্ধক্রোশ গমন করিয়া, কৃষ্ণশঙ্কর এক অপ্রশস্ত পরিষ্কৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই ক্ষুদ্র ময়দানের সঙ্কীর্ণ রাস্তা নানা দিকে চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখস্থ এক অশোক বৃক্ষমূলে এক বৃদ্ধা স্ত্রী যষ্টি হস্তে বসিয়া গুণগুণ স্বরে বিলাপ করিতেছে। তাহার বস্ত্র ছিন্ন, মস্তকের পক্ক কেশ বিশৃঙ্খল ভাবে উড়িতেছে, বর্ণ মলিন। তাহাকে দেখিয়া তিনি চকিত, ভীত ও দয়ার্দ্র হইলেন। বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া কহিলেন,—"তুমি বলিতে পার রঘুনাথগড়ের পথ কোন্ দিকে ?" বৃদ্ধা

নিরুত্তরা থাকিয়া আরও অধিকতর বিলাপ করিতে লাগিল। তিনি পুনরপি কহিলেন,—“বৃদ্ধা, তুমি কিজন্য কাঁদিতেছ? অর্থ চাও?”

এইবার বৃদ্ধা মুখ তুলিল। অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল,—“বাবা, এই পথে আমার পুত্র জন্মের মত গিয়াছে, আমি অভাগিনী, আমার মত হতভাগা কি জগতে আর আছে? আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতে আসিয়াছি।” বৃদ্ধার হৃদয় দুঃখে উথলিয়া উঠিল। মুহুর্মুহুঃ চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। কৃষ্ণশঙ্কর দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন,—“তুমি এখন কি চাও? এখানে বসিয়া থাকিলে কি হইবে?”

“আমার ঘর নাই বাবা, ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে।”

“আমি তোমায় সাহায্য করিতে পারি।”

“তোমার মঙ্গল হউক বাবা—আমার কেহ নাই—আমার অমূল্য ধন নষ্ট হইয়াছে, টাকাতে কি হইবে? যে পথে আমার পুত্র গিয়াছে, সেই পথে আমি যাইব।”

কৃষ্ণশঙ্কর আকাশে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। সূর্য্য নামিয়া গিয়াছে। বনের মধ্যে তাহার কিছুমাত্র কিরণ নাই। বৃথা বাক্যব্যয় করিবার অবসর নাই দেখিয়া, তিনি কহিলেন,—“রাজধানীর কোন্ পথ?”

সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। তাঁহার কেমন সন্দেহ জন্মিল। অথচ কোন্ পথে যাইবেন, তাহা স্বয়ং স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া প্রদর্শিত পথে ধাবমান হইলেন। কৃষ্ণশঙ্কর চলিয়া গেলে, বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইল। চক্ষু মুছিয়া কহিল,—“সমস্ত দিনের পর মা কালীর কৃপা হইল।” এই বলিয়া স্মিতমুখে বনের মধ্যে অদৃশ্যা হইল।

অল্পদূর গমন করিয়া কৃষ্ণশঙ্কর অদূরে দেবমন্দির দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। এ অরণ্যে কে, কি উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র মন্দির প্রস্তুত করিয়াছে? সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক বৃহৎ উগ্রচণ্ডীর মূর্ত্তি বিকট

মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। লোল জিহ্বা হইতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে; দক্ষিণ হস্তের খড়্গ রক্তে রঞ্জিত। সম্মুখে রক্তের ছড়া দেখিয়া বোধ হইল, কোন প্রাণী অনতি পূর্ব্বে নিহত হইয়াছে। এই স্থানে কৃষ্ণশঙ্কর একাকী অশ্বপৃষ্ঠে ভাবিতেছেন; এদিকে সন্ধ্যা হইয়াছে —কোথায় আসিয়াছেন তাহার স্থিরতা নাই।

এই সময় প্রায় বিংশতি পুরুষ কৃপাণ হস্তে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি ক্ষণকাল আত্মবিহ্বল হইলেন, বুঝিলেন দস্যুদলের মধ্যে পতিত হইয়াছেন। একাকী কি প্রকারে বিংশতি জন হইতে আত্মরক্ষা করিবেন, তাহাই ভাবিলেন। অস্ত্রক্রীড়া দ্বারা প্রাণরক্ষা করা দুষ্কর। অথচ বিনীত হইয়া প্রাণ ভিক্ষা করা কাপুরুষের কার্য্য এবং করিলেও কৃতকার্য্যের সম্ভাবনা অল্প। এ সময় তবে কি কর্ত্তব্য? বিদ্যুল্লতা যেমন এক নিমিষে আকাশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা গমন করে, সেইরূপ একমুহূর্ত্তে চিন্তার লহরী উঠিয়া হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিল। সময়ের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি এক বিশাল রসালকে পশ্চাৎ করিয়া অম্লান বদনে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন।

একজন দস্যু বিকট চীৎকার করিয়া কহিল,—"তুই কে?" তিনি নিরুত্তর। আর একজন কহিল,—"তুই কে? কোন্ সাহসে উগ্রচণ্ডার দিকে পশ্চাৎ করিয়া আছিস্—নামিয়া প্রণাম কর্।"

তিনি প্রশান্ত ভাবে বলিলেন,—"তোমরা কে? কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছ? আমার নিকট কোন আবশ্যক আছে?"

তৃতীয় এক ব্যক্তি মৃদুস্বরে হাত নাড়িয়া কহিল,—"তোমার মুণ্ড আমাদের প্রার্থনীয়।"

কৃষ্ণ। কেন?

প্রথম দস্যু। কেন? কেনর আবার অর্থ কি? যম কি উত্তর দিয়া লোকের মুণ্ডপাত করে?

কৃষ্ণ। তোমরা মনুষ্য—মনুষ্যের সকল কার্য্যের কারণ আছে—কারণ বল?

দ্বিতীয়। কারণ আমাদের নিকট নাই। কারণ থাকিলে সেনাপতির নিকট। আমরা হুকুমের দাস। যদি কারণ চাও, অশ্ব হইতে নাম, গলবস্ত্রে দেবীকে প্রণাম কর, আমাদের সঙ্গে দুর্গে চল।

কৃষ্ণশঙ্কর সেনাপতি ও দুর্গ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। স্থির ভাবে কহিলেন,—"আমি সকল শুনিতে পারি, কিন্তু দুইটী বিষয় করিতে পারিব না। প্রথম,—অশ্ব হইতে নামিতে পরিব না, দ্বিতীয়,—কালীকে প্রণাম করিব না।" এইরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বে বোধ হয়, তাঁহার বিক্রমাদিত্য, বেতাল ও সন্ন্যাসীর কথা স্মরণ হইয়াছিল।

এই সময় একজন ক্ষুদ্র কিন্তু সবলকায় পুরুষ উপস্থিত হইয়া কহিল,—"এক মুণ্ডের জন্য এত তর্ক—কত মুণ্ড নিপাত করিলাম, অসির ঝণঝণা ভিন্ন তন্মুখের শব্দ শুনি নাই; আজ কি কালের গতি ফিরিয়া গেল না কি? পশ্চাতে দশজন যাও।

দস্যুদলেরা তাঁহাকে মণ্ডলাকারে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণশঙ্কর যেন জীবনকে তুচ্ছ করিয়া ঈষদ্ধাস্য করিলেন। সেই ক্ষুদ্র পুরুষকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—"দস্যু তোমাকে আমি ঘৃণা করি—তুমি একের সহিত অন্যায় যুদ্ধ করিবার জন্য বিশজন একত্র করিয়াছ?"

তরবারি সঞ্চালনই তাহার উত্তর। দস্যুদলের মুখে আর কোন কথা নাই। তখন তিনি আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্মুখে ও পশ্চাতে যখন একই সময়ে তীব্র তরবারি উঠিতে লাগিল, তখন উর্ব্বশী যেন বুঝিতে পারিয়াই সম্মুখের দুইপা উঠাইয়া পশ্চাতের পদদ্বয়ে দণ্ডায়মান রহিল। এই

অবসরে কৃষ্ণশঙ্কর পশ্চাতে ফিরিয়া শত্রুর তীক্ষ্ণাঘাত স্বীয় করবালে গ্রহণ করিতে লাগিলেন? কিন্তু এই প্রকারে ঘোটকী কতক্ষণ কৃপাণের তীক্ষ্ণাগ্র সহ্য করিতে পারে? তিনি একজনের দর্পচূর্ণ না করিতেই উর্ব্বশী ক্ষত বিক্ষত হইল। রুধিরের স্রোত চারিদিকে বহিল। তিনি নিতান্ত বিমগ্ন হইলেন। দুঃখ হইতে ক্রোধ ক্রমে সমুত্থিত হইতে লাগিল। যেন ঘন ধূম ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। যতই ক্রোধাগ্নি বাড়িতে লাগিল, ততই বিক্রম, সাহস ও ধৈর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন একলম্ফে ভূমে পতিত হইয়া অতর্কিতে একজনের মুণ্ডপাত করিলেন। ছিন্নমুণ্ড ভূমে গড়াইয়া গেল। আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া দস্যুদল তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিল। আসন্নকাল সমুপস্থিত স্থির করিয়া, তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিরীচ বাহির করিয়া রিবলবারের কল টিপিলেন। অমনি বজ্র-নিনাদে বন প্রতিধ্বনিত হইল। দ্রুম্ দ্রুম্ শব্দের সহিত একে একে কতকগুলি দেহ ভূমে পতিত হইল। সন্ধ্যার গৈরিক বর্ণের সহিত ধূম মিশিয়া গিয়াছে। কেহ কাহাকে দেখিতে পাইতেছ না। কৃষ্ণশঙ্কর এই অন্ধকারে পুনরায় রিবলবারে কারটিজ দিতেছেন।

এ হেন সময়ে অজ্ঞাতসারে তাঁহার হস্তের উপর রায়বাঁশের বিষম আঘাত পড়িল। ঝন্ ঝন্ শব্দে হাতের অস্ত্র ভূমে পড়িয়া গেল। বহুব্যক্তি মিলিত হইয়া তাঁহার উপর লম্ফ দিয়া পড়িল। তিনি আত্মস্মৃতি লাভ না করিতেই দস্যুহস্তে বন্দি হইলেন। দস্যুগণ মহোল্লাসে "হল্লা" করিয়া উঠিল। দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া তাঁহাকে দুর্গমধ্যে লইয়া চলিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গমধ্যে।

দেবমন্দিরের পশ্চিম দিকে কতক দূর অরণ্য পার হইলে, একটী সুপ্রশস্ত সুগভীর পরিখা দৃষ্ট হইত। এই পরিখা মণ্ডলাকারে এক খণ্ড ভূমিকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল। তদুপরি একটী সেতু বিনির্ম্মিত। সেতু নির্ম্মাণের একটু নিপুণতা ছিল। আবশ্যক হইলে তাহা জলে ডুবাইয়া বা শূন্যে তুলিয়া রাখা যাইতে পারিত। পরিখার ভিতর দিকে মৃৎনির্ম্মিত প্রাচীর। তাহার উপরিভাগে পুরাতন কঠিন বৃক্ষশাখা প্রোথিত ছিল। দূর হইতে দেখিলে বোধ হইত যেন, তদুপরি কেহ গমন করিতে না পারে এই জন্য লৌহ শলাকা সকল সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সেতু হইতে আঁকা বাঁকা পথ চারি দিকে গমন করিয়াছে। অপরিচিত কোন ব্যক্তি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, দস্যুদলের আবাস-গৃহের পথ বাহির করিতে শীঘ্র সমর্থ হইত না। এই আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া কতক দূর যাইলে আর একটী ক্ষুদ্র পরিখা পাওয়া যাইত। তাহার অপরপারে দস্যুদলের গৃহ। এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর একটি পুরাতন মন্দির ছিল। কোন্ সময়ে কে, কি জন্য ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা কেহই জানিত না। কেহ কেহ কহেন, পাঠানের উৎপাত হইতে হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রঘুনাথগড়ের রাজা তাহা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

কথা কতদূর সত্য, তাহা আমি অনুসন্ধান করিতে অবকাশ পাই নাই। এই মন্দিরের মধ্যে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। শেষ প্রকোষ্ঠর মধ্য ভাগে একটী ক্ষুদ্র সোপান আছে তাহা অবলম্বন করিয়া পাতালপুরে গমন করা যাইত। দস্যুদল এই পাতালপুরীকে কারাগার করিয়াছিল; ধন ও অস্ত্র রক্ষিত করিবার জন্য দুইটা ক্ষুদ্র কুঠারী নির্দ্দিষ্ট ছিল। চার পাঁচটি সেনাবাস ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কামরা সেনাপতির বাসস্থান। এই প্রশস্ত কক্ষে উপবেশন করিয়া সেনাপতি ভীমসিংহ হতভাগ্য পথিক-দিগের বিচার করিত, কাহারও বা ধন লুণ্ঠনের আজ্ঞা দিত, কাহারও বা শিরচ্ছেদন করিত। ভীমসিংহের আকৃতি ভীমের ন্যায় প্রকাণ্ড, বর্ণ কৃষ্ণ, চক্ষু উজ্জ্বল ও বৃহৎ, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। তাহার বয়ঃক্রম পঁয়তাল্লিশ। ভীমসিংহ জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু এখন তাহার তিন পুরুষ উৎকলের রাজার নিকট সুবেদারের কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং উৎকলই ভীমের জন্মস্থান। সে বাল্যকালে ক্রমওয়েল, ক্লাইব, শিবাজী ও জোন আর্কের জীবনের ঘটনাবলি স্কুলে পড়িয়াছিল, সেই অবধি এক ফুৎকারে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবার ইচ্ছা জন্মিল। মেদিনী-পুরের পশ্চিম দিকের বনই তাহার রাজ্য হইল। করদ রাজাদিগের দুরন্ত, অবাধ্য সৈন্যদিগকে লইয়া এক দল বাঁধিল। দুই চারি জন নামীয় চোর ও দস্যু যোগ দিল। এই হিন্দুমঠ দুর্গ হইল, এবং আপনারা পরিখা কর্ত্তন করিয়া আকস্মিক বিপদ্ ভয় দূর করিল। ভীমসিংহ এই স্থানের নাম "স্বাধীন নগর" দিল। উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে, ভারত-বর্ষে দ্বিতীয় রমুলসের আবির্ভাব হইল। ভীমসিংহ স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দিল, এবং অভাগা পথিক বিনষ্ট করিয়া ও স্থানে স্থানে দস্যুতা করিয়া সেনাদল রক্ষা করিতে লাগিল।

ভীমসিংহ তাহার কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছে, দ্বারের নিকট দুইজন

দ্বাররক্ষক দণ্ডায়মান। তাহার পার্শ্বে বিশাল কৃপাণ প্রদীপের আভায় ঝক্‌মক্ করিতেছে। একজন অনুচর যোড় করে সন্ধ্যাকালীন ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিতেছে। এই সময় দস্যুদল কৃষ্ণশঙ্করকে সঙ্গে করিয়া, ভীমসিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেনাপতি তীব্র ও চঞ্চল চক্ষুদ্বয়কে তাহার দিকে ফিরাইয়া কতকক্ষণ একভাবে রহিল। অকস্মাৎ এক অভিনব চিন্তা উপস্থিত হইল। মনে মনে কহিল—"বাঃ অনেকদিনের পর এক সুযোগ উপস্থিত। নরেন্দ্রলাল বাবুর পুত্র,—বড়লোক ও ধনী, সাহস ও পরাক্রমও যথেষ্ট আছে, মনে করিলে কিনা করিতে পারে।" ভীমসিংহ স্বভাব ও স্বরকে অস্বাভাবিক গম্ভীর করিয়া কহিল "তুমি কে?"

কৃষ্ণ। কে জিজ্ঞাসিতেছে?

ভীম। আমি—সেনাপতি—স্বাধীন নগরের রাজা।

কৃষ্ণশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"স্বাধীন রাজা! ইংরাজ ভিন্ন ভারতে স্বাধীন কে? যে স্বাধীন, সে দস্যু—আমি দস্যুকে ঘৃণা করি।"

ভীম। বিবেচনা করিয়া কথা কহিও"—এই বলিয়া সে কৃপাণে হস্ত দিল।

পুনরায় কহিল "তুমি এখন এ রাজ্যের বন্দি—আমি যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারি; আমার আজ্ঞা কে অমান্য করিতে পারে? আজ তোমার বিচার।

কৃষ্ণ। বিচার! দস্যুর নিকট কিসের বিচার?

আরক্ত নয়নে ও গর্ব্বিত বচনে ভীমসিংহ কহিল—"তুই—তুই অধর্ম্ম যুদ্ধে ও অতর্কিত ভাবে পাঁচজন সেনাকে পিস্তলে মারিয়াছিস্—তোর সাহসকে ধন্যবাদ দি, কিন্তু তোর কার্য্যকে নিন্দা করি।

কৃষ্ণ। অধর্ম্ম যুদ্ধ! একি যুদ্ধ! না আত্মরক্ষা? বিশজন

লোক কোন্ বিবেচনায়, কি উদ্দেশ্যে এক জনকে আক্রমণ করিল?—

ভীম বাধা দিয়া কহিল—"তুই অনুমতি না লইয়া এ রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলি, আমার সেনা তোকে ধৃত করিয়াছিল; অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসা তোর উচিত ছিল।

কৃষ্ণ। কখনই নয়—দস্যুর আবার রাজ্য কি?—অধর্ম্মই তাহার বল, পর্ব্বতগুহা তাহার প্রাসাদ, অপহরণই তাহার কর।

ভীম। আমি অল্প সময়ে তোমায় সকল কথা কহিতে ইচ্ছা করি। তোমার জীবন ও মরণ আমার হাতে। আমার কথা শুন,—আমি তোমার সাহস দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তোমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিব, কিন্তু তিনটী প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে হইবে।

কৃষ্ণ। উচিত বোধ হইলে দিব।

এই সময়ে ভীমসিংহ সঙ্কেত করিলে ক্ষুদ্রকায় দস্যু ভিন্ন সকলে কক্ষ হইতে বহির্গত হইল। সেনাপতি কহিল—"প্রভাবতী কোথায়?"

কৃষ্ণ। "কেন?"

ভীম। "প্রশ্ন"

কৃষ্ণ। কারণ না বলিলে আমি বলিব না।

ভীম। তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?

কৃষ্ণ। এ কথা জানিবার তোমার আবশ্যক কি?

ভীম। আছে—উত্তর দাও।

কৃষ্ণ। এ কথার উত্তর দিতে (চিন্তা করিয়া) সম্প্রতি আমি অক্ষম।

ভীম। আমি তোমাকে ধর্ম্মত রাজ্যেশ্বর করিতে পারি; কিন্তু তুমি স্বীকার কর, রাজা হইলে আমার ভাণ্ডারে দশলক্ষ মুদ্রা দিবে, এবং চিরকাল আমার অভিসন্ধি ও কার্য্যের সাহায্য করিবে?

কৃষ্ণ। কি—দস্যুর বলে রাজা হইব, এবং রাজা হইয়া দস্যুকে অধর্ম্মে ও কুকর্ম্মে সাহায্য করিব? কখনই নয়।

ভীম। যুবা, চিন্তা কর—স্বাধীনতা আমার উদ্দেশ্য; হিন্দু গৌরব রক্ষা করাই আমার ব্রত! অধর্ম্ম অধর্ম্ম করিয়া উন্মত্ত হইও না। এখনও তোমার উষ্ণ রক্ত, এই জন্য এই সমুদয় বুঝিবে না। ইংরাজ কে? তাহারা কোথা হইতে আসিয়া কি কারণে ভারত অধিকার করিল? বারাণসীর চেতসিংহকে অন্যায় যুদ্ধে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল; বোকা মিরজাফরকে উপলক্ষ করিয়া বঙ্গদেশ সেরাজের মুখ হইতে কাড়িয়া লইল।—এই সকল কি ন্যায় সঙ্গত? এই কি কর্ম্ম? এই কি ধর্ম্ম? যুবা, বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিও। বঙ্গদেশে আমি স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিব—তুমি যোগ দাও। আমি তোমাকে সর্ব্বসমক্ষে রাজ্যেশ্বর করিব। হাসিও না। সত্য কহিতেছি, তোমার কপালে রাজদণ্ড আছে, আমি নিশ্চয় কহিতেছি তুমি একদিন রাজা হইবে। এই সকল তোমার নিকট রহস্য বোধ হইতেছে। একদিকে মহানদী, অপর দিকে গঙ্গা উত্তরে সিংভূম, দক্ষিণে সমুদ্র; এই বিস্তৃত রাজ্য আমি মনে করিলে, যাহাকে তাহাকে দিতে পারি। তুমি বুদ্ধিমান, স্বদেশ প্রিয়, স্বাধীন যুবকের ন্যায় তিন প্রশ্নের উত্তর দাও।

কৃষ্ণশঙ্কর এতক্ষণ স্থির ছিলেন। এখন তিনি গর্ব্বিত বচনে কহিলেন —"দস্যু! স্বাধীনতার পতাকা হস্তে ধরিলেই কি স্বাধীন হওয়া যায়,—তুমি কি কারণে বিদ্রোহী হইয়া দেশে অশান্তি উৎপাদন করিবে? শত শত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া দেশ ভস্মীভূত করিবে? তোমার আশা দুরাশা। ইংরাজের সহিত তোমার তুলনা হয়? সিংহের সহিত শৃগালের তুলনা? তাঁহারা বাহু ও বুদ্ধিবলে দুর্দ্দান্ত সেরাজের হস্ত হইতে বঙ্গকে রক্ষা করিয়াছেন। সেরাজ অধর্ম্মের অবতার ও দুষ্কর্ম্মের

সাক্ষীস্বরূপ। তাহাকে দূর করিয়া ইংরাজেরা ধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বঙ্গদেশ অত্যাচার স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, ঈশ্বর রক্ষা করিবার জন্য ক্লাইব্‌কে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজনীতি কাহাকে কহে তাহা কোন্ হিন্দু জানে? পরের জন্য, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য নিঃস্বার্থভাবে ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিতে হয়, তাহা কোন্ হিন্দু বুঝিতে পারে? আমি দস্যুর সহিত আলাপ করিতে ঘৃণা বোধ করি; আমাকে শীঘ্র মুক্ত কর, নতুবা তোমার ত্রাণ নাই।"

ভীমসিংহ মুখ আরক্তিম করিয়া কহিল, "যুবক স্থির হও—বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। তুমি এখন আমার হস্তে বন্দি। যদি সম্মত হও ভাল, নচেৎ উচিত ফল পাইবে। আমি আর একবার জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি প্রশ্নের সরল উত্তর দাও এবং আমার প্রস্তাবে সম্মত হও।

কৃষ্ণ। কখনই নয়।

ভীম। রঘুবীর, যতদিন এই ব্যক্তি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিবে ততদিন ইহাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিবে।

কৃষ্ণ। দস্যু, ধর্ম্মের হস্তে প্রাণ সঁপিলাম—দেখিব ঈশ্বরের রাজ্যে বিচার আছে কি না?"

সেই রুদ্রকায় পুরুষ, কৃষ্ণশঙ্করের শৃঙ্খল ধারণ করিয়া দুর্গের গুপ্তদ্বার দিয়া পাতাল পুরে প্রবেশ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—):*:(—

প্রণয় প্রকাশ।

একটী ক্ষুদ্র পল্লীর পূর্ব্বধারে আম্র কাঁঠালের বৃহৎ উদ্যান। পল্লীতে পূর্ব্বে অনেক লোকের বাস ছিল; একবার মারীভয় উপস্থিত হইয়া অধিকাংশ লোককে গ্রাস করিয়া ফেলে; ভয়ে অনেক লোক গ্রামান্তরও হয়। এখন পূর্ব্বের শ্রী নাই। এখানে একখানি ঘর, আবার চারি বিঘা দূরে আর একখানি, মধ্যে বিল বা বন পড়িয়া আছে। দিনের বেলায় শৃগালপাল অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে; কাহাকে ভয় করিবে? লোক নাই। সেই আম্র কাঁঠালের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। বহির্ব্বাটীর সমুদয় গৃহগুলি সমভূমি হইয়াছে কোথাও কড়ি, কোথাও বরগা, দ্বার, জানালা, ইষ্টকরাশি স্থানে স্থানে পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। অন্তঃপুরের শ্রী নাই। দুই তিনটী কুঠারী ব্যতীত সমুদায় অংশ ভূমিসাৎ হইয়াছে। বহির্ভাগ দেখিলে বোধ হয় যেন কেহ এখানে বাস করে। বাটীর কর্ত্তার নাম লোপ পাইয়াছে। কাহার বাটী তাহা কেহ জানে না; কেবল দাওয়ানের বাড়ী, এই এক শব্দ রহিয়া গিয়াছে।

বেলা দশটা। সূর্য্যের প্রখর কর ক্ষুদ্র গবাক্ষ পথে প্রবেশ করিয়া, গৃহ আলোকিত করিয়াছে। সেই কক্ষে গৃহস্থের যে সকল তৈজস পত্র

আবশ্যক হয়, তাহার কিছুরই অভাব নাই। এক খানি খট্টায় শয্যা বিস্তারিত আছে। তাহার উপর এক সুন্দরী যুবতী ঘাড় হেঁট করিয়া একভাবে বসিয়া আছে। একবিন্দুও শরীর নড়িতেছে না। দেখিলে বোধ হয় যেন, কে লক্ষ্মীর প্রতিমা রাখিয়া দিয়াছে। কামিনীর বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর। যুগলচক্ষু আকর্ণ বিশ্রান্ত, যুগ্মভ্রূ অতি সুন্দর, যেন চিত্রকর শলাকা দ্বারা চিত্র করিয়াছে, নাসিকা ও কর্ণ মনোহর, ললাট পঞ্চমীর চন্দ্রের ন্যায় অপ্রশস্ত ও পরিষ্কার। মুক্ত বেণী শিথিল হইয়া উড়িতেছে। শরীরে কোথাও একখানি অলঙ্কার নাই, যেন বনদেবী নিজ্জনে আপনার রূপে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। রমণীর মুখ দেখিলে যথেষ্ট সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

এ কামিনী কে? জীবন আছে অথচ নড়িতেছে না, কারণ কি? কামিনী গভীর চিন্তা সাগরে নিমগ্না রহিয়াছে। আপনার ভাবে আপনি বিহ্বলা। কতক্ষণ স্থির রহিল, কতক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"একি! আমার কি জ্ঞান নাই? একি সত্য,—আমি জাগরিত—না নিদ্রিত? আমার জীবনে প্রয়োজন কি? কাহার জন্য এই অপদার্থ শরীর? এ পৃথিবী কাহার? আমি কাহার? হা ঈশ্বর! অভাগিনী করিয়াই কি আমাকে সৃজন করিয়াছিলে? এই ললাটে দুঃখ ভিন্ন কি সুখ লেখ নাই? মা তুমি কোথায়? কেন আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া রাক্ষসীর ন্যায় ত্যাগ করিলে? আজ আমার জীবনের শেষ দিন,— আজ আশা নিম্মূলিত হইবে, আজ সুখের শেষ হইবে, আজ প্রভা নাম পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে? কৃষ্ণশঙ্কর, এই কি পুরুষের প্রতিজ্ঞা? এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমিত কখনও তোমাকে কপট দেখি নাই, তবে এ কাপট্য আজ কেন দেখাইলে? আমিত কখন তোমার দোষ পাইনি, তবে কেন

আজ গুরুতর দোষে দোষী হইলে? চিরবিশ্বাসী হইয়া অবিশ্বাসের কার্য্য করিলে? প্রিয় হইয়া আজ অপ্রিয় সাধন করিলে? আশা দিয়া আজ কেন সমুদ্র জলে ডুবাইলে? আমিত তোমার ছায়া,—আজ ছায়া ফেলিয়া কায়া কোথায় গেল? তোমার নাম কৃষ্ণশঙ্কর, কিন্তু আমার নিকট তুমি কৃষ্ণজীবন,—কৃষ্ণ ভিন্ন এ জীবন যে একদণ্ড থাকিতে পারে না। হায়! অভাগিনীর কি দোষ দেখিলে? কি দোষ দেখিয়া হতভাগিনীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে চলিলে? বিবাহ—শব্দ শুনিলে মন চমকিয়া উঠে। এই বিবাহ কপাল গুণে কোথাও অমৃত ও কোথাও বিষের আধার—সুখ দুঃখের কারণ। তুমি বিবাহ করিবে এ আমার কল্পনার অগোচর। বিবাহ হইলে কি প্রণয় ভুলিবে? তুমি ভুলিলে আমিত ভুলিব না। এ আগুণ কেমন করিয়া মনে মনে শীতল করিব? এই আগুণে আমি পুড়িয়া মরিব। প্রিয় সুহৃদ্! তুমি আমার হৃদয়েশ্বর হইয়া কেমন করিয়া আর একজনকে প্রণয় সম্ভাষণ করিবে? কেমন করিয়া এ প্রণয়ের ছবি মুছিয়া ফেলিবে?—আমার কৃষ্ণজীবন কি এত নিদয়, এত অবিশ্বাসী হইতে পারে? কখনই নয়। যে কৃষ্ণজীবনের মুখের ভাব দেখিলে আমার মনের কথা আপনাপনি বাহির হইয়া পড়ে, মনের বেগে হৃদয় উচ্ছাসিত হয়, যাহার সরল আলাপে আমার চিত্ত চকোর মুগ্ধ হয়, সেই জীবনকৃষ্ণ কি আমায় অকারণে. এমনই ভাবে ত্যাগ করিতে পারে? কখনই নয়। মন. একি কখন বিশ্বাস হয়? কিন্তু—পিতার অনুরোধে, মাতার আজ্ঞায়, সমাজের ভয়ে, অভাগিনীর গ্রহদোষে যদি কৃষ্ণ জন্মের মত পর হয়, তাহা হইলে কি প্রভা আর পৃথিবীতে মুখ দেখাইবে? বিধাতা জন্মদুঃখিনীকে আর দুঃখিনী করিতে পারিবেন? কখনই নয়। এই প্রভা তখন পাষাণে বুক বাঁধিয়া

পাষাণী হইবে। তখন কি আর পৃথিবীর সুখ দুঃখ তাহাকে মোহিত করিতে পারিবে? প্রভা তখন সন্ন্যাসিনী হইয়া কঠোর যোগে মগ্ন হইবে; বিধাতার রাজ্য ছাড়িয়া স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে! আজ আমার পরীক্ষার দিন—”

প্রভাবতী আপনার ভাবে কখন বিহ্বলা, কখন আশান্বিতা, কখন বা পরোধিতা হইতেছিল। শারদীয় গগনের ন্যায় একদিকে সৌদামিনী, মধ্যে কাদম্বিনী, অন্যদিকে সহস্রমালী উদয় হইয়া স্বভাবের বিচিত্র ভাব প্রকাশ করিতেছিল। প্রভা কাঁদিবে না ভাবিবে, না স্থির হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিবে, কিছুই যখন নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছিল না, তখন দ্বারাঘাত হইল। প্রভা কম্পিতস্বরে কহিল—“কে?”

“দ্বার খোল”

দ্বারোদ্‌ঘাটিত হইবা মাত্র, এক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক, হস্তে পত্র প্রদান করিয়া কহিল,—“ঠাকুরাণী! আমার বসিবার সাবকাশ নাই—আমার ঘরে কেহ নাই, আমি চলিলাম।” সে চলিয়া গেল।

হস্তাক্ষর দেখিয়া প্রভার অন্তর নাচিয়া উঠিল। পত্র চুম্বন করিয়া পাঠ করিতে লাগিল। প্রণয় কম্পিতহস্তে কৃষ্ণশঙ্কর লিখিয়াছিলেন—

“প্রভা!

প্রণয় কি পদার্থ তাহা প্রণয়ী ভিন্ন আর কেহ বুঝিবে না। প্রথম যে দিন তুমি আমাকে দেখিয়া মুখ ভূমে নামাইলে, চক্ষু তুলিয়া আমাকে দেখিতে পারিলে না, অথচ দেখিবার জন্য অস্থির হইয়াছিলে; কথা কহিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, অথচ স্বর ভঙ্গ হইল বলিয়া কতক্ষণ কথা বাহির হইল না, পরে একটী একটী কথা ঝির্ ঝির্ করিয়া মুক্তার ন্যায় বাহির হইতে লাগিল, সেই সময় আমারও কেমন ভাবান্তর হইল।

যেমন অন্ধের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে, সে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হয়; আমারও ঠিক সেইরূপ হইল। মনে হইল যেন এক অভিনব বিচিত্র জগতে নূতন প্রবেশ করিলাম। এতদিন তোমার সৌন্দর্য্যের, তোমার স্বভাবের, তোমার সরলতার, তোমার ভালবাসার গৌরব বুঝিতে পারি নাই। সেই দিন পূর্ণ মাত্রায় বুঝিতে পারিলাম। প্রভা! সেই দিন সুখের দ্বার খুলিয়া গেল। সেই দিন কমল কলি প্রস্ফুটিত হইল। সেই দিন প্রথম সৌরভ বাহির হইল! সেই দিন কমলিনীর সৌন্দর্য্যে আমি বিমোহিত হইলাম। কমলকলি ও হৃদয়কলি এক। কেমন ধীরে ধীরে, কেমন অল্পে অল্পে, একটু একটু করিয়া কলি ফুটিয়া সৌগন্ধ বাহির হয়। প্রভা! সে কথা কি কখনও আমি ভুলিতে পারি? আজ পরিণয়ের দিন স্থির, কিন্তু এই পত্র তোমার হস্তে পৌছিবার পূর্ব্বে আমি বাটী হইতে অনেক দূরে থাকিব। আমি তোমার পিতা মাতার অন্বেষণে বাহির হইলাম। তোমার মাতা রত্ন প্রসবিনী। আমি তাঁহার রত্ন. তাঁহার অঙ্কে স্থাপন করিয়া, পরে তোমায় বিবাহ করিব। প্রভা! আমাদের দেশের সমাজ কি জঘন্য! সমাজ সরলতা, সৌন্দর্য্য, সদ্গুণ কিছুই দেখে না; কেবল কুল, শীল, বংশ মর্য্যাদা দেখে। এই জন্য কুলীনের কুলাঙ্গার সমাজের অলঙ্কার। ধিক্ বঙ্গ সমাজে! ধিক্ বাঙ্গালীর জীবনে!

প্রতি সপ্তাহে তোমায় পত্র লিখিব তজ্জন্য চিন্তা করিও না।

তোমার কৃষ্ণজীবন।”

শরতের আকাশে যে একটু মেঘ ছিল, তাহা এই পত্র পাঠে অপসারিত হইল। যুবতী বার বার পত্র পাঠ করিতে লাগিল, তত্রাচ তৃপ্ত হইল না, যেন অমৃত পানে উন্মাদিনী হইয়া উঠিল।

কোথা হইতে প্রভা কাহার এই ভগ্ন অট্টালিকাতে আসিয়া

উপস্থিত হইল? নরেন্দ্রলাল বাবু এই বাটীতে বিবাহ করেন। বিবাহের অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হয়। তাঁহার এক পুত্র ছিল, সেও নিঃসন্তান হইয়া অনেক দিন গত হইয়াছে। এখন একবৃদ্ধা বিধবা আছেন। তিনি কৃষ্ণশঙ্করের মাতুলানী। নরেন্দ্রলাল বৃদ্ধাকে আপন বাটীতে আনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বৃদ্ধা স্বামীর ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া কাশী যাইতেও সম্মতা ছিলেন না। অগত্যা নরেন্দ্রবাবু তাঁহাকে মাসিক ব্যয় পাঠাইয়া দিতেন। কেশবের অত্যাচার দেখিয়া কৃষ্ণশঙ্কর প্রভাকে এই জনশূন্য স্থানে রাখিয়াছিলেন এবং পিতাকে বলিয়া মাতুলানীর আয় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তদবধি প্রভা ভগ্নগৃহে লক্ষ্মীর ন্যায় উদিতা হইল।

কৃষ্ণশঙ্করের বিবাহ উপলক্ষে মাতুলানী নারায়ণগড়ে গমন করিয়াছেন; সুতরাং প্রভা একাকিনী আছে। রাত্রিকালে একজন পরিচারিকা তাহার নিকট শুইতে আসিত। এক দিন দুই দিন করিয়া এক সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু মাতুলানী প্রত্যাগমন করিলেন না। প্রভা উদ্বিগ্ন হইল। যে স্ত্রীলোক রাত্রিতে শয়ন করিত, সে তখন গৃহকর্ত্রীর বিলম্ব দেখিয়া আর আসিত না। এইরূপ জনশূন্য পল্লীর একপার্শ্বে, ভগ্ন গৃহে, একাকিনী বাস করা, প্রভার পক্ষে ভয়ানক কষ্ট-দায়ক হইয়া উঠিল। রাত্রিতে নিদ্রা হইত না। বৃক্ষশাখার সংঘর্ষণ শব্দ শুনিলেও মন বিচলিত হইয়া উঠিত; অভাবনীয় ভয়ে ভীতা হইত।

পঞ্চদশ দিন গত হইল; মাতুলানী এখনও ফিরিলেন না। নারায়ণগড়ের কোন সম্বাদ নাই। কৃষ্ণজীবনেরও কোন উদ্দেশ নাই। একদিন রাত্রে প্রভা একাকিনী শয্যায় শয়ন করিয়া, নানা প্রকার চিন্তা করিতেছে; শয়নের নিকট একটী প্রদীপ মিট মিট করিয়া

জ্বলিতেছে। বহির্দ্দিকে ভয়ানক অন্ধকার। আকাশে নক্ষত্রমালা মেঘের কোলে নিদ্রিত। এই সময় মুক্তগবাক্ষপথে মনুষ্যছায়া দেখিয়া প্রভা চমকিয়া উঠিল। সাহসে ভর করিয়া উঠিয়া বসিল, চীৎকার করিয়া বলিল;—"তুমি কে? কি মনে করিয়া এখানে আসিয়াছ?" উত্তর কেহই দিল না। মনুষ্যদেহ ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশাইয়া গেল। সে তখন শয্যা হইতে উঠিয়া দ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, লৌহ অর্গল হিমাচলের ন্যায় স্থির রহিয়াছে। গবাক্ষ বন্ধ করিয়া মনে মনে কহিল,—"একে? কিজন্য এখানে আসিয়াছে? একি চোর? চোর হইলে গবাক্ষের নিকট আলোর সম্মুখে কেন আসিবে? জাগরিত মনুষ্যের নিকট কি চোর আসিতে পারে? এ চোর কখনই নয়। এ কি ছায়া? না ভ্রম? ভ্রম কখনই হইতে পারে না। মুখ বিকট—অথচ আমার নিকট কেমন একটু মধুর বোধ হইল; যেন তাহার অন্তরে দয়া আছে। আমার দুঃখ দেখিয়া কি এ আসিয়াছে? আমার দুঃখই বা কি? কৃষ্ণজীবন আমার,—আমি তাহার, তবে আমার দুঃখ কি? কিন্তু এ কে? ইহাকে কি কোথাও দেখিয়াছি? মনে ত পড়ে না।"

এই প্রকার চিন্তায় রজনী অতিবাহিত হইল। পরদিন বেলা দশটার সময় মাতুলানী একজন চাকর ও একজন পরিচারিকা সঙ্গে করিয়া আপন বাটীতে উপস্থিত হইলেন। প্রভা হাস্যমুখে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া মাতুলানীর চক্ষুজলে বুক ভাসিয়া গেল। মুখে কথা নাই—একপ্রকার সংজ্ঞাশূন্যা। পরিচারিকা হস্ত ধরিয়া গৃহমধ্যে লইয়া আসিল। প্রভা চকিত হইল যেন গুরু আঘাতে হৃদয় নিষ্পীড়িত হইল। উদ্বিগ্নমনে জিজ্ঞাসিল,—"মামামা, কি হইয়াছে? সকলে ভাল আছেন ত?"

মাতুলানী গগনভেদী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"কৃষ্ণ—বাবা, তুমি কোথায় রহিলে? আজ পনের দিন তোমার সম্বাদ নাই – শেষে কি বাবা অনাথের ন্যায় ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাইলে?" প্রভা অবাক্; কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া মামীকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি নিজের ভাবে বিভোর হইয়াছেন, শোক উথলিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং প্রশ্নের উত্তর কে দিবে? পরিচারিকা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে কহিল—"ছোট বাবুকে ডাকাতে মারিয়াছে।"

প্রভা ব্যগ্র হইয়া কহিল,—"কোথায়? কোন্ সময়? কে দেখিয়াছে?"

"এক বনে তাঁহার মরা ঘোড়া পাওয়া গিয়াছে—তাঁহার মাথার পাগ্ড়ীতে রক্তের ঢেউ খেলিতেছে—মরা শরীর পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু মাথা নাই।"

এক মুহূর্ত্তে প্রলয় উপস্থিত হইল। একেবারে প্রভার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। হৃদয়ে এমন স্থান নাই যে, প্রবল ঝটিকার বেগ সম্বরণ করিতে পারে। "নাথ, মিলন না হইতেই অনাথিনী হইলাম।"—মুখের কথা মুখে মিলাইয়া গেল। জ্ঞানশূন্যা হইয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় 'সানের' মেজিয়াতে পড়িয়া গেল। গৃহভিত্তিতে মস্তক লাগিবামাত্র, প্রবলবেগে শোণিত বহির্গত হইল। সকলে মহা ব্যস্ত হইয়া 'হায়! হায়!' করিয়া উঠিল। ধরাধরি করিয়া তাহাকে শয্যায় শয়ন করাইল। মস্তকে এমন কঠিন আঘাত লাগিয়াছে যে, মাতুলানী অনবরত জল সেচন করিলেন, বস্ত্রখণ্ড ক্ষতস্থানে গুঁজিয়া দিলেন, তথাচ রক্তস্রোত বন্ধ হইল না। অনতিবিলম্বে প্রভার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইল, সেই রক্তাভ প্রস্ফুটিত গোলাপ পাংশুবর্ণ হইল। চক্ষুপুত্তলী উপরে উঠিয়া গেল।

মাতুলানী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"কি সর্ব্বনাশ, একি বিপদ্—শ্বাস যে নাই—কিঙ্কর—ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে শীঘ্র সংবাদ দাও—তিনি ব্যবস্থা করুন।"

কিঙ্কর ঊর্দ্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পত্র পাঠ।

রতিকান্ত সেই সরোবরতটস্থিত বৃক্ষচ্ছায়ায় এখনও নিদ্রিত আছে। জাগরিত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ধীরে ধীরে নয়নোন্মীলিত করিয়া দেখিল,—কামিনীদল অৰ্দ্ধমণ্ডলাকারে তাহা. বেষ্টন করিয়া দাড়াইয়া আছে। সকলে স্থিরনেত্রে যেন আকাশচ্যুত শশধরকে দেখিতেছিল। কাহার জলপূর্ণ কলসী কক্ষে ছিল, কেহ বা জলপূর্ণ করিবার মানসে আসিয়াছিল। তাহাদের ভাব দেখিলেই বোধ হয় যেন, নিশানাথ গগন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত—তারকা সুন্দরী পরিবেষ্টন করিয়া পথাবরোধ করিতেছে। পথিকের সহিত মিলিতচক্ষু হইবামাত্র সকলে বিচ্ছিন্ন হইল। সূর্য্যকরস্পর্শে যেন নীহার গলিয়া গেল। আপন আপন কার্য্য সমাপন করিয়া রমণীগণ পুষ্করিণী হইতে চলিয়া গেল।

বেলা চারিটা অতীত হইয়াছে। সমস্ত দিনের অনাহারে শরীর দুর্ব্বল হইয়াছে, তৃষ্ণায় কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক। যাইবার কোথাও স্থান নাই, ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। গৌরমোহন বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, অথচ সেই স্থান ভিন্ন অন্য উপায়ও নাই। সুতরাং ধীরে ধীরে বাবুর কাছারী মহলে প্রবেশ করিল। ঈশ্বরদাস বাবুর পত্র ভৃত্যের হস্তে পাঠাইয়া দিল। অৰ্দ্ধ-ঘণ্টার

পর ভৃত্য পুনরাগমন করিয়া কহিল—"বাবু ডাকিতেছেন।" রতির কলেবর ঈষৎ কম্পিত হইল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম মুক্তার ন্যায় শরীরে প্রকাশ পাইল। সভয়ে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। বাবু লম্বা হইয়া খট্টার উপর পড়িয়া আছেন, একজন ভৃত্য গুড়গুড়ার নল মুখে লাগাইয়া দিতেছে; আর একজন পদসেবা করিতেছে। রতিকে দেখিয়া বাবু মুখ বক্র করিলেন, গোঁফের তাড়া ফুলিয়া উঠিল, মুখের ভাব একটু প্রকট হইয়া উঠিল। সতেজে বলিলেন, "তোমার নাম রতি—তুমি ইংরাজী লেখা পড়া জান, জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য পারিবে?"

এক লম্বা আজ্ঞা দিয়া তিন প্রশ্নের উত্তর দিল।

বাবু বলিলেন,—"রামা—দেওয়ানের নিকট লইয়া যা।"

বৃদ্ধ দেওয়ান তাকিয়ায় ঠেস দিয়া, চক্ষে চস্‌মা লাগাইয়া, এক হাঁটু কাগজের মধ্যে বসিয়াছিল। বাবুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, রতিকান্তকে কার্য্যের ভার বুঝাইয়া দিল। দশ টাকা বেতন ও সরকার হইতে আহার, সেই দিন হইতে তাহার নির্দ্ধারিত হইল।

আহারাদি সমাপন করিয়া, রতিকান্ত নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে উপবেশন করিয়া কালাচাঁদের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল। কালাচাঁদ কে? কেশবশঙ্করের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? তাহাকে বংশদলন করিবার আবশ্যক কি? বিচারপ্রণালী কি কিছুই নাই। জমিদার বলিয়া গৌরমোহন কি সর্ব্বেশ্বর? কই—নরেন্দ্রলাল বাবুকে ত কথনও কোন মন্দকার্য্য করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই। গৌরমোহন কি যথেচ্ছ নরহত্যা করিতে পারিবে? তাহার কার্য্যের কি বিচার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঈশ্বরদাস বাবুর বাটীতে যে পত্র কুড়াইয়া পাইয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। কৌতূহল এমন বৃদ্ধি পাইল যে, আর এক মুহূর্ত্ত সময়

নষ্ট না করিয়া পত্রোদ্ঘাটন করিয়া আলোকে পড়িতে লাগিল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

"বৎস!

জননীর হৃদয় স্নেহে পরিপূর্ণ। মাতার হৃদয়ে অপত্যস্নেহ কতদূর প্রবল তাহা যদি জানিতে, পুত্রমুখ দর্শন না করিলে হৃদয় কতদূর ব্যথিত হয় তাহা যদি বুঝিতে, বৎস, তাহা হইলে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে না। পুত্র অতি সাধনের ধন। আমি অভাগিনী; অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছি, ধন সম্পত্তি তুমি; হায়! সে ধনে বঞ্চিত হইয়াছি। আজ আট বৎসর হইল, তোমার মুখচন্দ্র দেখি নাই। আর কি দেখিতে পাইব না? হা হতবিধে! এই কি তোমার মনে ছিল? পতি যখন মৃত্যুমুখে, তখন আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম; দুর্গাদাস, তুমি আমার বক্ষে ছিলে। পতি ক্রন্দন শুনিয়া বলিলেন,—"অভাগিনি! কাঁদ্‌চ কেন?—মনুষ্য দেহ এই আছে এই নাই, মৃত্যু সকলেরই আছে, সংসারের সার বস্তু অতি যত্নের ধন পুত্র রাখিয়া চলিলাম, তোমার ভাবনা কি?" হা বিধে! সে ধনে হারাইয়াছি;— দুর্গাদাস, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। বৎস, তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিয়াছি। তোমার কষ্ট দেখিয়া তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সমস্ত দিন বা রজনী অতিবাহিত করিয়াছি। একটু অসুখ দেখিলে দিবারাত্রি ভগবানের নিকট চক্ষের জল ফেলিয়াছি। কতদিন আমি অনাহারে কাটাইয়াছি, কিন্তু তুমি চিরদিন পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করিয়াছ। পাছে তোমার কষ্ট হয়, পাছে তুমি অভাগিনীকে চিরদুঃখিনী কর, এইজন্য তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিতাম। আমি ভিক্ষা করিতাম, তুমি সুখে খাইতে। তখন আমার মলিন বসন, মলিন বদন দেখিয়া কতই দুঃখ করিতে। সর্ব্বদা বলিতে, আমি বড়

হইয়া তোমাকে রাজমাতা করিব। হা পুত্র! এখন তুমি কোথায়? সে মধুর মুখের কোমল স্বর কোথায় গেল? তখন আমি আশার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ থাকিয়া সমুদায় ক্লেশ ভুলিয়া যাইতাম। এখন সুখের আশা নৈরাশ্যে পূর্ণ। এখন প্রকৃতই আমি অনাথিনী, অভাগিনী, ভিখারিণী মাত্র। আজ তিন দিন জ্বর হইয়াছে, তিন দিন অনাহারে আছি, ঔষধ নাই, পথ্য নাই। নিদ্রাবশে উৎকট স্বপ্ন দেখিতে থাকি। দেখি, তুমি ধনবান হইয়াছ, আমি এই মলিন বেশে তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানের নিকট বাটীতে প্রবেশ করিবার জন্য মিনতি করিতেছি, সে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আমাকে দূর করিয়া দিতেছে। দুঃখিনীর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম আমার পুত্র এই স্থানে আছে, এই বাড়ীর কর্ত্তা। সে আমাকে উন্মাদিনী জ্ঞান করিয়া বল প্রকাশ করিতে উদ্যত। এমন সময়, বৎস, তুমি সেইস্থানে আসিলে। আমার সাহস হইল, হৃদয় ফুলিয়া উঠিল। দ্বারবানকে বলিলাম,—"এইবার কি হয়? এই আমার সংসারের সারবস্তু অতি যত্নের ধন-পুত্র।" দ্বাররক্ষক একথায়ও কর্ণপাত করিল না; তুমি দেখিয়াও দেখিলে না, শুনিয়াও শুনিলে না; দুর্দ্দান্ত রক্ষক আমার অঙ্গে বেত্রাঘাত করিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দিল। তুমি ঘৃণার সহিত মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলে। হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, আশা দূর হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, সেই ভগ্ন কুটীরে ছিন্ন শয্যায় মৃত্তিকার উপর পড়িয়া আছি। দুর্গাদাস, আজীবন দুঃখের কি অন্ত নাই? আর কি লিখিব? আমি অর্থের কাঙ্গালিনী নহি, আমি তোমাধনের মুখশশী দেখিবার আকাঙ্ক্ষিণী। ইতি—"

পত্র পাঠ করিয়া চক্ষুজলে রতিকান্তের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। মনে মনে কহিল, কি আশ্চর্য্য, কেহ জননী পাইয়া দূর করিয়া দিতেছে, কেহ অন্বেষণ করিয়াও পাইতেছে না। ইনি কি ঈশ্বরদাসের মাতা?

ঈশ্বরদাস কি মাতার মুখ দেখেন না? তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই, আর মাতা অনাথিনীর ন্যায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া, হা পুত্র—হা পুত্র, করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছেন? এ সংসার কয় দিনের জন্য? এখানে এতই কাপট্য, এতই অধর্ম্ম? মাতার সুখের জন্য পুত্রের কি না করা কর্ত্তব্য? আত্মসুখ ত অতি তুচ্ছকথা, পৃথিবী তাঁহার তুলনায় সামান্য—এমন কি অকিঞ্চিৎকর। মাতা পৃথিবীতে সাক্ষাৎ দেবী। তিনি ঈশ্বরের প্রেমময়ী মূর্ত্তি। হা ঈশ্বরদাস! সম্মুখে ব্রহ্মের জলন্ত ছবি ফেলিয়া বৃথা সমাজে, পুস্তকে, বক্তৃতাতে ব্রহ্মান্বেষণ কর। তোমাকে ধিক্, তোমার সাধুতা, সরলতা, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার জীবন, তোমার সকল বিষয়ে ধিক্!

রতিকান্ত ক্রোধে পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল। একে একে খণ্ডগুলি বায়ুতে উড়াইয়া দিল, শেষে বলিল,—ঈশ্বরদাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কুকর্ম্ম করিয়াছি।"

---

* গ্রন্থকারের জনৈক শ্রদ্ধেয় দীক্ষিত ব্রাহ্মবন্ধু তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিলেন, চলিয়া যাইবার সময় তিনি "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া যাত্রা করিলেন। আমি বলিলাম,—"দুর্গানাম কেন?" তিনি বলিলেন,—"এ মাতৃআজ্ঞা এ—আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। যিনি দুর্গতি দূর করেন তিনিই দুর্গা; ব্রহ্মকে কি সেই নামে নির্দ্দেশ করিতে পারি না?" আমি তখন বুঝিলাম, ধর্ম্ম এক, কেবল আবরণ ভেদ।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা।

দিন চলিতে লাগিল। হাবড়া হইতে বোম্বাই অবধি শকটের চক্র কতবার ঘুরিয়া গেল, কেহই গণিল না। আরোহী সকল ঠিকানায় পৌঁছিবার জন্য কেবল ব্যস্ত। পথিক, তুমি কালচক্রে ঘুরিতেছ; দশবৎসর পূর্ব্বে তুমি শৈশবে ছিলে, এখন যৌবনে আসিয়াছ, কিছুদিন পরে বৃদ্ধ হইবে, শেষে একেবারে অজ্ঞানে প্রস্থান করিবে। এই গাড়ীর চাকা ও সময়ের চাকা এক। পথিক, ঠিকানায় পৌঁছিতে তবে কেন এত ব্যস্ত? চক্র ত অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে, কিন্তু তোমার কার্য্য কতদূর হইল তাহার হিসাব কি করিয়াছ?

কালের চক্র ত্রিশবার ঘুরিয়া গেল। রতিকান্ত একমাস গৌর-মোহন বাবুর বাটীতে আসিয়াছে। একদিন দ্বিপ্রহরে উপবেশন করিয়া, প্রভা কোথায়, কেন পলাইয়া গেল, কৃষ্ণশঙ্কর কোথায়, কেমন আছে, এই অসীম পৃথিবীর অগণিত মনুষ্য মধ্যে আমার আরাধ্য পিতা মাতাকে কেমন করিয়া অনুসন্ধান করিব, তাঁহারা কি এখনও জীবিত? কত কাল এই ভাবে দিন কাটাইব, ঐ কৃষ্ণ পুরুষ ও উৎফুল্লময়ী কে? তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি,—এই সকল চিন্তায় ব্যস্ত, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বাবুর আজ্ঞা জানাইয়া গেল। সে ব্যস্ত হইয়া তাঁহার কাছারী-গৃহে প্রবেশ করিল। বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"তোমার নিকট

গঙ্গামগুল জমিদারীর সমুদায় কাগজ পত্র, মোকদ্দমার রায়, সাক্ষীর জবানবন্দী প্রভৃতি ঠিক আছে ত ?" রতি ঈষৎ মস্তক নাড়িয়া বলিল,—"সমুদায় কাগজ একত্র করিয়া পৃথক ভাবে সিন্দুকে রাখা হইয়াছে।" তিনি বলিলেন,—"সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল দায়ের করিবার জন্য সেই সমুদায় কাগজ লইয়া তুমি ও নায়েব মহাশয় আমার সহিত কলিকাতা যাইবে, এখনই প্রস্তুত হইয়া আইস।" যে আজ্ঞা বলিয়া রতিকান্ত চলিয়া আসিল।

দ্বাদশ ঘণ্টা কার্য্য করিয়া অবসন্ন তপন গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন, এমন সময় একখানি পরিষ্কার বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত তরণী (ভাউলিয়া) কলিকাতার পারঘাটে পৌছিল। গৌরমোহন বাবু রতিকান্ত ও নায়েবকে পশ্চাতে করিয়া তীরে অবতীর্ণ হইলেন। সুরম্য হর্ম্ম্য, অসংখ্য জলযান, অর্ণবপোত, সহস্র সহস্র মনুষ্য, ঘোটকবৃন্দ, শকটশ্রেণী একস্থানে দেখিয়া, রতির কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত রাজপথ দীপমালায় সমুজ্জল,—যেন কলিকাতার গলদেশে কে মুক্তার হার দোলাইয়া দিয়াছে। এমন সুন্দর নগরের অস্তিত্ব সে কখন চিন্তাতেও স্থান দিতে পারে নাই। আপন মনে বলিতে লাগিল,—'এখানে এত লোক বাস করে,—অসংখ্য অর্ণবপোত গঙ্গার বক্ষে ? দেশ হইতে কত পণ্য দ্রব্য যাইতেছে, আবার অপর দেশের কত দ্রব্যই আসিতেছে, ইহার কি হিসাব আছে ? ইংরেজরা কি প্রভাশালী, কেমন করিয়া এত বড় বড় জাহাজ অসীম সমুদ্রে দিগদর্শনের দ্বারা চালিত করে ? আমাদের কি দুর্ভাগ্য, একখানি জাহাজও আমাদের নাই। এখানে বৃক্ষ প্রায় নাই, সকলই অট্টালিকাময়, দোকানের রাশি, বড় দোকান গুলি সকলই সাহেবদের, দেশীয় দোকান গুলি তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় কেন ? কত সাহেব বিবি কেমন সাজ সজ্জা করিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের দেশের লোক ঐরূপ

পরিষ্কার থাকিতে জানেনা,—না পারেনা? একি ডাক্তারখানা—কত বড়,—কত কাচের নীল ও লোহিত শিশি,—আলোর ঘটা কি? আশু বাবুর ডাক্তারখানা একখানি খড়ের ঘরে;—সাহেবরা কি সকলেই অর্থশালী, না—এ সকল যৌথ কারবারের ফল? আমরা ইংরেজ রাজত্বে এতদিন বাস করিয়া কই তাহাদের ত কোন গুণ অধিকার করিতে পারি নাই,—তাহাদের অদম্য তেজ, উৎসাহ, দৈহিক ও মানসিক বল, চিত্তের প্রফুল্লতা আমাদের দেশের লোক ত লাভ করিতে পারিল না? নূতন দর্শকের নবীন কল্পনা এইরূপ শকটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শকট এক সুরম্য বাটীতে উপস্থিত হইল। ভৃত্যেরা দ্রুত আসিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল। কেহ আলো দিতে, কেহ বা রন্ধনের জন্য, কেহ বা দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইল। রতিকান্ত কাগজের সিন্দুকটী লইয়া উপরের এক কক্ষে রাখিয়া দ্বারে তালা বন্ধ করিল। সে রাত্রি চলিয়া গেল।

পরদিন গৌরমোহন বাবু, রতিকান্ত ও বৃদ্ধ নায়েবকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত এক কাউনস্থলী সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। সাহেব তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া এক সুসজ্জিত কক্ষে বসিতে বলিয়া চেয়ার টানিয়া দিলেন। তথায় মোকদ্দমার কাগজ পত্র ভাল করিয়া তাঁহার কেরাণী ও এটর্নিকে বুঝান হইতে লাগিল। তিনি নিজেও হাকিমের হুকুম দেখিতে ও ব্রিফ লইতে লাগিলেন। একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,—আপীলের অবস্থা ভাল হইতে পারে। এই মোকদ্দমাতে গৌরমোহন বাবুর এক বৃহৎ জমিদারী নিলামে উঠিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। অনবরত তিনচারি দিন যাতায়াত করিয়া গৌরমোহন বাবুর মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইল। কত কালের পরে যে শেষ আদেশ হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না:

তবে নিলাম স্থগিত কেন হইবে না তাহার এক 'রুল ইস্থ' হইল। গৌরমোহন বাবু নিজের কার্য্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি একবারও রেশমের কারবার দর্শন করিতে পারেন নাই। তবে একদিন মাত্র কেশবশঙ্কর বাবুর সহিত দর্শন ও আহারাদি করিতে মাত্র সময় পাইয়াছিলেন। রুল ইস্থ হইবা মাত্র তিনি রতিকান্তকে কাগজ পত্র গুছাইয়া লইয়া রাধানগর ফিরিয়া যাইতে বলিয়া নিজে ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মেদিনীপুর জজ আদালতে চলিয়া গেলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। সকলে নিদ্রিত। বসুমতী স্থির। বাঙ্গালা পাড়ার দীপস্তম্ভগুলি কিছু দূরে দূরে। রাস্তায় তেমন আলো নাই। এমন সময় এক তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ধর ধর মার—বাধ—ভারি দুষ্ট—পুরাতন বদমাস—এইরূপ কলরব উত্থিত হইল। রতি নিমতলায় রাস্তার ধারের এক কুঠারীতে নিদ্রিত ছিল। কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইল। শুনিল —একজন যেন করুণ স্বরে বলিতেছে—"তুমি কি আমাকে জান না? কত টাকার আবশ্যক বল, আমি এখনই দিতেছি—ওকি মার কেন—সার্জ্জন সাহেবেরই বা কি দরকার হইল—এত কোলাহল কেন?" সার্জ্জনের নাম চাৎকার করিয়া কেহ কেহ ডাকিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তিন চারিজন কনেষ্টবলসহ স্বয়ং সার্জ্জন সাহেব উপস্থিত হইলেন। গৌরমোহন বাবুর বাটী হইতে এখন এই সকল লোক অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল।

সার্জ্জন উপস্থিত হইবামাত্র, একব্যক্তি দৌড়িয়া গিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং ইংরাজীতে ক্ষণকাল কথোপকথন করিল। সার্জ্জন হাসিয়া বলিলেন, "আমি সকল কাম করিতে পারিব—বট্" বলিয়া তর্জ্জনী দেখাইল এবং বলিল—"য়্যাণ্ড থি মোর নাইন্‌দাস।" বাঙ্গালী বাবু একটু হাসিয়া সম্মতি প্রকাশ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, এই দুষ্ট

লোককে সহস্র মুদ্রা ব্যয়েও দমন না করিলে আমার বাটীতে বাস করা অসম্ভব হইবে।

সার্জ্জন নিকটে আসিয়া কহিল,—"টুমি চুড়ি করিয়াছ - ঘড়ি, ঘাড়র চেইন, অঙ্গুড়ী, লাঠি ও পোষাক; টুমি চুড়ি কড়িটে আসিয়া বাবু সাজিয়াছ, এ কৌশল মণ্ড হয় নাই, কিন্তু পুলীশের মুখ হইটে পালান ডুষ্কড় - চল টানামে চল।" দুইজন কনষ্টবল হাত বাঁধিয়া লইয়া চলিল। দর্শকের মধ্যে অনেকে স্ব স্ব বাসে ফিরিয়া গেল, কেবল অভিযোক্তাদিগের সহিত রতিকান্তও চলিল। রতিকান্ত যেন তস্করকে চিনিতে পারিয়াছিল। যতক্ষণ রাস্তার মধ্যে দিয়া যাইতেছিল, ততক্ষণ ক্ষীণালোকে রতি তাহাকে পরিষ্কার রূপে দেখিতে পারে নাই। কিন্তু এক চৌরাস্তার উপর আসিলে দীপস্তম্ভের শুভ্রালোক তাহার মুখে পতিত হইল। রতিকান্ত সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"কেশবশঙ্কর বাবু! আমি রতিকান্ত আপনার কি করিতে হইবে আমাকে বলুন — আমি প্রস্তুত আছি।"

লজ্জায় কেশবের দৃষ্টি নিম্নে গমন করিল। কিন্তু এসময় লজ্জা করিলে কি চলিতে পারে? তাই মুখ তুলিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিল—"রতি, আমার বাসা অমুক রাস্তার অমুক নম্বরে, তুমি যাইয়া সংবাদ দিলেই সব গোল-যোগ চলিয়া যাইবে।"

দুরন্ত সার্জ্জন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে দেখিয়া, রোষভরে হস্ত নাড়িয়া কহিল—"ডামড হউ ডেবিল।" বাদানুবাদ করা বৃথা বিবেচনা করিয়া, রতি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দেখিল যে, সে রাত্রির জন্য কেশবশঙ্কর থানায় নীত হইল! সে অনন্যোপায় হইয়া বাসাতে প্রত্যাগমন করিল। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, তাহার শয্যা মশারি প্রভৃতি কে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বাহির হইবার সময়

দ্বার রুদ্ধ করিতে মনে ছিল না। সে রাত্রি উপবেশনেই অতিবাহিত হইল। প্রাতঃকালে কেশবের বাটী অন্বেষণে বহির্গত হইল। এত চিন্তা করিয়াও কিছুতেই 'ওপেন সিসেম' মনে পড়িল না। তখন নিরুপায় হইয়া নারায়ণগড়ে পলায়ন করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া গঙ্গাতটে গমন করিল। নিকটে পুষ্করিণী থাকিতে চাতক যেমন মেঘের নিকট জল যাচ্ঞা করে, সেইরূপ রতি গৌরমোহন বাবুর ভৃত্যদিগকে কেশবের বিপদ্‌বার্ত্তার উল্লেখ না করিয়া, নারায়ণগড়ে গমনাভিলাষ করিল। পুষ্করিণীতে সুমিষ্ট জল আছে, চাতক যদি জানিতে পারিত, তাহা হইলে কি কাদম্বিনীর নিকট জল ভিক্ষা করিত ?

গঙ্গার তটে উপস্থিত হইয়া সে নৌকায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় কে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলির আঘাত করিল। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে,—ডাক্তার বাবু আশুতোষ। তিনি কহিলেন,—"রতি, এখানে ?"

বর্ত্তমান অবস্থার পরিচয় প্রদান করিয়া, কেশবের বিপদ্‌বার্ত্তা সংক্ষেপে বিবৃত করিল ; পরে বলিল,—"আমি সেই জন্য নরেন্দ্রলাল বাবুর নিকট যাইতেছি।" আশুবাবু বলিলেন,—"তোমার যাইবার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, আমি নারায়ণগড়ে ঘোটকারোহণে যাইতেছি, কল্যই নরেন্দ্র বাবুকে সম্বাদ দিব। তুমি ফিরিয়া যাও।" রতি বলিল,—"কেশব বাবুর সমূহ বিপদ্—না জানি কি কষ্ট তাঁহার হইতেছে !"

আশু। তুমি কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। আইন আদালত সকলই টাকার বাধ্য। টাকায় যতদূর হইতে পারে তাহা হইবে।

রতি। আপনি কি নারায়ণগড়ের কোন সংবাদ দিতে পারেন

আশু। না—আমি অনেকদিন হইল সে স্থান হইতে কলি: আসিয়াছি।

এই বলিয়া তিনি নৌকায় উঠিলেন, নৌকা ক্রমে অদৃশ্য হইল। রতি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল,রাধানগর যাত্রা করিবারজন্য শকট প্রস্তুত। আহারাদি করিয়া দলিলের সিন্দুক ও দুইজন দ্বারবান লইয়া শকটে আরোহণ করিল। বড় আশা ছিল, অনেকদিন পরে আবার নরেন্দ্রলাল বাবু ও কৃষ্ণশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, প্রভার কথা শুনিতে পাইবে, কিন্তু বিধাতা সে আশা পূর্ণ হইতে দিলেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রতিকান্তের পরিচয়।

রতিকান্ত কলিকাতা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, কেশবশঙ্করের অবস্থা অবগত হইবার জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। কর্ম্মে মনোযোগ নাই। মন সদাই অস্থির। একদিন সন্ধ্যার সময় আপন প্রকোষ্ঠে বসিয়া নানা প্রকার চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পার্শ্বের গৃহে বামাস্বরে কে যেন তাহার নাম করিল। রতি ব্যগ্র হইয়া জানালার নিকটে উঠিয়া গেল। এ দিক দিয়া পার্শ্বের গৃহে যাইবার কোন পথ ছিল না। সুতরাং বাতায়নের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সে স্বর আর শুনিতে পাইল না। দুই বিষয়ের জন্য মন কৌতূহলে পূর্ণ হইল। প্রথম, এ স্ত্রীলোক কে, এবং কি জন্য তাহার নাম করিতেছে? দ্বিতীয় স্বর যেন পরিচিত। বিস্ময়াপন্ন হইয়া রতি বাটী হইতে বহির্গত হইল। গড়ের উপর সেতুর নিকট দণ্ডায়মান রহিল। মনে করিল, এ সেতু ভিন্ন বাটী প্রবেশ করিবার বা বহির্গত হইবার দ্বিতীয় বর্ত্ম নাই। সে যে হউক না কেন, এ পথে নিশ্চয়ই বাহির হইবে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিল, ক্রমে তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। এদিকে নক্ষত্রমালা রজনীর অন্ধকারময় কবরীতে একে একে শুভ্র কুসুমের ন্যায় ফুটিয়া উঠিল; রজনীর কৃষ্ণ অঞ্চল একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইল, তত্রাচ কেহই বাটী হইতে বহির্গত

হইল না। প্রত্যাগমনের উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একজন কৃশা দীর্ঘকায়া স্ত্রীলোক সর্ব্বাঙ্গে বসনে আচ্ছাদিতা হইয়া, সেতুর উপর দিয়া চলিয়া গেল। রতিকান্ত দেখিয়াই স্বগত বলিয়া উঠিল, একি উৎফুল্লময়ী? কতকদূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, কিন্তু সে মুখ ফিরিয়াও চাহিল না, অগত্যা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া শয়নমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল।

পর দিন রতিকান্ত এক চমৎকার ব্যাপার দেখিল। ক্ষুদ্র বালক হইতে বৃদ্ধ দেওয়ান অবধি সকলেই তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। সকলের চক্ষেই যেন একটু ঘৃণা, একটু বিস্ময়, একটু কৌতূহলের রেখা আছে। আজ তাহার সহিত প্রশস্তমনে আলাপ করিতে সকলেই কুণ্ঠিত। কারণ কি? অদ্ভুত কারণ ক্রমে বাবুর কর্ণে উঠিল। তিনি ঘৃণার সহিত হাসিয়া বলিলেন,—"মাকালের উপর লাল, সিমুলের কেবল রং, আচ্ছা লোক ঈশ্বরদাস বাবু পাঠাইয়াছেন. ব্রাহ্মদিগের আবার এ সকল বিষয়ে লজ্জা; তাহাদের ছত্রিশ জাতে সমাজ।" রতিকান্তকে আনিবার জন্য রামাকে পাঠাইয়া দিলেন। সে উপস্থিত হইলে বাবু গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"তুমি আমার নিকট মিথ্যা পরিচয় দিয়াছ? মিথ্যা কহিয়া আমার সকল লোকের জাতি মারিয়াছ?" রতি বিনীত ভাবে কহিল,-"আমার কি অপরাধ হইয়াছে?"

বাবু। অপরাধ!—অপরাধ! তোমার বাপের নাম কি? তোমার বাড়ী কোথায়? তোমার জাতি কি?

রতিকান্ত নির্ব্বাক্ রহিল। তখন গৌরমোহন বাবুর কথাই প্রামাণ্য হইল। তিনি সকোপনয়নে, ক্রোধ কলেবরে, কর্কশ বচনে কহিলেন,—"তুই কৈবর্ত্তের ঔরসে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া-

ছিস্,—তোর মাতা দুশ্চারিণী, জাতি ও মান রক্ষা করিবার জন্য তোকে অরণ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল,—তোর দুর্ভাগ্য—তুই না মরিয়া এখনও তোর মাতার কলঙ্কের সাক্ষী রহিয়াছিস্;—তোর স্পর্শে আমার বাটী অপবিত্র হইয়াছে, চণ্ডালের সহিত একস্থানে আহার করিয়া আমার লোক সকলের জাতি গিয়াছে,—তুই রামনারয়ণ সিংহ ক্ষত্রিয়ের পুত্র পরিচয় দিয়া সকলের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্।”

ধীর ও নম্র বচনে রতিকান্ত কহিল,—“মহাশয়,আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার জননী সতীত্বের আদর্শস্বরূপিণী, কোন অনিবার্য্য কারণে আমাকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আমার দুরদৃষ্ট তাই আমি সে দেবীর পদপ্রান্তে এখনও উপস্থিত হইতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কে আমার সেই আরাধ্য দেবীর সংবাদ আনিয়াছে? তাহার সহিত কথা কহিতে পারিলে আমার এ দারুণ মনোবেদনার শান্তি হইবে।”

গৌরমোহন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—“ও সর্ব্বনাশ! কি নির্লজ্জতা! মাতার কলঙ্কের আবার প্রমাণ চায়? কি বুদ্ধিহীনতা! চণ্ডাল না হইলে কি ভদ্রসন্তান এমন কথা মুখে আনিতে পারে?”

রতি। আপনার মত বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির কি ঘৃণিত নিন্দুকের কথায় আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করা উচিত?

যে ব্যক্তি চিরকাল অপরের উপর আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে, যে ব্যক্তি চিরদিনই দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে মনুষ্য মধ্যে গণনা করে নাই, যে কখন ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে শিক্ষা পায় নাই, যে আপনাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে, সে কি তাহার এক ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীর এতবড় ন্যায়-সঙ্গত কথা সহ্য করিতে পারে? অকস্মাৎ প্রচণ্ড ক্রোধ সমুত্থিত হইল। সে দাঁড়াইয়া উঠিল, কঠিন হস্তে রতিকান্তকে এক অর্দ্ধচন্দ্র

দিল। রতি মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল। ওষ্ঠ ফাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িল। শব্দমাত্র উচ্চারণ না করিয়া সে ধীরে ধীরে মৃত্তিকা হইতে উঠিল এবং নিঃশব্দে বাটীর বাহির হইল। পশ্চাতে সকলে উচ্চ হাসিয়া পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিল। কেবল গৌরমোহনবাবু মুখ বিবর্ণ করিয়া বিহারগৃহে প্রবেশ করিল। তাহার বোধ হইল যেন দক্ষিণ বাহুতে ভয়ানক আঘাত লাগিয়াছে।

এতদিন দুঃখ ও কৌতূহল জড়িত হইয়া রতিকান্তের অন্তরে ছিল। কিন্তু আজ এ পরিচয়ে তাহার মনে ভয়ানক ঘৃণা উপস্থিত হইল। ভাবিতে লাগিল,—"সত্যই কি আমি দুশ্চারিণীর গর্ভে জন্মিয়াছি? সত্যই কি আমি কলঙ্কের অবতার? সত্যই কি মরণ কামনায় আমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল? এ সকল কথা কে জানে? এতদিনের পর গৌরমোহনকে কে বলিল? এ সেই দীর্ঘকায়া স্ত্রী-লোকের কায। সে কি যথার্থই উৎফুল্লময়ী? এখানে তাহার সম্বন্ধ কি? সে কেন অবিরত আমার মন্দ চেষ্টায় বেড়াইতেছে? আমিত কখন কাহারও অপরাধ করি নাই। যাহা হউক, এ জীবনে ধিক্। এতদিনেও পিতা মাতার উদ্দেশ পাইলাম না। এই বিস্তৃত সংসারে কেমন করিয়া উদ্দেশ করিব? এতদিনের পর আমি কেমন করিয়া কাহার পুত্র প্রমাণ করিব? আর দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে পারি না, আর অপমান সহ্য হয় না। আজ ইহ সংসার ত্যাগ করিব। আজ সকল দুঃখ দূর করিব। কাহার জন্য মায়া? এ সংসারে আমার কে আছে? ঈশ্বর তুমি অভাগার নও, দরিদ্র ধার্ম্মিক অন্নাভাবে শীর্ণ, কিন্তু তুমি দেখিয়াও দেখ না; এ অধর্ম্ম সংসারে, এ পাপ পৃথিবীতে আর বাস করিব না? মা, তুমি যে হও, যেখানে থাক, তোমায় নমস্কার করিলাম—"এই বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গড়ের জলে

লম্ফ প্রদান করিতে উদ্যত, এমন সময় পশ্চাতে একজন অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিল। রতিকান্ত তাহাকে দেখিয়া কহিল,—"বিধাতা আমার সকল কার্য্যে বাধা দেন, মানুষ ও বিধাতা মিলিত হইয়াছে, আমাকে জীবিত রাখিয়া দগ্ধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।"

অপরিচিত কহিল,—"ভাই, মরণ ইচ্ছার বশবর্ত্তী, কিন্তু একবার মরিলে আর জীবিত হইবার উপায় নাই! এই ত তোমার নব যৌবন, সম্মুখে সংসারের দীর্ঘ পথ পড়িয়া আছে। ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, সেই অন্ধকারে আশার জ্যোতিঃ আছে। সেই জ্যোতিঃ দেখিয়া মানুষের মন মুগ্ধ হয়। ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়াই ত মানুষের সুখের আশা আছে। যদি অতীতের ন্যায় তাহা জানা যাইত, তাহা হইলে সংসারে ধর্ম্ম অধর্ম্ম থাকিত না, সংসার লণ্ডভণ্ড হইত, পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক স্বেচ্ছায় মরিত। ভাই, মরিবে কেন? সংসার সুখময়। মা দুশ্চারিণী বলিয়া কি পুত্রের দোষ হয়? পাঁকে কমল জন্মে বলিয়া তাহার কি নিন্দা আছে? সেই কমল কমলার আসন। এমন সুন্দর দেহ কেন অকালে কালে মিশাইবে? ধৈর্য্য ধর, সহিষ্ণুতা উন্নতির মূল। যুধিষ্ঠির সহিষ্ণুতা-বলে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণের প্রতিফল লইয়াছিলেন। যদি অর্থের অনটন হয়, আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারি।"

রতিকান্ত অপরিচিতের বিকট মুখে মধুর ভাব দেখিল, কহিল,—"অর্থে প্রয়োজন নাই, তুমি যে উপদেশ দিয়াছ তাহার জন্য ধন্যবাদ দি।"

অপরিচিত চলিয়া গেল। রতিকান্ত অনেক ভাবিল, শেষে স্থির করিল—আজ হইতে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিব, প্রত্যেক স্থানে জন্ম-দাতার সন্ধান লইব, যে স্থানে সন্ধ্যা হইবে সেই স্থানে রাত্রি যাপন করিব, যাহা উপস্থিত হইবে তাহাই আহার করিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন সন্ধ্যার সময় এক কৃষকের বাটীতে

উপস্থিত হইল। কুটীরের ভগ্নদশা। চালে খড় নাই। বৃষ্টি হইলে তাহার মধ্যে দাঁড়াইবার স্থান হয় না। মৃৎপ্রাচীর স্থানে স্থানে পড়িয়া গিয়াছে। গৃহের কিছুমাত্র শ্রী নাই। দুইটী কৃশ বলদ এক বৃক্ষমূলে আবদ্ধ। বিবস্ত্রপ্রায় এক বৃদ্ধা স্ত্রী কপোলে হাত দিয়া দ্বারের সম্মুখে বসিয়া আছে। রতিকান্তকে দেখিয়া, রুক্ষস্বরে বলিল,—"বাবা, এখানে থাকিবার স্থান নাই—আমরা বড় কাঙ্গাল।"

রতি বৃদ্ধাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, কহিল,—"হ্যাঁ গা—তুমি না কালাচাঁদের মা? এই কি তোমার ঘর?"

সম্বোধন শুনিয়া বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"বাবা কালাচাঁদ—তুই আজ দুইমাস কোথা গেলিরে,—তুমি যেদিন গিয়াছ সেইদিন হইতে সোণার সংসার ছারখার হইয়াছে—আমার সোণার বউ সেই দিন হইতে শুকা'য়ে গেছে,—ওরে জমিদার, এই কি তোর মনে ছিল? ওরে ধর্ম্ম, এই কি তোর বিচার? আমি যে কখনও কাহারও মন্দ করি নাই, আমার কালাচাঁদ যে কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া করে নি, আমার সোণার বউ যে লক্ষ্মী,—তবে কেন আমার দশা এমন হ'লো?"

কুটীরের অভ্যন্তর হইতে কালাচাঁদের স্ত্রী গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দারুণ দুঃখের কথা মনেই রহিল, একটীও মুখ হইতে বাহির হইল না। রতিকান্ত বিমর্ষ ও বাক্‌হীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কালাচাঁদ জাতিতে কৈবর্ত্ত, কৃষিকার্য্যই তাহার অবলম্বন ছিল। তাহার অবর্ত্তমানে হাল উঠিয়া গিয়াছে; তৃণাভাবে বলদগুলি কঙ্কালসার হইয়াছে, মাঠের ধান ও জমি তহশীলদার মহাশয় বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন; শোককাতরা বৃদ্ধা কি উপায় করিবে? কালাচাঁদের ধর্ম্মভয় যথেষ্ট ছিল। পাপকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। মিথ্যা কলহ, কি সামান্য বিষয় লইয়া গোলযোগ করিত না। সচ্চরিত্র ও

বিশ্বাসী দেখিয়া প্রতিবাসী সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। তাহার মন প্রশস্ত ছিল। দরিদ্রকে দেখিলে, নব্যধনীদিগের ন্যায় একটী পয়সা দান করিতে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইত না। তাহার শরীরে যথেষ্ট বল ছিল, বিশেষতঃপরিশ্রম-পরাঙ্মুখ ছিল না, এজন্য স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

কালাচাঁদের স্ত্রী সুন্দরী যৌবনে মাত্র উপস্থিত হইয়াছিল। রূপের শ্রীতে কুটীর আলো করিয়া, কণ্টকবনে প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় শোভা পাইত। সৌগন্ধের এক শেষ। যেমন লজ্জাশীলা তেমন পতিপরায়ণা। তাহার মন সমুদয় সদ্‌গুণের আধার স্বরূপ ছিল। প্রতি কথায় মধু ঢালিত। কালাচাঁদ এই ধনে ধনবান ছিল। সে পরিশ্রমকাতর কেন হইবে? সে শ্রান্ত হইলে উন্মিষিত মুখকমল দেখিয়া যাইত, নিদাঘে উত্তপ্ত হইলে হৃদয়স্পর্শে শীতল হইত, তৃষিত হইলে বাক্য-সুধা পান করিত। এ বিমল সুখ কি সকলের ভাগ্যে ঘটিতে পারে? দাম্ভিক, দর্প করিলে কি সে সুখ পাইবে? ধনবান ধনে কি হইবে? পাপী, ঈশ্বর নাই বলিলে কি সে শান্তি লাভ করিবে? কখনই নয়? সুখ ধর্ম্মে ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে।

কালাচাঁদের স্ত্রীর এখন সে সৌন্দর্য্য, সে গৌরব নাই। ঝটিকা ও বৃষ্টিতে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌগন্ধ ও সৌন্দর্য্য দূর হইয়াছে। এখন বিমর্দ্দিত পুষ্পের ন্যায় শুষ্ক দেহখানি পড়িয়া আছে। দুরাত্মা গৌরমোহন ও কেশবশঙ্কর কুটীরের রত্ন. কালার অমূল্য ধন অপহরণ করিয়াছিল। জীবিত অবস্থায় কালাচাঁদ তাহাদের অন্তরায় ছিল, এইজন্য তাহাকে নানা দোষে অপরাধী স্থির করিতে গিয়া একেবারে ভবলোক হইতে অন্য লোকে পাঠাইয়াছিল। সুন্দরী ঘৃণা ও লজ্জায় জলে ঝাঁপ দিয়া পরলোকের পথ পরিষ্কৃত করিতে গিয়াছিল। অকস্মাৎ সেই সময়ে

শ্বেত শ্মশ্রুবিশিষ্ট জটাজূটসমন্বিত এক সাধু পুরুষ তাহাকে আত্মহত্যা হইতে নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি সুন্দরীকে উন্মাদনীর ন্যায় দেখিয়া বলিলেন,—"বৎসে, কিজন্য জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছ? একাগ্রমনে ও ভক্তিভরে তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে ডাকিতে থাক, ফল তাঁহার হাতে; যাহা তোমার পক্ষে উপযুক্ত হইবে তাহাই তিনি দিবেন। ফলের আকাঙ্ক্ষা তোমার কিছুমাত্র থাকিবে না।" গীতার এই মহৎ কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সে কিছু কিছু বুঝিল মাত্র, তবে আত্মহত্যা যে মহা পাপ তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। সেই অবধি সুন্দরী স্বামী ও ধর্মের জন্য রোদন সার করিয়াছে। পাগলিনীর ন্যায় শ্বশ্রূর অঞ্চল ধরিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া বেড়াইতেছে। মুকুলিত রসাল প্রবল ঝটিকায় পড়িয়া গিয়াছে, মাধবীলতা ছিন্ন ভিন্ন ধূলি-ধূসরিত হইয়া একপার্শ্বে পড়িয়া আছে।

রতিকান্ত সমুদয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইল। কিন্তু এ সংসারে দুঃখ ভিন্ন সুখ কোথা আছে? তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে, কয় জন লোক সুখী পাইবে? দরিদ্র, দুঃখী, রুগ্ন, ভগ্ন, উৎপীড়িত, শোকপীড়িত লোকে পৃথিবী পরিপূর্ণ। রতি আন্তরিক দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করিল, কিন্তু দুঃখ নিবারণের কোন উপায় করিতে পারিল না। মনে মনে গৌরমোহন ও কেশবকে শত ধিক্কার দিয়া, পর দিন প্রাতঃকালে তথা হইতে প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সঙ্গে যে কয়টী মুদ্রা ছিল, তাহার অধিকাংশ বৃদ্ধার হস্তে দিল। তিন চারি দিন যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিয়া, অবশেষে সিংভূম জেলার অন্তর্গত মহারাজ শশধর রাও বাহাদুরের রাজধানী রঘুনাথগড়ে উপস্থিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

——)*(——

রাজধানী।

উজ্জয়িনী নগরে ভারতবিখ্যাত এক মহাকালী ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ যে, রাজা বিক্রমাদিত্য ঐ কালী স্থাপন পূর্ব্বক, এক বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার চতুর্দ্দিক্ এক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। যে সময় আলতমাস্ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন রাজগুরু শশাঙ্কশেখর দেবীর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। আনুমানিক ১২৩০ খৃষ্টাব্দে আলতমাস্ উজ্জয়িনী আক্রমণ করেন। শশাঙ্কশেখর প্রাচীরের লৌহদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। মুসলমানসেনা রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া, দেবমন্দিরের চারিদিক্ অবরোধ করিয়া রহিল। অল্পদিনের মধ্যে মন্দিরে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। রাজগুরু দেবীর উদ্ধারের জন্য বুক চিরিয়া রক্ত বাহির করিলেন, এবং সেই শোণিতে এক মহাযজ্ঞ সমাধা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অবশেষে তিনি আদেশ করিলেন যে, মুসলমানের হস্তে জাতি ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন না দিয়া, দেবীর পদতলে অনশনে প্রাণ উৎসর্গ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু রজনীযোগে কোন প্রহরী ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল। অনতিবিলম্বে যবনসেনা মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক, অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণকে তরবারে নিহত করিল। দেবীকেও যথেষ্ট অবমাননা করিয়া অবশেষে হস্তিপৃষ্ঠে দিল্লী লইয়া গেল এবং মসজিদের দ্বারদেশে চূর্ণ করিয়া রাস্তার উপর নিক্ষেপ করিল। *

---

* ভারত ইতিহাসে দ্রষ্টব্য।

শশাঙ্কশেখর রাগে থরথর কম্পিত হইলেন। ঊর্দ্ধমুখে, যোড়হস্তে, কাতরকণ্ঠে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে বলিলেন—"যদি কখন কালী স্থাপন করিয়া শত যবনের রক্তে স্নান করাইতে পারি, তাহা হইলেই আমি ব্রাহ্মণ, নচেৎ আজ হইতে আমি কুক্কুরের অধম হইলাম।" তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম, দৃঢ় অধ্যবসায়, ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা ও বাহ্যিক গঠনের ভীষণতা দেখিয়া, অনেক ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সহজে তাঁহার সহিত যোগ দিল। তিনি তেজঃসম্পন্ন রাজপুত্র মাধব রাওকে সম্মুখে করিয়া হস্তী, অশ্ব, সৈনিক সংগ্রহ পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলে উপনীত হইলেন ; এবং নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া যে স্থানে বঙ্গ-নাগপুর রেলের ঘাটশীলা ষ্টেশন, সেই স্থানে এক বিস্তৃত উপত্যকা প্রদেশে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে রাজ্যস্থাপন করিলেন। এই বিস্তৃত ভূভাগকে তিনি পঞ্চ-বিংশতি সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করিলেন। নদীকে পর্ব্বতের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া এক সুবৃহৎ জলাশয়ে বা হ্রদে পরিণত করিলেন। এক-দিকে নদীর অতিরিক্ত জল বহির্গত হইবার জন্য প্রস্তরনির্ম্মিত প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। পর্ব্বতের উপরে একটী সুদৃঢ় দুর্গ স্থাপিত হইল। হ্রদের এক পার্শ্বে রাজপ্রাসাদ সগর্ব্বে গগনভেদী মস্তক উত্তোলন করিল। দুর্গের নিম্নে সেনাবাস প্রস্তুত হইল। প্রত্যেক সমচতুষ্কোণ পুনঃ অনেক-গুলি ক্ষুদ্রতর সমচতুষ্কোণে বিভক্ত হইল। তাহাতে নানা জাতীয় পুষ্প, লতা ও ফলের বৃক্ষে উপবন প্রস্তুত হইল। এক এক উপবনে এক একজন নাগরিক বংশমর্য্যাদানুসারে বাসভবন প্রস্তুত করিলেন।

ইহারই এক সমচতুষ্কোণে ভবানীশঙ্কর একটী বৃহৎ মন্দির উঠাই-লেন। উজ্জয়িনী হইতে আনীত মহাকালীর একহস্ত বেদীর নিম্নে প্রোথিত করিয়া দেবীর এক মনোমোহিনী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। পার্শ্বে এক বৃহৎ জলাশয় খানিত করিয়া প্রস্তর নির্ম্মিত

সোপানাবলি ও বৃহৎ চত্বর প্রস্তুত করিলেন। দীর্ঘিকার অপর পার্শ্বে মাধব রাও এক উচ্চ নবরত্নের মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রঘুনাথের এক বিরাট মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এই বিগ্রহের নামকরণ হইতে রাজধানীর নাম হইল এবং ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক এই দুর্গম বিন্ধ্যাচল মনুষ্যাবাসে পূর্ণ হইল বলিয়া জেলার নাম সিংহভূম হইল।

মহাকালী স্থাপন করিয়া ভবানীশঙ্কর দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। বুঝিতে পারিলেন যে, সকল মনুষ্যই জগতের আদিকারণস্বরূপিণী সেই মহামায়ার পুত্র; ভক্তির উত্তেজনায় নানা ভাবে, নানা সম্প্রদায়ে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। অজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া একজনকে সহোদর ও অপরকে শত্রু জ্ঞান করে। পরস্পরে অনর্থকর যুদ্ধ করিয়া শেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে বলিয়া কি, তিনি এই সংসারের সৃষ্টি করিয়াছেন? কখনই নয়। একতায় জাতির সৃষ্টি, বিশ্লেষণে বিনাশ। পরমাণু সকল একত্র হইয়া এই বৃহৎ জগতের সৃষ্টি করিয়াছে, আবার পরমাণুর বিশ্লেষণে এই জগতের প্রলয় হইবে। তাঁহার ইচ্ছা যে, তাঁহার রাজ্য প্রেমে প্লাবিত হউক। ভবানীশঙ্করের হৃদয় স্বর্গীয় প্রেমে ভরিয়া গেল। ভক্তির স্রোত উথলিয়া উঠিল। মন হইতে যবন বিদ্বেষ দূরে গেল। তাঁহার মনে হইল, যখন উজ্জয়িনীর ন্যায় আর এক রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। তিনি গাঢ় ভক্তিভরে মহাকালীর পার্শ্বে প্রায়োপবেশনে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এখনও এই স্থানে একখানি মর্ম্মর প্রস্তরে এই কথা খোদিত আছে। এখনও এই স্থানে সাধু, সন্ন্যাসী মুক্তির অন্বেষণে উপস্থিত হইয়া যোগসাধনা করেন।

এই রাজধানীতে রতিকান্ত উপস্থিত হইয়া, এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে নিমগ্ন হইলেন। এমন সুন্দর উপবনবিশিষ্ট নগর, এমন প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন সরল রাজপথ, এমন পয়ঃপ্রণালীর সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত এমন আম্র, লিচু,

বকুল, নাগেশ্বর প্রভৃতি বৃক্ষচ্ছায়ায় সুশোভিত সুশীতল রাস্তা দেখিয়া, তাঁহার মনে হইল, যেন কে তাঁহাকে এক নিমিষে মর্ত্ত্য হইতে নন্দনকাননে লইয়া আসিল। কত লোক যাইতেছে, কত আসিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। সুবৃহৎ প্রস্তরে বাঁধান রাস্তার উপর গো, অশ্ব, ও উষ্ট্রশকট বিনা আয়াসে ক্রমাগত দৌড়িতেছে। লোকের পরিচ্ছদ, অবস্থা ও বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া এবং বিপণি মধ্যে রাশি রাশি পণ্যদ্রব্য দেখিয়া সহজেই অনুমান করিলেন যে, রঘুনাথগড় এক সৌভাগ্যশালিনী, পরম লাবণ্য-ময়ী নগরী।

চৌরাস্তায় আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। অকস্মাৎ কতকগুলি শকটে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইল। এক সুদীর্ঘ তেজস্বী প্রহরী সম্মুখে বিপদ দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বংশী বাদন করিল; এবং নিজ হস্তোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিল। কি চমৎকার শিক্ষা! কি কৌশল! যে যেস্থানে ছিল, সে সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল; যেন নড়িবার শক্তি রহিল না। অনতিবিলম্বে বিপদ আপনা হইতে চলিয়া গেল। পুনঃ বংশীর রব শুনিয়া সকলে অভীষ্ট পথে ধাবিত হইল। তিনি প্রহরীকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া ভাবিলেন, এখন এই নগরীর কোন্ স্থানে যাইলে তাঁহার সুবিধা হইবে? বেলাও প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। এইজন্য প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি আগন্তুক—কোথায় যাইলে আমার থাকিবার সুবিধা হইবে, বলিতে পার?" প্রহরী সুমিষ্ট বচনে বলিল,—"সম্মুখে কতকদূর যাইলে নবরত্নের মন্দির দেখিবেন, তথায় আপনি সুখে থাকিতে পারিবেন আমি কি আপনার সঙ্গে যাইব?" রতিকান্ত বলিলেন—"না—আমি উচ্চ মন্দিরের চূড়া এখান হইতে দেখিতে পাইতেছি।" এই বলিয়া দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

মন্দিরের পার্শ্বস্থিত বৃহৎ দীর্ঘিকার শ্বেতস্বচ্ছ সলিল দর্শন করিয়া পুলকিত মনে তিনি সোপানে নামিলেন। একখণ্ড কাষ্ঠফলকে লেখা আছে "স্নানার্থে এই পুষ্করিণী।" স্নানান্তে তিনি একখানি জীর্ণ গৈরিক ধুতি পরিধান করিয়া, গামছাখানি গলদেশে স্থাপিত করিলেন। শনৈঃ শনৈঃ পদ বিক্ষেপে মহলের পর মহল পার হইয়া ঠাকুর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আজীবন যে কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা মনে পড়িয়া গেল। কোন্ পাপের ফলে তিনি ও প্রভা সংসারে নিতান্ত দীনহীনের ন্যায় বেড়াইতেছেন, কোন সুকৃতিবলে গৌরমোহনবাবু অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া নিরন্তর লোক পীড়ন করিতেছেন, কোন্ কর্ম্মফলে হতভাগা কালাচাঁদ অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়া লোকান্তরিত হইল এবং তাহার অভাগা যুবতী রমণী কেন এখন ধূলায় ধূসরিত হইয়া অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জ্জন করিতেছে? তিনি ভাবিতে ভাবিতে উন্মত্ত প্রায় হইলেন; এতদিন পরে ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারে তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইল।

তিনি উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক অপূর্ব্ব দেবমন্দির। শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের মেজে। মর্ম্মর প্রস্তরের বেদীর উপর মূল্যবান্ নানালঙ্কারে বিভূষিত এক তিন হস্ত পরিমিত বিষ্ণুর মূর্ত্তি। বর্ণ—নব দূর্ব্বাদলশ্যাম, চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত। চারিদিকে চারি হস্ত প্রসারিত। এক হস্তে তিনি চক্র, দ্বিতীয়ে গদা, তৃতীয়ে শঙ্খ ও চতুর্থে পদ্মপুষ্প ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে অনেক লোক,—কেহ ভক্তিভরে মূর্ত্তি দেখিতেছে, কেহ ব্যস্ত হইয়া আহারে বসিয়াছে। মন্দিরের এক পার্শ্বে এক বিস্তৃত কক্ষে এক জন অশীতিপর সন্ন্যাসী বৃহৎ শ্মশ্রুজালে জড়িত হইয়া ও দীর্ঘ জটাভার মস্তকে ধারণ

করিয়া অনিমেষ নয়নে দেবমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল যেন কি এক জ্বলন্ত প্রভায় সমাচ্ছন্ন; তাহারই মধ্য হইতে দুইটি বিশাল চক্ষু যেন অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ তেজঃ বিকীরণ করিতেছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, রতিকান্ত গললগ্নীকৃতবাসে যোড়হস্তে, ভক্তিভরে দেবতার ধ্যান করিতে লাগিলেন। যুবা কি কখনও ঈশ্বরের ধ্যান করিতে শিখিয়াছেন? কেবল আকুল বচনে, হুতাস প্রাণে, জলভারাক্রান্ত চক্ষে বলিলেন, "প্রভো! এক জনকে জন্মদুঃখী ও আর এক জনকে চিরসুখী করিয়া কেন ভবে পাঠাইয়াছ?—কেন তুমি এক জনকে হতভাগার ন্যায় পদদলিত করিতেছ ও আর এক জনকে প্রচণ্ড প্রতাপে মহিমান্বিত ও বলদর্পিত করিয়াছ?"—বলিতে বলিতে আপনার দুঃখে তিনি আত্মহারা হইলেন; মস্তক উষ্ণ হইল; চিত্ত কেমন বিকৃতপ্রায় হইল। অকস্মাৎ তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই অচেতন মূর্ত্তি জাগরিত হইয়া উঠিল, মুখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল, চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। ক্রোধকম্পিত স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া যেন বলিলেন,—"অজ্ঞ বালক, উত্তমরূপে আমাকে দেখিয়া লও—এই সুদর্শন চক্রের দ্বারা আমি জগৎ সুশাসন করি, এই গদা দ্বারা অধর্ম্মের মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করি, এই পাঞ্চজন্য শঙ্খ দ্বারা আমি আমার ভক্তদিগকে আমার নিকট আহ্বান করি এবং এই পদ্ম দ্বারা তাহাদের হৃদপদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া জ্ঞানোপদেশ দিই এবং শেষে তাহাদিগকে আমার বৈকুণ্ঠে লইয়া যাই। বালক, আমি সকল জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা, কীটানুকীট আমার চক্ষের অন্তরাল হইতে পারে না। একটী পতঙ্গ অবধি আমার অনভিপ্রায়ে নড়িতে পারে না। অনন্ত সময়ের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, এই সংসারের স্থিতি। আমার রাজ্যে বালক, অধর্ম্মের প্রভাব!"

হু হু শব্দে বালকের চক্ষে জলস্রোত বহিতে লাগিল। যোড়হস্তে,

কম্পিত কলেবরে কহিলেন—"প্রভো! না বুঝিয়া ভাবিয়াছিলাম, এই সংসার কর্ণধারহীন তরির ন্যায়; এখন বুঝিলাম, তুমি জলে, স্থলে, সর্ব্বত্র প্রকটভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে স্থিতি করিতেছ। আমি ক্ষুদ্র বালক তোমার মহিমা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি?" ধীরে ধীরে মূর্ত্তি যেন প্রস্তর-বৎ হইয়া বেদীতে দাঁড়াইলেন। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেলেও সমুদ্রে যেমন অনেকক্ষণ তরঙ্গোচ্ছ্বাস হইয়া থাকে, সেইরূপ রতিকান্তের হৃদয়েও কতক্ষণ বিদ্যুতের ন্যায় ভাব ছুটিতে লাগিল।

দূর হইতে তেজস্বী সন্ন্যাসী তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য, সরলতাপূর্ণ মুখারবিন্দ, দেহলাবণ্য ও নারায়ণে তন্ময়ভাব দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, একদিন মহাপ্রভু চৈতন্য, এই বয়সে, এইরূপ রূপের ডালি মাথায় লইয়া, গয়াতে আসিয়াছিলেন এবং নারায়ণের পদচিহ্ন মাত্র দেখিয়া, প্রেমে বিভোর হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি উঠিয়া আসিলেন, সস্নেহে বলিলেন,—"পুরুষ-সিংহ! আপনি কে? কোথা হইতে আগমন করিতেছেন?"

দেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, ভক্তিভরে রতিকান্ত বৃদ্ধ মহাপুরুষের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বিনয় সহকারে বলিলেন,—"ভগবন্! আমি মাতৃপিতৃহীন অভাগা যুবক—সংসার-সাগরের আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।"

"আপনি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ—আপনার মুখে কে যেন তূলী দ্বারা আঁকিয়া রাখিয়াছে। সন্ন্যাসী না হইলেও আপনি এই মঠে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবেন।"

"না প্রভু! আমি সামর্থ্যবান্ পুরুষ, অন্যায় দান গ্রহণ আমার উপযুক্ত নয়। কর্ম্মই আমার প্রশস্ত পথ।"

সন্ন্যাসী আর কিছু না বলিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য সদানন্দকে সঙ্গে

দিলেন; তিনি রতিকান্তকে লইয়া ভোজনালয়ে গমন করিলেন। এক সুবিস্তৃত কক্ষে অনেক সাধু, সন্ন্যাসী ও উচ্চজাতীয় লোক আহারে বসিয়াছেন। সদানন্দ বলিলেন,—"আপনি কোন্ স্থানে বসিবেন—আপনার জাতি কি?"

রতিকান্ত অম্লানবদনে বলিলেন,—"আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়।"

তিনি আর বাগাড়ম্বর না করিয়া তাঁহাকে এক সুন্দর আসনে বসাইলেন। পাচকেরা নানাবিধ উপাদেয় ব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টক ও অপূর্ব্ব মিষ্টদ্রব্য পরিবেষণ করিয়া, তাঁহাকে পরিতোষরূপে আহার করাইল।

তিনি সময় পাইয়া নবীন ব্রহ্মচারীকে বলিলেন,—"ঐ তেজস্বী সন্ন্যাসী কে?"

"তাঁহার নাম স্বামী হৃষীকেশ। আজীবন তিনি ব্রহ্মচর্য্য করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে জগতে নিষ্কামধর্ম্ম প্রচারিত করাই তাঁহার জীবনের কার্য্য। ধর্ম্ম যে জগতের প্রাণ, অধর্ম্ম যে মৃত্যুর কারণ, এই মহা সত্য তিনি অভেদে, সর্ব্বস্থানে, সকল সময়ে শিক্ষা দিতেছেন। তিনি সুবিখ্যাত তৈলঙ্গ স্বামীর একজন প্রিয় শিষ্য। তিনিই এই রাজ্যের প্রাণস্বরূপ, ধর্ম্মজগতে তিনি পবিত্রভাবে বিরাজ করিতেছেন। তিনিই এই মঠের অধ্যক্ষ; এই স্থানে তিনি উৎসাহী, বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মপিপাসু যুবা সংগ্রহ করিয়া, পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহারাই গ্রামে গ্রামে, বিদ্যালয়ে ও চতুষ্পাঠীতে পরিভ্রমণ করিয়া বালকদিগের রীতিনীতি বিষয়ে শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই জন্য সমগ্র রাজ্যে অতি পবিত্র ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। পাপের সংখ্যা এখানে এত কমিয়া গিয়াছে।"

"এই মন্দির কি মাধবচন্দ্র রাও নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন?"

"সেই পুরাতন মন্দিরের সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ সংস্কার করিয়া মহারাজ শশধর রাও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।"

"এখন এ রাজ্যের রাজা কে ?

"মহারাণী কমলকুমারী মন্ত্রিসভার সাহায্যে এই রাজ্য শাসন করিতেছেন।"

"এই মন্দিরের অবস্থা ও বন্দোবস্ত দেখিয়া মহারাণীর উপর আমার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে।"

"মহাশয়! এই রঘুনাথদেবের প্রসাদে দৈনিক একশত সন্ন্যাসী ও নবাগত অথবা দুরবস্থাপন্ন ভদ্রব্যক্তি চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্য ভোজন করিতে পারেন। মহাকালীর দেবালয়ে সহস্র সাধারণ ব্যক্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন আহার করিতে পারে *। এ রাজ্যে কখনও অন্নকষ্ট হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনা নাই। পয়ঃপ্রণালীর এমন সুবন্দোবস্ত ও করের হার উৎপন্নদ্রব্যের ষষ্ঠাংশের এক অংশ হওয়াতে কৃষকেরা মনের আনন্দে দিনযাপন করিয়া থাকে। পুত্রনির্ব্বিশেষে মহারাণী প্রজাবর্গকে প্রতিপালন করেন। অন্নকষ্ট কোথাও না থাকিলেও প্রত্যেক কেন্দ্রে একটি করিয়া দেবালয়, ও তৎসঙ্গে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় ও অন্নছত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। এইগুলি স্বর্গীয় মহারাজা ও বর্ত্তমান রাণী কমলকুমারী তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ হইতে বিশেষ ভাবে স্থাপিত করিয়াছেন। মহারাণী প্রতি পূর্ণিমায় এই মন্দিরে এবং প্রতি অমাবস্যায় মহাকালীর মন্দিরে, উপস্থিত হইয়া স্থির ও নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় ধ্যানে উপবেশন করিয়া, কখন সমস্ত নিশা অতিবাহিত করেন। স্বামীজীই তাঁহার গুরু। সৌন্দর্য্যে আমাদের মহারাণী জগন্মোহিনী, গুণে লক্ষ্মীস্বরূপিণী, তেজে ভুবনেশ্বরী, চরিত্রে সাবিত্রী, আর দয়াতে তিনি অন্নপূর্ণারূপে এই রাজ্যে অবতীর্ণা হইয়া-

* যিনি কান্দীতে ও বৃন্দাবনে লোকবিখ্যাত লালাবাবুর (মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের) প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির দর্শন করিয়াছেন; তিনিই এই সামান্য বর্ণনার কিঞ্চিন্মাত্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ছেন। তাঁহাকে দেখিলে জননী পুত্রশোক ভুলিয়া যায়, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়, শোকাতুরের শোক চলিয়া যায়।”

শুনিতে শুনিতে রতিকান্তের কেমন ভাবান্তর হইতে লাগিল।

সন্ন্যাসীকে বলিলেন,—“ভাই, এমন পবিত্র, এমন সৌন্দর্য্যপূর্ণ, এমন সুখের রাজ্য ত আর আমি কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই।”

তিনি সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, বাহিরে আসিয়া বকুল-বৃক্ষের নিম্নে মর্ম্মর প্রস্তরের চত্বরে এক ক্ষুদ্র পেটিকা মস্তকে দিয়া শয়ন করিলেন, অমনি শ্রমহরা নিদ্রা তাঁহার চেতনা হরণ করিল।

কতক্ষণ নিদ্রার পর, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিলেন; দেখিলেন এক-জন ভদ্রলোক চক্ষে স্বর্ণনির্ম্মিত চশমা লাগাইয়া ও উচ্চদরের কর্ম্মচারীর মত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার বর্ণ অতীব সুন্দর, দেহ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ, মুখের পারিপাট্য যথেষ্ট আছে। চক্ষু দুইটী দীর্ঘায়ত, নাসিকা উচ্চ ও মুখের পরিমিত, তাহার উপর চশমা থাকাতে তাঁহার বাহ্যাকৃতি অপেক্ষাকৃত গম্ভীর করিয়াছে। যৌবন কালে তিনি যে অতিশয় সুন্দর পুরুষ ছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখি-লেই বিশ্বাস হইত। রতির সহিত মিলিতচক্ষু হইবামাত্র, তিনি সস্নেহে বলিলেন,—“বাবা, তুমি কে?”

“মহাশয়—আমি কখনও এই স্থানে আসি নাই।”

“তাহার আর সন্দেহ কি? আমি কখনও তোমার মত সুন্দর যুবা এখানে দেখি নাই—তোমার বাড়ী কোথায়?”

“মহাশয়—সে অনেক কথা—সে কথা এখন জিজ্ঞাসিবেন না।”

“তোমার পিতা মাতার নাম?”

“সে কথাও আমি সংক্ষেপে বলিতে পারিব না।”

“আমি বুঝিয়াছি, তুমি ভদ্রলোক, তোমার অবয়ব ও স্বভাবে বেশ

বোধ হইতেছে। কোন কারণে তোমার মনে বৈরাগ্য হইয়াছে, তাই সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছ—এখন কোথায় যাইবে?"

"আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান কোথাও নাই?"

"আমার বাড়ীতে কি যাইবে? আমি ক্ষত্রিয়, এই স্থানে আমার বাড়ী।"

"মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি বাধ্য হইলাম। মহাশয় কে? তাহা কি আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"লোকে আমাকে রাজস্বসচিব বলিয়া থাকে।" এই বলিয়া তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"আমার পুত্র জীবিত থাকিলে, তাহার বয়ঃক্রম এই পূর্ণ বিংশতি বৎসরে পড়িত, পুত্রহীন লোকের জীবন বৃথা।" সম্মুখে যুগ্মঅশ্ব সংযোজিত সুন্দর শকট প্রস্তুত ছিল, বৃদ্ধ ও রাত উভয়ে আরোহণ করিলেন। অনতি-বিলম্বে এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উপবন শোভিত দ্বিতল বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নামিয়া উভয়ে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

——(:**:)——

ভানুমতীর বাজী।

"লাগ-লাগ্-লাগ্-লাগ্, হাড়ি-ঝি চণ্ডীর আজ্ঞায় লাগ্, কামিখ্যার মন্ত্রবলে লাগ-লাগ্-লাগ্" করিয়া একজন দীর্ঘ কৃষ্ণ সবলকায় পুরুষ প্রকাণ্ড ঝুলি হস্তে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছে। এই পুরুষকে 'বেদে' বলে। বেদে দিন রাত্রি সমানে ভানুমতীর বাজী করিয়া, কাহাকেও হাসাইতেছে, কাহাকেও কাঁদাইতেছে, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাকে ভগ্নকুটীর করিতেছে, আবার সেই কুটীরের স্থানে শ্বেত প্রস্তরের রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতেছে। লোকে হতজ্ঞান; কখন বেদেকে তিরস্কার করিতেছে, কখনও বা ধন্যবাদ দিতেছে। সংসারে বেদের কার্য্য দেখিয়া কে না বিচলিত, কে না মুগ্ধ হয়? এই বেদের ডাকনাম কপাল, রাশিনাম বিধাতা। বিধাতার হস্তে দুইখানা ক্ষুদ্র অস্থি আছে; কেহ কহে তাহা বনমানুষের অস্থি, কেহ বলে তাহা হাড়ি-ঝি চণ্ডীর অস্থি, কেহ কামিখ্যার মহাযোগিনীর অস্থিও বলে। কিন্তু আমার মতে, একখানা ধর্ম্মের, অপরখানা অধর্ম্মের অস্থি। এই দুই অস্থির সাহায্যে বিধাতা পুরুষ দ্বারে দ্বারে, প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক মনুষ্য জীবনে, দিন রাত্রি, আলোকে অন্ধকারে, সকল সময়ে, সকল স্থানে বাজী করিতেছেন। বিশ্বের অধিপতি দুজ্ঞের্য় বাসুদেব, সংসারে বাজী দেখাইবার জন্য বিধাতাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। বিধাতা বিনা ব্যয়ে, সংসারের লোককে

এক সময়ে হাসাইতেছেন আর এক সময়ে বা কাঁদাইতেছেন। বেদে তোমার এ বাজীর উদ্দেশ্য কি? এ খেলা খেলাইতে তোমায় কে শেখাইল? শুধু তামাসা দেখাইবার জন্য কোন্ বুদ্ধিমান্ তোমায় বেতন দিয়া নিয়োজিত করিল?

রামনগরে সারদা বাবুর বৈটকখানায় আজ মহা ধূমধাম চলিতেছে। একজন নূতন বাদক ও একজন উৎকৃষ্টা গায়িকা আসিয়াছে। পাকোয়াজের চাঁটি চটাং চটাং করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। গায়িকা সন্ধ্যা দেখিয়া পূরবী রাগিণীর আলাপ করিতেছে। ও এসরাজের সহিত সুর মিল করিতেছে। রাস্তার ধারে লোকের জনতা হইয়াছে। গায়িকার যেমন সুমধুর স্বর, বাদ্যকরের তেমনই মিষ্ট হাত। সারদা বাবু আকাশের দিকে চক্ষু তুলিয়া আছেন, চটুলা বারবিলাসিনী মিষ্ট হাসি হাসিয়া অধরে সুধা তুলিয়া দিতেছে। গেলাসে মুখ আছে, বাবু ভাবিতেছেন,—"ইহা অপেক্ষা স্বর্গে আর কি অধিক সুখ থাকিতে পারে?" গায়িকা গান ধরিয়াছে, যখন কণ্ঠস্বর তারাতে উঠিতেছে, তখন বোধ হইতেছে যেন মধুর স্রোত ও ও শব্দে আকাশে বহিয়া যাইতেছে। বাদ্যকর পরণের উপর সঙ্গত করিতেছে, হাত যেমন দ্রুত চলিতেছে, তেমনই কণ্ঠস্বরের নিয়ে থাকাতে উভয়ে মিলিত হইয়া কি এক সুন্দর ঝঙ্কার তুলিয়াছে। শ্রোতা যে যে স্থানে আছে, যেন কাষ্ঠের পুত্তলীবৎ স্থির হইয়া গিয়াছে। এ হেন সময়ে সেই দীর্ঘ, কৃশ, মলিনকায় বেদে ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল। এ সুখ সময়ে কে তাহাকে লক্ষ্য করে? বাম তূণ হইতে এক তীক্ষ্ণ বাণ লইয়া, বেদে অজ্ঞাতসারে সারদার হৃদয়ে আঘাত করিল। সারদা বজ্রাহতের ন্যায় ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিল। মহাব্যস্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখে, উৎকৃষ্টময়ী ও কাঞ্চনমালা ধরাশায়িনী হইয়াছে। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া

গিয়াছে। সারদা সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইল। সেও কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যায় শয়ন করিল।

বহির্বাটীর লোকেরা মহাব্যস্ত হইয়া পড়িল। একজন সারদার পশ্চাতে আসিয়া সমুদায় শুনিয়া গেল। সে উপস্থিত হইলে, সকলে এক সময়ে ও প্রায় এক স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল,—"ব্যাপার কি ?"

উত্তর। ব্যাপার মন্দ নয়—মাথার উপর যে খড়্গখানা এতদিন ঝুলিতেছিল, আজ ভূমে পড়িয়া চূর্ণ হইয়াছে।"

সকলে। (সমস্বরে) স্পষ্ট করিয়া বল বাবা—আমরা এ সময় মুগ্ধবোধের সূত্র বুঝিতে আসি নাই।

উত্তর। ওহে নবকুমার বাবুর মৃত্যু হইয়াছে।

সকলে। তবে ত সর্ব্বনাশ ?

উত্তর। সর্ব্বনাশ! না এইবার পৌষমাস—এইবার আমোদ রাস্তায় গড়াইবে, শ্রাদ্ধের দধির সঙ্গে বোতলবাহিনী মিশিয়া রাস্তা অবধি কাদা করিবে।

সকলে। বাবা, একমাস উপবাসের পর জীবন থাকিলে হয় ?

সে রাত্রি গান বন্ধ হইল। ক্ষণকালের মধ্যে সকলে চলিয়া গেল। বহির্দ্বারে অর্গল পড়িল।

নবকুমার দে কলিকাতায় মরিয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে অন্তিম সময়ে স্ত্রী পুত্র কেহই উপস্থিত হইতে পারে নাই। টাকা কড়ি যাহা কিছু ছিল, অগত্যা নির্ব্বিঘ্নে পরহস্তে চলিয়া গেল। সে হাত যে কাহার, তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। সারদা যে মুখাগ্নি করিতে পারিল না, এই দুঃখ পরিজনদিগের অন্তরে অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া বসিল। কিন্তু কালের উপর কাহার ক্ষমতা আছে ? কে তাহার সহিত বিরোধ করিয়া ফল পাইয়াছে ?

তাহারা কখন উচ্চৈঃস্বরে, কখন নীরবে রোদন করিয়া, দুই সপ্তাহের মধ্যে দুঃখ জীর্ণ করিয়া ফেলিল। নবকুমার সে বাটী আসিত না, সুতরাং পরিবারবর্গের মমতাও উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়াছিল। একমাস অতীত হইল। শ্রাদ্ধ সমাধা হইল। বহির্বাটীর দ্বারোদ্ঘাটিত হইল। সমবয়স্কেরা একে একে সমুপস্থিত হইল। ধীরে ধীরে পাকোয়াজের শব্দ আরম্ভ হইল। গুণ গুণ স্বরে গানের সুর উঠিল। আবার এসরাজে আবার ঝঙ্কার তুলিল। অবশেষে ষোলকলা পূর্ণ হইল।

বাস্তবিক নবকুমারের মরণে সারদা বাবুর আর্থিক কোন কষ্ট হয় নাই। পৈতৃক সঞ্চিত-অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছিল। কিন্তু লক্ষ্মী সদয়া হইলে, উপায়ের সহস্র পথ বাহির হয়। বরদা ক্ষীণা স্ত্রীলোক ও একাকিনী হইয়াও অর্থাগমনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। বরদার করুণায় সারদার কোন কষ্টই ছিল না। ইচ্ছা হইলেই নায়েবকে পত্র দিত, সে অবাধে টাকা পাঠাইয়া দিত। নির্ব্বোধ, আমোদ প্রিয়, অমনোযোগী বাবুর সমক্ষে নায়েব অল্প সময়ে বিলক্ষণ দশ টাকা সঞ্চয় করিল।

একমাস সাবকাশের মধ্যে, বিধাতা পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া, একখানি চমৎকার ঐন্দ্রজালিক পাশ রচনা করিল। উভয়ে সারদা বাবুর বাটীর উপর রাখিয়া দিলেন। স্বর্গে দেবতারা কৌতুক দেখিবার জন্য দলে দলে মন্দার পর্ব্বতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মর্ত্তে এ ভোজবাজীর কোন সংবাদ নাই। ধূর্ত্তা উৎফুল্লময়ীও আশু বিপদের সংবাদ পায় নাই; সুতরাং সকলেই শিথিল আছে। স্বর্ণপুত্তলী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বরদাসুন্দরী অকস্মাৎ এই পাশে পড়িয়া গেলেন। স্বর্গ হইতে সুবর্ণযান মর্ত্তে আসিল। যানে উঠিয়া বরদা স্বর্গে আসিলেন। দেবেন্দ্র আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন,—"প্রিয়ে, এতদিনের পর দুরন্ত দুর্ব্বাসার

শাপ মুক্ত হইল।" বিমুক্ত শচীদেবী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, —"নাথ, দুর্ব্বাসার ক্রোধ জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ; আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াও তাঁহার ক্রোধের উপশম হয় নাই—সে স্থানেও আমাকে দিবারাত্রি জ্বলিতে হইয়াছিল।" স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইল। বেদে ও বেদিনী স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

স্বর্গের কাণ্ড মর্ত্তের লোকে কি বুঝিবে ? সকলে দেখিল, ত্রিদোষ জ্বরে বরদার মৃত্যু হইল। ডাক্তার, কবিরাজ অবিরত ঔষধ সেবন করাইয়াছিল, কিন্তু কালের পাশ হইতে কেহ তাহাকে মুক্ত করিতে পারিল না। সারদা আছড়াইয়া ভূমে পড়িয়া গেল। উৎফুল্লময়ীর সুখস্বপ্ন আজ ভাঙ্গিল। যাহার বলে পৃথিবীকে মৃন্ময় ভাণ্ড জ্ঞান করিয়া পদদলন করিত, আজ সেই বল অপহৃত হইল। চিরদিন পরের মন্দ করিয়া আসিয়াছে, কখনও যে নিজের মন্দ হইবে, তাহা সে কল্পনায়ও স্থান দেয় নাই। এখন উপর্য্যুপরি দুই বিপদে কাতরা হইল। উৎফুল্লময়ী ও কাঞ্চনমালা কতদিন একাসনে বসিয়া কাঁদিল। নবকুমারের বিরহ যাতনা এখন নবভাব ধারণ করিয়া দুর্ব্বিসহ যাতনা প্রদান করিল।

বিধাতা, তোমার ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা অতি চমৎকার! বরদার সহিত সারদার সমুদয় সুখ চলিয়া গেল। সুখের জমিদারী, শ্বশুরের বিলাসভবন কিংখাবের পরিচ্ছদ, গাড়ি ঘোড়া, লোকজন যেন নিশার স্বপনের মত অন্তর্হিত হইল। হতবুদ্ধি হইয়া সারদা বিধাতার ভেল্কি দেখিতে লাগিল। বরদার গর্ভে তাহার কোন সন্তান ছিল না, সুতরাং উইলের মর্ম্মমত সেই সম্পত্তি রামচন্দ্র মিত্রের সগোত্রে পড়িল। সুখের যবনিকা জন্মের মত পতিত হইল।" সারদার অবস্থার সমূহ পরিবর্ত্তন হইল পৈতৃক ঋণ ও এক ভদ্রাসন ব্যতীত তাহার আর কোন সম্পত্তি রহিল না।

এক সপ্তাহ উৎফুল্লময়ী নিতান্ত শোকবিহ্বলা হইয়া এক স্থানে পড়িয়া রহিল। তাহার দুঃখ-চিন্তার শেষ নাই। "এত করিয়া কি শেষে মুখের অমৃত পোড়া রাহু কাড়িয়া লইল? রামচন্দ্রের বক্ষে বজ্রাঘাত করিলাম, অবোধ গিরীশকে অকালে বিসর্জ্জন দিলাম, যক্ষের ধন গৃহে আনিলাম, শেষে কি এই হ'ল? এমন সাধের সংসার পাতিলাম, তাহা কি আমার ঘুচিয়া গেল? ওরে ও হতবিধে! তোর মনে কি এই ছিল? আমি ত মনে করিলে, কত লোকের কত গুরুতর অপরাধ করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা ত করি নাই; ধর্ম্মের মুখ চিরকালই দেখিয়াছি। তবে রে ধর্ম্ম! তুই কেন আমার সহিলি না? কেন তুই অকালে ননীর পুতুলকে তুলিয়া লইলি? আমার বরদাত কখনও কাহার অপকার করে নাই, তবে কেন তুই তাহার মুখপানে চাহিলি না? কত লোক কত গুরুতর পাপ করিতেছে,—কত মানুষ খুন করিয়া, কত লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া ধন সঞ্চয় করিতেছে; —আর আমি কি করিয়াছি? রামচন্দ্রের ধন তাহার কন্যাকে দিয়াছিলাম; এই কি পাপ? এই জন্য কি আমার এই সর্ব্বনাশ হ'ল? ধর্ম্ম মানিয়া যদি দুঃখ দূর হ'ল না, তবে আর কিসের ধর্ম্ম তবে আর কিসের সংসার? কে কার? আজ অবধি উৎফুল্লময়ী ডাকিনী হইল। পরের অপকার করাই, আজ হইতে তাহার ব্রত হইল। আজ হইতে সংসার লণ্ড ভণ্ড হইবে। আমিত জন্মের মত গিয়াছি; আমার শান্তি আর কি হইবে? কিন্তু দেখিব দেখিব—ধর্ম্ম কেমন তুমি সুখে সংসার কর।

উৎফুল্লময়ী ভ্রূকুটী করিল। মুখের ভঙ্গী ভয়ানক হইল। দন্তঘর্ষণের শব্দ হইল। তাহার ক্রোধের শেষ ছিল না। পিঙ্গল চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে শত মন্ত্র পাঠ করিল। নাসিকায় ক্ষুদ্র তিলক রেখা দিল। বস্ত্রাঞ্চলে বিষচূর্ণ বাঁধিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণে কাঞ্চনের কর্ণে কি কহিয়া বাটীর বাহির হইল। খিড়কী দ্বারের নিকট তিন বার কুটা কাটিল, তিনবার দিক্ প্রদক্ষিণ করিল, উর্দ্ধ মস্তকে মন্ত্রপাঠ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে ধূলা ছড়াইল অবশেষে কহিল, —"বঙ্গে এইবার ঘোর প্রলয় হইবে—শত্রুর বংশ নির্ম্মূল হইবে—উৎফুল্ল-ময়ী সর্ব্বেশ্বরী হইবে, তবে তাহার মনের কালী যাইবে।"

উৎফুল্লময়ী একাকিনী সন্ধ্যাসময়ে বাটীর বাহির হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীমসিংহের দরবার।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। স্বাধীন নগরের ক্ষুদ্র দুর্গ মধ্যে ভীমসিংহ উপবিষ্ট; পাত্র মিত্র চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া আছে। সম্মুখে উজ্জ্বল বর্ত্তিকা জ্বলিতেছে। ভীমসিংহের উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ সেই আভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশাল চক্ষু রক্তবর্ণ, তাহা কখনও ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, কখন পার্শ্বে গমন করিতেছে। ভাব দেখিলে বোধ হয় যেন চিত্ত অস্থির ও মন বিমর্ষ। সে কতক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল—"রঘুবীর—কি স্থির হইল?"

রঘু। আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, অনেক কাঁদিলাম, অনেক বুঝাইলাম কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা স্থির।

ভীম। আমি আর একবার চেষ্টা পাইব, তাহার পর নিতান্ত অনিচ্ছা হইলেও বিধিমত কার্য্য করিব।

রঘু। নরেন্দ্রলাল বাবুর পুত্র—

ভীম। আমি জানি কিন্তু নিয়ম সকলের নিকট সমান।

রঘুবীর স্থির রহিল।

ভীমসিংহ পুনরায় কহিল—"রঘুবীর, তুমি তাহাকে একবার লইয়া আইস।"

রঘুবীর ধীরে ধীরে পাতালপুরে চলিল। পশ্চাতে একজন ক্ষুদ্র

প্রদীপ লইয়া অনুগমন করিল। বহির্দ্বার রুদ্ধ ছিল, হস্ত দ্বারা এক স্থান 'টিপ' দিবামাত্র অর্গল খুলিয়া গেল। রঘুবীর সোপানে নামিল। দশটী সোপান পার হইয়া আর একটী ক্ষুদ্র দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাও বদ্ধ। চাবি স্পর্শে তাহাও মুক্ত হইল। সে সঙ্গীর নিকট হইতে প্রদীপ লইয়া কহিল "তুমি বাহিরে অপেক্ষা কর।" এই বলিয়া কারাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিল।

এক সাধারণ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকোষ্ঠ; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে আট হাত, উর্দ্ধে ছয় হাত। পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন, লৌহ গরাদের দ্বারা রক্ষিত। আলোক ও বায়ু সেই রন্ধ্র দিয়া প্রবেশ করিত। প্রকোষ্ঠের এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র খট্টার মধ্যে সামান্য শয্যার উপর কৃষ্ণশঙ্কর শয়ন করিয়া আছেন। মুখখানি ম্লান, শরীরে পূর্ব্বের ন্যায় বল নাই; দুই মাসের অধিক এই সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করিয়া, তাঁহার মন এত দুর্ব্বল হইয়াছে যে, একদণ্ড স্থির চিত্তে চিন্তা করিবার সাধ্য নাই।

প্রদীপের আলোক বন্দির মুখে পতিত হইবামাত্র, তিনি দ্বারের দিকে ম্লান মুখ ফিরাইলেন। রক্তহীন বিবর্ণ চক্ষু দুইটী উন্মিষিত করিয়া, হুকুমের অপেক্ষায় রহিলেন। রঘুবীর তাঁহাকে দেখিয়া কহিল,—"কেমন আছেন?"

কৃষ্ণ। আমি আর বাঁচিব না। আমার সমুদায় শরীর মধ্যে মধ্যে ভয়ানক কম্পিত হইতেছে, কথা কহিতে কষ্ট বোধ হয়। এই নরকে আর কতদিন থাকিব?

রঘু। আপনার কষ্ট দেখিয়া আমি সুখী নই। সত্য আপনাকে আমি অধর্ম্ম যুদ্ধে হত করিয়াছি; কিন্তু এখন আপনার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাতে যদি সম্মত হন, আমি এইদণ্ডে আপনাকে মুক্ত করিতে পারি।

বন্দি স্থিরভাবে কহিলেন,—"রঘুবীর, সে কথার কেন পুনরুত্থাপন কর। এ ছার জীবনের জন্য প্রতারণা করিব! তবে কি ঈশ্বরের রাজ্যে ধর্ম্ম নাই? আমি সকল সহিতে পারি, কিন্তু কাপট্য সহিতে পারি না।

রঘু। আপনি মুক্ত হইলে কখনও আমাদের অপকারের চেষ্টা পাইবেন না যদি এই মাত্র স্বীকার করেন, তাহা হইলেও আমি আপনার মুক্তির চেষ্টা পাই।

কৃষ্ণ। আমি মুখে স্বীকার করিলে তোমাদের কেমন করিয়া বিশ্বাস হইবে?

রঘু। আপনার কথা আমাদের বেদ; বিশেষতঃ এমন ভাবে পত্র লিখিয়া দিবেন যে, ভবিষ্যতে আপনি অপকারের চেষ্টা করিলেও স্বয়ং অপরাধী হইবেন।

কৃষ্ণশঙ্কর গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"আমি কখনই তেমন পত্র লিখিয়া দিব না। দস্যুর নিকট প্রাণ ভিক্ষা করা বা চিরজীবন বাধ্য থাকা অপেক্ষা শতবার মরণ শ্রেয়ঃ। রঘুবীর, তোমার অন্তর আছে, দস্যু বলিয়া তুমি এখনও পাষাণ হও নাই।"

রঘুবীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"আজ আপনার বিচার হইবে।"

কৃষ্ণ। (সবিস্ময়ে) কিসের বিচার?

রঘু। শেষ বিচার—সেনাপতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, আজ যাহা হউক শেষ হইবে। আমার সহিত আসুন।

বন্দি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিলেন। সে উভয় পদে লৌহ শৃঙ্খল পরাইয়া দিল। তখন সেই ক্ষীণ শরীরে প্রচণ্ড ক্রোধ ক্রীড়া করিতে লাগিল। রক্তহীন চক্ষু লাল হইল। সমুদয় শরীর কম্পিত

হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—"রঘুবীর, এ হস্ত মুক্ত থাকিতে, এ পদে কে লৌহ শৃঙ্খল পরাইতে পারে? কিন্তু তুমি আমার বন্ধু।"

রঘু। তাহা কি আমি জানি না? সেই জন্যই ত হস্তমুক্ত দেখিয়াও একাকী আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।

ঝন্ ঝন্ বাদ্য করিতে করিতে বন্দি ভীম সিংহের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কতক্ষণ পরে ভীমসিংহ রক্তচক্ষে কহিলেন,—"বন্দি,—কি স্থির করিয়াছ?

কৃষ্ণ। ধর্ম্মই স্থির তাহা আবার জিজ্ঞাসিবে?

ভীম। এখনও সময় আছে, সকল বুঝিয়া দেখ, শেষ প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তোমাকে এক নিশ্বাসে রাজা করিতে পারি। তুমি বুদ্ধিমান, ধীর, বীর ও সাহসী; তবে কেন তুমি অবিবেচকের ন্যায় কথা কহ?

কৃষ্ণ। দস্যু, কোন্ বুদ্ধিমান অক্ষত শরীর ক্ষত করে? এমন শান্তদেশে বিদ্রোহ উত্তেজনা করিয়া কোন্ মূর্খ ভারতের অসুখ বৃদ্ধি করিবে? শত শত লোকের প্রাণ কেন অকারণে বাহির হইবে? উদ্দাম বীর নেপোলিয়ান্‌কে ইংরেজ পরাস্ত করিয়াছেন; দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র দ্বীপের মনুষ্য হইয়াও সমুদয় পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন; কুমারিকা হইতে হিমালয়, কাবুল হইতে আভা, এই সুবিস্তৃত দেশ তাঁহাদের করতলগত। কোন্ মুসলমান বা হিন্দুবীর তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছেন? কিরূপে দেশ সুশাসন করিতে হয় তাহা তাঁহারাই জ্ঞাত আছেন। অত্যাচার, উৎপীড়ন, দস্যুতা, ঠগী দেশ হইতে দূর করিয়াছেন। তেমন অসীম তেজস্বী শত্রুর সম্মুখে তুমি মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া কেমন করিয়া দণ্ডায়মান হইবে! শান্তিপ্রিয় দেশে কেন তুমি অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে? তোমার স্বীয়

অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য কেন সমগ্র ভারতকে মজাইবে? তুমি এ অভিলাষ ত্যাগ কর। ইংরেজদিগের সংগ্রাম ও শাসনকৌশল অবলম্বন করিয়া কোন দেশীয় রাজ্যের উন্নতি সাধন কর; তাহা হইলেই তোমার জীবনের কার্য্য সমাধা হইবে।

ভীমসিংহ বিকৃতস্বরে কহিল—'যুবা, বক্তৃতা দিবার জন্য তোমায় আহ্বান করি নাই। আমার কার্য্য, আমার উদ্দেশ্য, আমার বল, আমার ইচ্ছা, আমিই বুঝিতে পারি। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে দাবানল সংঘটিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী সমষ্টিতে বৃহৎ মহানদীর জন্ম হয়। চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মহাত্মা শিবাজী ভবিষ্য মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। আমি উপদেশ দিবার জন্য তোমায় আহ্বান করি নাই। আমার শেষ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দাও।"

কৃষ্ণ। তুমি প্রথম দুই প্রশ্ন কি কারণে পরিত্যাগ করিলে?

ভীম। তাহার উত্তর আমি অন্যত্র পাইয়াছি।

কৃষ্ণ। কি জানিয়াছ?

ভীম। প্রভাবতী তোমার মাতুলানীর গৃহে আছে এবং তুমি তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী।

কৃষ্ণ। ইহাতে কি তুমি সুখী হইয়াছ?

ভীম। তাহার আর সন্দেহ কি?

কৃষ্ণ। ইহার অর্থ কি?

ভীম। তুমি শেষ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিলে আমি সমুদায় অবস্থা তোমায় বলিতে পারি; এবং এক মুহূর্ত্তে সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইবে। প্রভাবতী তোমার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে, বন্দি হইতে তুমি রাজসিংহাসনে উঠিবে। আমি তোমার পদানত হইয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া চীৎকার করিব। এখন বুঝিতেছ শেষ প্রশ্নের উত্তর কত গুরুতর?

কৃষ্ণ। দস্যুপতি, তোমার কথা শুনিতে দিই, কিন্তু আত্মসুখের জন্য আমি কোন দিনও বিদ্রোহ উত্তেজনা করিতে পারিব না। আমি কখনই তোমাদিগকে সাহায্য দান করিতে পারিব না, পরন্তু আমি রাজা হইলে তোমাকে বন্দি করিব এবং বিদ্রোহী বলিয়া দণ্ডাজ্ঞা দিব।

ভীমসিংহ আরক্ত নয়নে ও বিকৃতস্বরে কহিল,---"বটে, নিতান্ত তোমার দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে; এ অপদার্থ জীবনের শেষ যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। তোমায় কোন গূঢ় কারণে জীবিত রাখিয়াছি। বন্দি, আর একবার, এই শেষ জিজ্ঞাসা। নিজের মঙ্গল চাও ত চিন্তা করিয়া উত্তর দাও।

কৃষ্ণ। বার বার কেন বিরক্ত কর? পুরুষের কথা কি কখন প্রলোভনে বা সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়? আমি আমার প্রাণের মমতা কিছু মাত্র করি না। যদ্যপি রাজ্য লাভ আমার ভাগ্যে থাকে, কে তাহা রোধ করিতে পারে?

ভীমসিংহ রঘুবীরের পানে চাহিয়া কহিল,—"রঘুবীর পাষাণের সহিত কথোপকথন করিয়া কোন ফল নাই।" পরে বন্দির দিকে সকোপ কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"দেখ, আগামী কার্ত্তিকী অমাবস্যায় তোমাকে মহামায়ার নিকট উপহার দিব---আর এক মাসের কিঞ্চিৎ অধিক আছে। কাহার সাধ্য ভীমসিংহের হুকুমের অন্যথাচরণ করে।

কৃষ্ণ। দস্যু, মরণ ত মনুষ্য জীবনের অকাট্য সংঘটন। কোন্ উপায়ে কে মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে? তবে মরিতে আমার শঙ্কা কি? কিন্তু একটী মাত্র আমার অনুরোধ আছে; তুমি কি রাখিবে?

ভীম। ইচ্ছা হয় বলিতে পার

কৃষ্ণ। প্রভাবতী চির অভাগিনী, এ সংসারে তাহার সকলই আছে, কিন্তু তোমার জন্য এখন তাহার আপনার কেহই নাই। আমি এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি স্বকার্য্য সাধনের জন্য তাহার জন্ম গোপন করিয়াছ, পর—কিন্তু সে প্রেমের মূর্ত্তিকে কখন তুমি কষ্ট দিও না।

ভীম। তোমার সমক্ষে আমি তাহার বিবাহ দিব। আমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

কৃষ্ণ। অবলার উপর অত্যাচার ধর্ম্মে সহিবে না। ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিবেন। আমি আমার স্বর্ণ প্রতিমা প্রভাবতীকে ঈশ্বরের সমক্ষে ধর্ম্মের হস্তে সঁপিলাম।

এই সময় একজন ক্ষীণা দীর্ঘকায়া কেশশূন্যা বিধবা নারী প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। রঘুবীর তাহাকে দেখিয়া মুখ ভার করিয়া অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইল। ভীমসিংহ সস্নেহ সম্ভাষণে কহিল—"অম্বিকে! এই আসনে উপবেশন কর। সম্বাদ কি?"

"আমি সকল স্থির করিয়াছি। জাতিতে ক্ষত্রিয়। রূপ গুণের পরিচয় কি দিব। যুবতীর কথা দূরে থাকুক, বৃদ্ধার মন টলে, সকল বিষয়ে সম্মত, কিন্তু একটীর অভাব হইয়াছে।

"কি—কি"

"সাহস নাই।"

"সে ভাল—একটু ভীতু লোকেরই কর্ম্ম। তাহা হইলে মুঠির ভিতর থাকিবে।"

"আর একটা কথা আছে।"

"কি"

'বয়স প্রায় ৩৮ বৎসর।'

"সে ত আরো ভাল।"

"বিবাহ কোন্ সময় হইবে ?"

ভীমসিংহ একটু চিন্তা করিয়া কহিল,—"গণকের মত হইলে অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে হইবে। আর প্রায় দুই মাস দেরী আছে।"

"ভাল প্রভাকে কোন্ সময় আনা হইবে ?"

"সে সকল কথা পরে হইবে।"

"একটা তীক্ষ্ণ কণ্টক আছে। সে কথা এতদিন বলি নাই, আজ বলিব।" এই বলিয়া ভীমসিংহের কাণে কাণে কি কহিল। সে তাহা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া কহিল—"বল কি! আমি ত কখন শুনি নাই।"

"না শুনিবারই কথা। সে বড় গোপনীয় বিষয়।" আমার বিশ্বাস ছিল যে ক্ষুদ্র কীট জন্মিয়াই মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি জীবিত।

"তবে ত সব গোল্লায় গেল।"

"কেন—কেন ভয় কি ?"—এই বলিয়া অঞ্চল প্রান্ত হইতে বিষ-চূর্ণ দেখাইয়া রাক্ষসী কহিল,—"একবার তাহার দর্শন পাইলেই ইহা দ্বারা সমস্ত কণ্টক নির্ম্মূল হইবে।"

এই সময় ভীমসিংহের চক্ষু কৃষ্ণশঙ্করের উপর পতিত হইল। সে রঘুবীর সিংহকে বলিল,—"রঘুবীর ইহাকে কারাগারে লইয়া যাও, ও যত্নপূর্ব্বক একমাস জীবিত রাখিও যেন মা উগ্রচণ্ডীর চিত্ত প্রসন্ন করিতে পারি।"

বন্দি পুনরায় কারাগারে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"প্রভা, আমি ত জন্মের মত গিয়াছি কিন্তু তোমার জীবন ত পাপাত্মার অসির সন্নিকট হইয়াছে। হায়! এমন দুর্দ্দিনে,

এমন বিপদে, আমি তোমার কোন উপকার করিতে পারিলাম না।” পরে সকরুণ নেত্রে রঘুবীরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, “বন্ধো! তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ; আমি যে এতদিন মরি নাই, সে কেবল তোমার যত্নের ফল। একমাত্র ভিক্ষা আছে, তাহা কি তুমি দিবে?”

রঘু। সঙ্গত হইলে বাধা কি?

কৃষ্ণ। প্রভার ভয়ানক বিপদ্ সন্নিকট হইয়াছে আমি একখানি পত্র দিব, তুমি কি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিবে?

রঘু। আপনার সকল কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এ বিশ্বাস ঘাতকের কায, সুতরাং—

কৃষ্ণ। আর বলিবার আবশ্যক নাই।

ভাবে বন্দির হৃদয় পূর্ণ হইল। একে রুগ্ন শরীর, তরল চিত্ত, তাহাতে ভীমসিংহের সহিত কথোপকথনে অস্বাভাবিক তেজঃ মস্তিষ্কে ক্রীড়া করিতেছিল; অকস্মাৎ নিজের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ও প্রভার বিপদবার্তা অবগত হইয়া, তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। ভাবে বিহ্বল ও ক্রমে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে উঠিলেন, কিন্তু আর নিদ্রা হইল না। নিমীলিত নেত্রে, দগ্ধ হৃদয়ে, অশান্ত চিত্তে, প্রভাত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সেই রাত্রি হইতে কৃষ্ণশঙ্করের অবস্থান্তর হইল। কিয়দ্দিনের মধ্যে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, অবধারিত অমাবস্যার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।
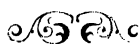
প্রায়শ্চিত্ত।

আজ কেশবশঙ্করের বিচার। ফৌজদারী আদালত লোকে লোকারণ্য। নরেন্দ্রলাল বাবু স্বয়ং উপস্থিত। প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে বেঞ্চের একপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। বস্ত্রের মধ্যে হরিনামের মালা লইয়া জপ করিতেছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কারাগারের দ্বারে দণ্ডায়মান, দ্বিতীয় পুত্র নিরুদ্দেশ; অস্পষ্ট ভাষায় তাহার মরণ সংবাদও উপস্থিত হইয়াছে। এমন দুঃসময়ে, এমন বিপদেও নরেন্দ্রবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। তিনি প্রগাঢ় ভক্তিভরে ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা দেখিতেছেন। কখন হৃদয়ের পাপ অন্বেষণ করিতেছেন, কখন বৈরাগ্য শিক্ষা করিতেছেন, কখন ঈশ্বরের ন্যায়-বিচার দেখিতেছেন, কখনও ভাবিতেছেন, এ সংসারে কে কার? কল্পনার সম্মুখে মায়ার বশে সংসারে সম্বন্ধ, নতুবা এ সংসারে কে কার?

বেলা একটা। বিচারপতির এখনও শুভাগমন হয় নাই। এ দিকে উকিল, মোক্তার, আমলা, পিয়াদা, মামলাকারে কাছারী গম্ গম্ করিতেছে। জগন্নাথের স্নানের ন্যায় সকলেই উৎসুক চিত্তে বিচারকের আগমন প্রতীক্ষায় আছে। এমন সময় ঘোটকারোহণে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উপস্থিত হইলেন। মস্তক হইতে সোলার টুপি নামাইয়া আসনে উপবেশন করিলেন। একবার এ পুস্তক, একবার

ও কাগজ, কখন বাক্স, কখন ঘড়ি, কখন কলম নাড়িতে বেলা দুইটা হইল। অন্যায় স্থানে কাগজ দস্তখত হইয়াছে, আমলার দেখাইবার ক্রটী, এজন্য প্রভুর রাগের পরিসীমা নাই। হুজুরের সাত খুন মাপ। কে বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারে? দর্শকবৃন্দ প্রভুর কার্য্য দর্শন করিয়া, তাঁহার বিদ্যার, তাঁহার ক্ষমতার, তাঁহার জন্মের, চম্মের ও কপালের কতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। উকিলেরা বলেন, হাকিমের অন্তর ভাল, কিন্তু বাহ্য প্রকৃতি বড়ই কঠোর।

মোকদ্দমার শুনানী হইয়া গিয়াছে। সাক্ষীর সাক্ষ্য ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উকিলের বক্তৃতা ও শেষ হইয়াছে। এখন হুকুম মাত্র অবশিষ্ট আছে। উকিল আসামীর অবস্থার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন,—'যে ব্যক্তি দশ লক্ষ টাকার ব্যবসা করে, বুদ্ধিবলে যে ব্যক্তি বিলাতী ব্যবসায়ীদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও নিজের ক্ষমতার উপর দাঁড়াইয়া আছে, সে কি সাধারণ তস্করের ন্যায় এক ব্যক্তির ভবনে রাত্রিযোগে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণাভরণ চুরি করিবে? অলঙ্কার দিয়া পুলীশ সামান্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করিয়াছে। পুলীশ কি পদার্থ, ধর্ম্মাবতার তাহা অনেক মোকদ্দমায় জানিয়াছেন। বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।"

ধর্ম্মাবতার তিন পঙ্‌ক্তি লিখিয়া কেশবশঙ্করের বিচার শেষ করিলেন। তিনি চোর অবধারিত না করিয়া, কেবল রাত্রিকালে পরবাস ভবনে অন্যায় ও অনুমতি ভিন্ন প্রবেশ করিবার জন্য শতমুদ্রা অর্থদণ্ড ও তিন মাস কারাবাসের আদেশ দিলেন।

দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া নরেন্দ্রলালবাবু কতিপয় মুহূর্ত্ত স্পন্দহীন হইলেন। পরে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। ঘর্ম্মবিন্দু বাহির হইতে লাগিল। অজ্ঞাতসারে হরিনামের মালা পদতলে পড়িয়া গেল।

কেশবশঙ্কর কারাগারের নাম শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। মন এত চঞ্চল হইল যে, দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। এই সময় একজন রক্ষক তাহাকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া গেল।

সংজ্ঞালাভ করিয়া নরেন্দ্রবাবু পুত্রের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন। ভাবিলেন,—কি একেবারে দুই পুত্র হীন হইলাম! কলঙ্কে নিষ্কলঙ্ক বংশ কলুষিত হইল! তবে আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? চিরদিন ঈশ্বরের সাধনা করিয়া শেষে অদৃষ্টে এই ছিল? উন্মাদিনী শঙ্করীকে কি সংবাদ দিব? এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি রাস্তায় বাহির হইলেন। হরিনামের মালা ভূমে পড়িয়া রহিল; কুড়াইয়া লইতে মনে হইল না।

সম্মুখে কৃষ্ণা রজনী দিক্ আঁধার করিয়াছে। অন্ধকারময় নিভৃত কারাগারে একটী ক্ষুদ্র প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। একপার্শ্বে লৌহ থালে মোটা তণ্ডুলের অন্ন ও মৃণ্ময় ভাণ্ডে জল আছে। অপর পার্শ্বে মৃত্তিকার উপর এক কম্বল শয্যা বিস্তৃত আছে। কেশবশঙ্কর ক্ষুদ্র জাঙ্গিয়া মাত্র পরিধান করিয়া কম্বলে উপবিষ্ট। দুই হস্ত দুই কপালে আছে। অবিশ্রান্ত চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। কখন কখন ক্রোধে অভিভূত হইয়া, বিধাতাকে তিরস্কার করিতেছে, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইতেছে। গত জীবনের রাশি রাশি পাপের কথা স্মরণ হইতেছে। অর্দ্ধেক রজনী এই ভাবে অতিবাহিত হইল। যখন একটু নিদ্রার আবেশ হইল, তখন এক স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বপ্নে দেখিল, একজন সুন্দরী কামিনী অনাথিনীর ন্যায় ভয়ানক চীৎকার করিতেছে, পার্শ্বে রক্তরঞ্জিত মৃত পতি শয়ন করিয়া

আছে। কামিনী কহিতেছে,—"কেশব, কি সর্ব্বনাশ করিলে? আমি কোথায় যাইব? আমার সর্ব্বস্ব ধন বিনষ্ট করিয়াছ? আজ হইতে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব। আজ আমি অসহায়া হ'লেম। কেশব এ আগুন কেন জ্বালিলে? কাল আমার আদরের শেষ ছিল না, কিন্তু আজ আমায় কেহ সম্ভাষণ করিতেছে না। তবে এ প্রাণে কি হইবে? তুমি পতিহত্যা করিয়া, আমার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিবে মনস্থ করিয়াছ?—আচ্ছা—তবে দেখ"—বলিয়া পাগলিনী তীক্ষ্ণ তরবারি নিজ কণ্ঠ-দেশে প্রদান করিল। ছিন্ন মুণ্ড স্বামীর বক্ষে পড়িল। মৃত স্বামীর মুখ হাসিয়া উঠিল। রক্তের স্রোতে কেশবের মুখ যেন ভাসিয়া গেল। নূতন বন্দি চীৎকার করিয়া উঠিল। নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘন অন্ধকার ভেদ করিয়া মৃত স্বামীর দশন পঙ্‌ক্তি প্রকাশ পাইল। বন্দি অস্থির হইল। উঠিয়া পদচারি করিতে লাগিল।

দুই ঘণ্টা পরে, পুনরায় দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া উপবেশন করিল। নয়ন নিমীলিত হইল। নিদ্রার আবেশ হইল। অমনি এক অভিনব দৃশ্য কল্পনার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সম্মুখে অন্ধকারময় কূপ। সেই কূপে রূপলাবণ্যসম্পন্না যুবতী স্ত্রী মৃতা পড়িয়া রহিয়াছে। আর সে পূর্ব্বের রূপ নাই, সে মুখশ্রী নাই, কেশগুচ্ছের পারিপাট্য নাই। মাংস পচিয়া গিয়াছে, চর্ম্ম বিগলিত, স্থানে স্থানে মাংস আছে, স্থানে স্থানে শুভ্র অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ কূপ হইতে উলঙ্গিনী পেত্নী উত্থিত হইল। হস্তদ্বারা কেশবকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। গলিত মাংসখণ্ডে তাহার সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ হইল। দুর্গন্ধে শ্বাস বন্ধ হইল। রক্ত ও পূঁযের গন্ধে বমন উঠিল। দুঃখের উপর দুঃখ, পেত্নীর মুখ চুম্বন কালে, কৃমি বহির্গত হইয়া কেশবকে দংশন করিতে লাগিল। পিশাচী বিকট চক্ষু মেলিয়া কহিল,—"কেশব, আমি তোমার সেই প্রণয়িনী উপস্থিত

হইয়াছি, তুমি না আমার সর্ব্বনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, আমার কুটীরের দ্বারে, অন্ধকারে ভ্রমণ করিতে? আমি অভাগিনী বিধবা, তখন ধর্ম্মভয়ে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হই নাই, এখন তোমাকে বরণ করিলাম। এই বলিয়া ঘন ঘন চুম্বন দিতে আরম্ভ করিল। দুই হস্তে দৃঢ়রূপে তাহাকে বেষ্টন করিল। পূঁয, রক্ত ও কীটে তাহার মুখ ভরিয়া গেল। গলিত চর্ম্মে নাসারন্ধ্র বুজিয়া গেল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কেশব জাগরিত হইল। চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। উভয় হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখিল,—সম্মুখে কিছুই নাই। মুখ মুছিয়া ফেলিল। বিস্মিত হইয়া কহিল,—"এ কি স্বপ্ন—না যথার্থ? ঐযে রাক্ষসী অন্ধকারে এখনও বসিয়া আছে? ঐযে গলিত মাংসখণ্ড শুভ্র অস্থির সহিত মিশিয়া কেমন ভয়ানক দেখাইতেছে? কি সর্ব্বনাশ! কতকাল এইরূপ স্বপ্ন দেখিব? আঃ—মরণই মঙ্গল। মৃত্যু তুমিই প্রার্থনীয়। এস, একবার অভাগাকে আলিঙ্গন কর—বিনোদিনী তুমি কাঙ্গালিনী হইলে? আমি জীবিত থাকিতে কখন তোমাকে একদিনও একটি মিষ্ট কথা ব্যবহার করি নাই, এই দুঃখ আমি মরিলেও থাকিবে। এমন কুলাঙ্গার হইয়া আমি জন্মগ্রহণ করিলাম যে, পবিত্র কুলে কালী দিলাম। এ নরক হইতে বাহির হইয়া, আমি কেমন করিয়া লোক সমাজে মুখ দেখাইব? কেমন করিয়া সেই দেবতুল্য পিতা মাতার সম্মুখে বাহির হইব? বিনোদিনী, তুমি আমায় কি মনে করিবে? এ বেশ দেখিলে তুমি ভয়ে পলাইবে,—ঘৃণায় জলে ডুবিবে? কঠিন প্রাণ, এক আঘাতে আজ নির্ম্মূল করিব? এ কলঙ্কের ডালি লইয়া আর সমাজে মুখ দেখাইব না।" এই বলিয়া কম্বলের একপ্রান্ত কড়িকাঠে বাঁধিল, অপর প্রান্ত গলদেশে সংলগ্ন করিয়া ঝুলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় একজন রক্ষী দ্বারোদ্ঘাটন করিল। ঊষার লাল আভায় উলঙ্গ বিকৃত পুরুষ

দেখিয়া সাঙ্কেতিক চীৎকার করিল। দশজন রক্ষক সম্মিলিত হইল। ধীরে ধীরে তাহাকে নামাইল। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কেশব কহিল,—"মরণেও বাধা আছে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—)ঃ*ঃ(—

দুইজনের এক প্রাণ।

রঘুনাথগড় রাজ্যের প্রধান রাজসচিবের নাম রমানাথ রায়। ইনি চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষ মাধবচন্দ্র রাওএর সঙ্গে এই স্থানে আগমন করিয়া রাজ্য স্থাপনের সহায়তা করেন। শিক্ষা, স্বভাব ও চরিত্রের জন্য রাজধানীর ক্ষুদ্র বড় সকল শ্রেণীর লোক তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার বাহ্যাকৃতি যেমন সুন্দর, অন্তরও তেমনই সরল ও বিশুদ্ধ। তাঁহার দোষ কি, তাহা তিনি নিজেই বুঝিতেন না। তবে নির্দ্দোষ মনুষ্য সংসারে বড় বিরল। দোষের মধ্যে আশু বিশ্বাসী ও আপনার ন্যায় সকলকে সরল ও বিশুদ্ধ ভাবিতেন রমানাথের স্ত্রীর নাম ব্রজসুন্দরী। যৌবনকালে তিনি অতিশয় রূপবতী ছিলেন। এখনও তাঁহার মুখমণ্ডলে সেই রূপ প্রতিভাত হইতেছিল। তিনি যেমন সৌন্দর্য্যে ভাগ্যবতী ছিলেন, সেইরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা ছিলেন। প্রতি কথায় মধু ঢালিতেন। স্বামীর সহিত কোন বিষয়ে তাঁহার জীবনে মতান্তর বা মনান্তর হয় নাই। রমানাথ বাবুর সংসারের ন্যায় সুখের সংসার শীঘ্র কোথাও দেখা যায় না। প্রকৃত সুখী প্রকৃত পক্ষে জগতে কোথাও নাই; এই জন্য এমন সুখের সংসারে একটীও পুত্র নাই। রমানাথের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পাচ বৎসর পরে একটী কন্যা হয়। তাঁহার নাম শরৎসুন্দরী। তিনিই এখন রমানাথ ও ব্রজ-

সুন্দরীর সমুদয় স্নেহ ও ভালবাসা অধিকার করিয়াছেন। সমগ্র রাজধানীতে শরতের ন্যায় সুন্দরী যুবতী দেখিতে পাইবে না। সপ্তমীর চন্দ্রের ন্যায় সেই শুভ্র সমুজ্জ্বল ললাট, প্রফুল্ল নীলোৎপল সদৃশ নয়নযুগল, সুন্দর নাসিকা, অরুণোষ্ঠ, কুন্দদন্ত, চম্পকনিন্দিত সুবর্ণবর্ণ, সুঠাম সুকোমল ভুজবল্লরী দেখিলে, কে না পুনঃ পুনঃ দেখিবার জন্য নয়ন ফিরাইবে? শরৎ পূর্ণযৌবনে পতিতা হইয়াছেন। অঙ্গ সকল যৌবন রাগে রঞ্জিত হইয়াছে। উন্নত পয়োধরযুগল দিন দিন তুঙ্গ হইয়া উঠিতেছে। এখন তাঁহার গমনক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। মাতার ন্যায় শরৎসুন্দরী মধুরভাষিণী। পিতা ও মাতা তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিলেন। তাঁহাদের সেবা ও চরিতার্থতা সম্পাদন ভিন্ন, তাঁহার অন্য কোন কর্ম্ম ছিল না। তাঁহার গুণের সংখ্যা ছিল না। রূঢ় বা গর্ব্বিত বচন ব্যবহার করা তাঁহার স্বভাবের একেবারে বিরুদ্ধ ছিল। তিনি যেমন লজ্জার প্রতিমা, সেইরূপ সরলতার আদর্শস্বরূপিণী ছিলেন। দোষের মধ্যে বড় অভিমানিনী। কেহ কিছু কহিলে, প্রতিকূলে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, একেবারে নম্রমুখী হইতেন। বিশাল নয়ন দুটী আরক্তিম হইয়া শেষে বিন্দু বিন্দু জল বিসর্জ্জন করিত। তাঁ[illegible] মানসিক শক্তি কিছুমাত্র ছিল না। সহিষ্ণুতার লেশ ছিল না। [illegible] জন্য কোন বিপদে পড়িলে, তাঁহার দুঃখের অবধি থাকিত না। [illegible] কাল উপস্থিত হইলেও তিনি অবিবাহিতা ছিলেন। তৎ[illegible] বংশীয়েরা এক সূর্য্যবংশীয়দিগকে কন্যাদান করিতেন। সু[illegible] তিনি বিবাহ দিয়া উঠিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ এ[illegible] বাল্যবিবাহ প্রায় উঠিয়া যাইতেছিল।

এই সুখের সংসারে রতিকান্ত প্রবেশ ক[illegible] ও অবয়বে রমানাথ ও ব্রজসুন্দরী মোহিত

রমানাথ গোপনে স্ত্রীকে কহিলেন,—"রতিকান্ত সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, কি কারণে মনে বৈরাগ্য হইয়াছে, তাই বাটীর বাহির হইয়াছেন, তাঁহাকে বেশ করিয়া যত্ন করিও—শেষে শরৎকে তাঁহারই হাতে সমর্পণ করিব।" রতিকান্তের ন্যায় অমন সুশীল ও সুপুরুষ শরতের স্বামী হইবেন শুনিয়া, ব্রজসুন্দরীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেইদিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে বাৎসল্যের স্রোত বহিল। তিনি এমন যত্ন ও তাঁহার সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, প্রকৃত পক্ষে রতিকান্ত যেন তাঁহার জামাতা হইয়াছেন।

জগতে স্ত্রী পুরুষের মিলন যেমন সুন্দর, নূতনত্ব ও লজ্জার মিলনও সেইরূপ চমৎকার। যেখানে নূতনত্ব, সেইখানে লজ্জা। শরৎ সুন্দরী দুই চারি দিন রতিকান্তের সম্মুখে বাহির হইতে সাহস করিলেন না। অথচ যুবককে দেখিয়া তাঁহার কেমন মনে লাগিয়াছে যে, যতবারই সেই সুন্দর সুঠাম মুখখানি দেখেন, ততবারই দেখিবার জন্য মন কেমন চঞ্চল হইয়া উঠে। মনে মনে লজ্জাকে শত ধিক্কার দিতেছেন, আর ভাবিতেছেন কেমন করিয়া মন খুলিয়া, এক সঙ্গে দুজনে বসিয়া কথা [illegible]হিব। কাপট্য কাহাকে বলে, তাহা শরৎসুন্দরী এতদিন জানি- না। এখন এই লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মনোভাব গোপন শিখিলেন। লজ্জা ও কাপট্য প্রায় সমান কথা। নতুবা [illegible]ধা থাকিতে জামাতা বাবাজী কেন শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে হাত [illegible]ন যে, আমার আর ক্ষুধা নাই, আমি আর কিছুই খাইতে

[illegible]র রমানাথবাবু বুঝিলেন, রতিকান্ত কেবল বুদ্ধিমান, [illegible] পুরুষ নহেন, তিনি অত্যন্ত কর্ম্মপটু ও শ্রমশীল। [illegible] (Inspector of agriculture) কিছু

দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলে, রমানাথবাবু তাঁহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ঘোটকারোহণে ও এক ঘোড়সোয়ার সঙ্গে লইয়া তিনি সময়ে সময়ে গ্রামে গ্রামে পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

রতিকান্ত যখন বাটীর ভিতর আসিতেন, তখন তিনি প্রায় মুখ তুলিতেন না। এই জন্য দুই চারি দিন, সেই স্বর্ণকমল তাঁহার চক্ষে পতিত হয় নাই। কিন্তু যে দিন প্রথম সেই স্নিগ্ধ, সুন্দর, বাসন্তীপূর্ণিমার কৌমুদীময় লাবণ্য তাঁহার চক্ষে পতিত হইল, সেই দিন রতিকান্তের সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। চক্ষু উন্মিষিত রহিল,—অন্যদিকে নয়ন ফিরাইবার ক্ষমতা লোপ পাইল। দৃষ্টি সেই স্থিরা-বিদ্যুল্লতার দিকে আবদ্ধ রহিল। ক্ষণকাল আত্মবিহ্বল হইলেন। যখন জ্ঞান সংযোগ হইল, তখন দেখিলেন,—শূন্য আকাশ নীল নভোমণ্ডলের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার গৈরিকবর্ণ পশ্চিমদিক্ আরক্তবর্ণ করিয়াছে। যেন প্রকৃতি লজ্জায় অভিভূত হইয়াছেন। আজ রতিকান্তের নির্ম্মল, স্রোতহীন হৃদয়সরোবরে ধীরে ধীরে প্রবাহ বহিল। এতদিন সংসারে আসক্তি ছিল না;—এতদিন সংসারে প্রিয় বস্তুর অন্বেষণ করিয়া বিফল হইয়াছিলেন;—এতদিন তাঁহার জীবন ভার বোধ হইয়াছিল। বি[illegible] আজ এক নিমেষে, কেমন ধীরে ধীরে মনের পরিবর্ত্তন হইল; [illegible] সর্ব্বশরীর উত্তেজিত হইল, মন নাচিয়া উঠিল, হৃদয় ফুলিয়া উঠি[illegible] বুঝিলেন, জীবনে সুখের বস্তু আছে। সুখের বস্তু কি, যেমন [illegible] হইল, অমনি শরৎসুন্দরীকে পুনরায় দেখিবার ইচ্ছা হইল। [illegible] জগতে কাহার ইচ্ছা উঠিতে উঠিতে পূর্ণ হইয়াছে? সকল[illegible] করিতে হয়। যে অপেক্ষা করিতে পারে, সেই ধীর; [illegible] সে অধীর। যুবক চিরকালই অধীর, সুতরাং রতিকা[illegible] হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হই[illegible]

বেশন করিলেন। চিন্তার স্রোত চারিদিক হইতে বহিল, কিন্তু সকল স্রোত সেই এক স্থানে মিশিল। ভাবিলেন,—দেখিব? দেখিবার উদ্দেশ্য কি? শরৎ কে? তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ কি? তাহার নাম মনে উঠিলে কেন আমার হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠে? কেন শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে আঘাত হয়? এক মুহূর্ত্তে রাশি রাশি প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু একটীরও উত্তর দিতে পারিলেন না। মন উত্তরের অপেক্ষা করিল না, প্রশ্নের অর্থ বুঝিল না, কার্য্য ও কারণ দেখিল না, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিল না, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ফল দেখিল না; একেবারে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইল। পাঠক! এই ব্যগ্রতার নামই অধৈর্য্য। এই অধৈর্য্য একদণ্ড বিচ্ছেদকে এক যুগ করে। ইহাই প্রণয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ।

পরদিন তিনি একবার, দুইবার, তিনবার দেখিলেন, কিন্তু শিশুর চন্দ্রদর্শনের ন্যায় সাধ মিটিল না। কোথায় ছিলেন, কোথায় যাইতে-ছেন, সে বিবেচনা অধৈর্য্যের সহিত লোপ পাইল। মোহ আসিয়া দুই চক্ষু আবৃত করিল। দেখিয়া তাঁহার আশা পরিতৃপ্ত হইল না;—ই মুখ হইতে একটী কথা শুনিতে বাসনা হইল। শরতের প্রথম ণ, রতিকান্তের কর্ণে অমৃতবর্ষণ করিল। সে মধুর স্বর বীণাধ্বনি মিষ্ট বোধ হইল; গোমুখী নিঃসৃত গঙ্গাজলের ঝির্ ঝির্ শব্দ সুমধুর মনে হইল। তিনি উন্মত্ত হইলেন। প্রণয়সিন্ধুর লে মন ভাসাইয়া দিলেন। ঝটিকায় বিঘূর্ণিত, অন্ধকারে অবশেষে স্রোতে তাড়িত হইয়া ভাসিয়া চলিলেন। এত পনার মন পরের হইয়া গেল। প্রণয়ের অধৈর্য্য, ণনে অতৃপ্ত, সংসারে গাঢ় আসক্তি কেমন অলক্ষিত নল।

দিন দিন প্রণয়ের উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। লজ্জা আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? তখন একস্থানে উপবেশন করিয়া পরস্পরে অসঙ্কুচিত চিত্তে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। ব্রজসুন্দরী দেখিয়াও দৃক্‌পাত করিতেন না; যেন দেখিতে পাইতেছেন না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই আলাপে তাঁহার সুখ ভিন্ন দুঃখ ছিল না। অনতিবিলম্বে শরৎ ও রতিকান্তের প্রণয় ঘনীভূত হইয়া আসিল।

একদিন কাছারী হইতে রতিকান্ত বাটী প্রত্যাগত হইয়া শরতের অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছেন না। মনে মনে নানা প্রকার কল্পনা করিতেছেন। কখন ভাবিতেছেন,—আজ শরতের এ ভাব কেন? অন্য দিন আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকেন, এক মুখ হাসি হাসিয়া অমৃতলহরী উত্থিত করেন, কত সুখের সংবাদ দিয়া মন মাতাইয়া তোলেন? আজ কেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতেছি? আজ কি হইল? তিনি উঠিলেন, একে একে সকল কক্ষে, উদ্যানে, প্রতি বৃক্ষ অন্তরালে লতাবিতানে অন্বেষণ করিয়া কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"তবে কি শরৎ আমাকে না বলিয়া স্থানান্তরে গিয়াছেন?" এ সংবাদ কাহাকে কি উপলক্ষে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই কতক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে কি মনে হইল, একবার রন্ধনশালায় গমন করিয়া দেখেন,—শরৎসুন্দরী মাতার নিকট উপবেশন করিয়া রন্ধনকার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। চারিচক্ষু এক হইবামাত্র, তিনি লজ্জাভিভূতা ও নিস্পন্দপ্রায় হইলেন। বিশাল নয়নযুগল ভূতলশায়ী হইল। কোন প্রকারে তাঁহার দিকে চক্ষু উঠিল না। এ অভিমান রতিকান্তের রাখিবার স্থান হইল না। তিনি নিমীলিত নেত্রে বিষণ্ণ বদনে ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বকক্ষে প্রতিনিবৃত্ত

হইলেন। শয্যায় শয়ন করিয়া ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পশ্চিমদিক্ লাল। যাহাতে সেই আভা পড়িতেছে, তাহাই লাল হইয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি মধুময়। শরৎসুন্দরী অনেকক্ষণ অগ্নির উত্তাপে ও ধূমে ক্লিষ্টা হইয়াছিলেন। মুখ ও চক্ষু লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ঘর্ম্মবিন্দু মুক্তাকারে পড়িতেছিল। তিনি শ্রান্তি দূর করিবার জন্য উপবনে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় কোন ভাবুক তাঁহাকে দেখিলে মহা বিভ্রাটে পড়িতেন ; প্রকৃতি সুন্দরী, না শরৎ-সুন্দরী ইহা স্থির করিতে তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিয়া যাইত। রতিকান্ত চিন্তায় বিহ্বল ছিলেন, সুতরাং সে সৌন্দর্য্য দেখিতে তাঁহার অবকাশ ছিল না। শরৎ কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, দৃষ্টি এক দিকে আছে হৃদয়ে কেমন একটু শঙ্কার ভাব রহিয়াছে। পত্রের মর্ম্মর শব্দ, কি কাহারও পদশব্দ কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র রতিকান্ত আসিতেছেন মনে হয়। মনে হইলেই সুখ ও লজ্জা মধুর তানে মিশাইয়া তাঁহার মনকে কেমন উল্লা-সিত করিয়া তোলে। কতক্ষণ তিনি আবোল তাবোল চিন্তা করিয়া সচকিতে চতুর্দ্দিক চাহিয়া কহিলেন,—"আজ আমি কি হইয়াছি, নতুবা কারণ না থাকা সত্ত্বেও হৃদয় কেন চমকিয়া উঠিতেছে?" একটু পরে স্বকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একটী একটী দিন, একটী একটী লৌহ কীলক রতিকান্তের হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া চলিতে লাগিল। এক দুই তিন করিতে করিতে এক সপ্তাহ চলিয়া গেল। শরতের সেই ভাব। রতিকান্তকে দেখিলেই চক্ষু ভূমিতে নামে, অথচ চলিয়া গেলে তাঁহার পশ্চাদ্দেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক, উদাসমনে ভাবিতে থাকেন। একদিন যুবক বিচ্ছেদের দারুণ যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া ভাবিতেছেন, শরতের একি অনৈসর্গিক ভাব

উপস্থিত। এ ভাবের অর্থ কি? একি লজ্জা? এত দিনের পরে লজ্জা কোথা হইতে উথলিয়া উঠিল? একি অভিমান? আমার ত্রুটী কোথায়? তবে কি বিরক্তি? কিন্তু আমার অপরাধ কি? আজ যাহা হয় হইবে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। এমন করিয়া দিন রাত্রি অবিশ্রান্ত চিন্তা করিতে পারি না। তিনি এই স্থির করত সময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

সময় সন্ধ্যা। মল্লিকা নবমুকুলিত কুসুমে সুশোভিত হইয়া, মাথা নাড়িয়া সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার করিতেছে। ফুরফুরে বাতাস কুসুমসৌগন্ধ চুরি করিয়া, দানে পাপক্ষয় এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করিতেছে। এমন সময় শরৎসুন্দরী কুসুম আহরণ করিবার জন্য মল্লিকার শাখা ধরিলেন; অনুরাগে যেন মল্লিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সময় পাইয়া রতিকান্ত অলক্ষিতরূপে শরতের পশ্চাতে দাঁড়াইলেন। তিনি ফুল তুলিতেছেন আর বলিতেছেন,—"এ সংসারে মিলনই সুখ; এই ফুল গুলি মল্লিকার কেমন শোভা করিয়াছিল, কিন্তু যাই আমি তাহাদিগকে তুলিলাম, অমনি গাছগুলি একেবারে বিশ্রী হইয়া গেল। পোড়া লজ্জাই আমার কাল হইল। এ লজ্জা আমি কেমন করিয়া দূর করিব?" এই সময় রতিকান্ত কহিলেন,—"শরৎ, আজ লজ্জার দর্প চূর্ণ করিব? যথার্থ একি লজ্জা, না রাগ? আমার কি কোন অপরাধ হইয়াছে?

শরৎ। (সলজ্জভাবে) অপরাধ! অপরাধ হইলে আমার হইয়াছে।

রতি। তোমার আবার অপরাধ?

শরৎ। লজ্জাই আমার অপরাধ।

রতি। এ লজ্জা কোথা হইতে আসিল?

শরৎ। সে বড় বিষম কথা।—বৈশাখের পরিষ্কার আকাশে কোথা হইতে মেঘ আসে, তা আমি কেমন করিয়া বলিব?

রতি। শরৎ, আমাকে ছলনা করিতেছ ? তুমি কি কালমেঘের উৎপত্তি কোথায়, তাহা জান না ?—কথা কহিতেছ না যে ? আমাকে দুঃখ দেওয়া কি তবে তোমার অভিপ্রায় ? আমি এখন তোমার ভার হইয়াছি ; আমার ছায়া কি তোমার কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে ?

শরৎ। আমি কি তাহা বলিয়াছি ?

রতি। মুখে না বলিয়াও ত ইঙ্গিত করিতে পারা যায়।

শরৎ। আমিত কোন ইঙ্গিত করি নাই।

রতি। আমি তোমাদের বাড়ীতে আগন্তুক ; প্রথমে সম্ভাষণ ও আলাপ করিয়া, যদি পরে সেরূপ যত্ন ও আগ্রহ না দেখাও, তাহা হইলে ইঙ্গিতে কি রাগ দেখান হয় না ?

শরৎ। এ ত আমার রাগ নয়—এ আমার লজ্জা। আমি কেমন করিয়া তোমাকে সে কথা বলিব ?

রতি। কথা কি এত গুরুতর যে, হৃদয়ে থাকিয়া মুখে বাহির হয় না ? তবে কি তোমার হৃদয় ও মুখ এক নয় ?

শরৎ। আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি,—সে স্বপ্নের কথা।

রতি। তবে বলনা ? তবে আর ভয় কি ?

শরৎ। স্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার কেমন আতঙ্ক হইয়াছে !

রতি। স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র, তাহা কি তুমি জান না ? স্বপ্নের কোন্ কথা সত্য হয় ? স্বপ্ন কখনও বিশ্বাস করিও না।

শরৎসুন্দরী সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "স্বপ্ন অমূলক চিন্তা মাত্র ! স্বপ্নের কোন কথা সত্য হয় না ! স্বপ্ন বিশ্বাস করিব না ! হায় ! তবে কেন স্বপ্ন দেখিলাম ?" তাঁহার চক্ষে জল আসিল, ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল।

রতি। শরৎ, বিষয় কি জানিতে আমি বড় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি।

নাড়ী না দেখিয়া, আমি কেমন করিয়া রোগ নির্ণয় করিব? তুমি স্বপ্ন বল, পরে আমি পরামর্শ দিব। আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না?

শরৎ। বল্‌ব-কি করি, বলি—আজ আমার যন্ত্রণার বিরাম হউক। সেদিন তুমি কাছারী চলিয়া গেলে, আমি ভূমিতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া রহিলাম। একটু পরেই নিদ্রিত হইলাম। স্বপ্ন দেখি, যেন মা আমায় সস্নেহে আহ্বান করিয়া বলিলেন, শরৎ আজ তোর বিবাহ হইবে। আমি যেন ব্যস্ত হইয়া ভয়ে ভয়ে মার নিকট যাইলাম। দেখি,—যে যাঁহাকে প্রাণের প্রাণ ভাবিয়া এতদিন আকণ্ঠ হৃদয়ে ভাল বাসিয়াছি, সেই হৃদয়নাথ বিবাহ করিবার জন্য যেন আমার অপেক্ষা করিতেছেন। সুখে ভাসিয়া গেলাম। ভাবে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, কিন্তু যখন হাতে হাত দিতে যাই, তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

'প্রাণের প্রাণ' এই কথাগুলি তীক্ষ্ণ সূচাগ্রের ন্যায় রতিকান্তের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। ভাবিলেন,—সে হৃদয়বন্ধু কে? একটু কুণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"শরৎ, কে তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল?" তিনি এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি, লজ্জায় একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর স্থির রহিল, কেশাগ্রও নড়িতে পারিল না। রতি পুনরায় কহিলেন,—"গোপেন্দ্র কি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল?"

শরৎ। আমি কি তাহাকে ভালবাসি—না তাহার সঙ্গে কথা কহি?

রতি। তবে কি ব্রজেন্দ্র?

শরৎ। এই কি তোমার বিচারে স্থির হইল?

রতি। তবে কে? সে এখন কোথায়?

শরৎ। তিনি সকল স্থানে আছেন!

রতি। সে কি তোমার সম্মুখে ?

ঈষৎ কটাক্ষ এই প্রশ্নের উত্তর দিল।

রতি আহ্লাদে ভগ্নকণ্ঠ হইয়া কহিলেন,—"তবে কি আমিই তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম ? আমি কি এত পুণ্য করিয়াছি ? তবে একবার মুখ তোল, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমাকে দেখি।" এই বলিয়া অবগুণ্ঠন মুক্ত করিলেন। সন্ধ্যার কাদম্বিনার ন্যায় শরতের গণ্ডযুগল লাল, মুখ হইতে অপূর্ব্ব শ্রী বিনির্গত হইতেছিল, বিশাল বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে পবিত্র, স্নিগ্ধ সুধাময় জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছিল। কি অনুপম সৌন্দর্য্য ! কি মনোহর লাবণ্য ! কি স্বর্গীয় ভাব ! রতিকান্ত আত্মবিস্মৃতের ন্যায় কতক্ষণ অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন ভাবিলেন, একি স্বপ্ন ? এই কি স্বর্গ ? এই কি প্রণয় ? এই অসার দুঃখময় পাপপূর্ণ পৃথিবীতেও কি এমন পবিত্র সুখ রহিয়াছে ? এই সংসার-পরিত্যক্ত পিতৃমাতৃহীন অভাগার জন্যও ঈশ্বর সুখের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন ?" মন্দিরে তাঁহার সহিত দেবমূর্ত্তির যে কথা হইয়াছিল, দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল। মূর্ত্তি বলিয়াছিলেন,—আমার রাজ্যে বালক ! অধর্ম্মের প্রভাব ? আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া তিনি বাহুযুগলে শরৎকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন ; হস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"এ অভাগা আজ হইতে তোমার সেবার জন্য নিযুক্ত হইল,—আজ তাহার জীবনের লক্ষ্য স্থির হইল—আজ অন্ধকারময় পৃথিবীতে তপনের কিরণ প্রবেশ করিয়া তাহার হৃদ্‌পদ্ম প্রস্ফুটিত করিল।

শরৎ। কান্ত ! সে কি কথা ? কোন্ হিন্দুর গৃহলক্ষ্মী সেবার জন্য পতিকে নিযুক্ত করে ? আজ হইতে আমিই তোমার সেবার জন্য নিযুক্ত হইলাম। তুমি শ্রান্ত হইলে আমিই সেবা করিব।

রতি। শরৎ, যাহাকে দেখিলেই সকল শ্রান্তি দূর হয়, যাহার

কথা শুনিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, যাহার কোমল স্পর্শে যন্ত্রণা অপহৃত হয়, সে আবার কি সেবা করিবে? আজ হইতে তোমাকে আমার কণ্ঠহার করিলাম;—আজ হইতে দুই জনের একপ্রাণ হইল।

এই সময় ব্রজসুন্দরী শরতের নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তাঁহারা উভয়ে যেন চকিত, ভীত হইয়া উঠিয়া গেলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মেঘমুক্ত সূর্য্য

শরৎসুন্দরী রতিকান্তকে 'কান্ত' বলিয়া আহ্বান করিতেন। তাঁহার পিতৃস্বসার নাম রতিসুন্দরী, সুতরাং নাম ধরিয়া ডাকা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কান্তের ধাতু প্রত্যয় যদি ভাবিয়া দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ করি, শরৎ অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহাকে কান্ত বলিয়া ডাকিতে সাহস করিতেন না। একদিন রমানাথ, ব্রজসুন্দরী ও শরৎ মিলিত হইয়া নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময় ব্রজসুন্দরী স্বামীকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"দেখিয়াছ, রতির মা বাপ কি নিষ্ঠুর,—কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া এমন পুত্রকে বিদায় দিয়াছে।"

রমা। নিশ্চয়ই ভিতরে রহস্য আছে? আমি এতদিন ব্যস্ততা প্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিতে সাবকাশ পাই নাই।

ব্রজ। রতি যেরূপ সৎ ও সুবোধ, তাহাতে যে, সে কোন মন্দ কর্ম্ম করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে, এমন বোধ হয় না।

রমা। ভিতরে কিছু আছে?

পিতার মন্তব্য শুনিয়া শরৎসুন্দরী একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, এই জন্য আর নিরুত্তর থাকিতে না পারিয়া সলজ্জ ও সঙ্কুচিত ভাবে পিতা মাতাকে রতিকান্ত সম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা বর্ণনা করিলেন। তিনি বিশ্বাস করিয়া সরল চিত্তে নিজের জীবনের যে পরিচয় শরৎকে দিয়াছিলেন,

আজ তিনি ভবিষ্যতের ফলের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিয়া ফেলিলেন। কে জানিত, এই কথায় সূর্য্য মেঘমুক্ত হইয়া কুমুদিনীর সংহার করিবে? কে জানিত, একখানি শিলা পতনে অদৃষ্ট-স্রোতের গতি ফিরিবে? কে জানিত, ক্ষুদ্র আঘাতে বিশাল রসালাশ্রিতা হেমলতা ভূমে গড়াগড়ি দিবে? রমানাথ নির্ব্বাক! কতক্ষণ মুখে কথা সরিল না। আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—"দশ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া জগন্নাথ যাইতেছিলেন, তাহাই কি হইবে? অসম্ভব—সম্ভব অসম্ভব বলিয়া কি কোন বস্তু এ পৃথিবীতে আছে? মহারাণীর সহিত মুখের গঠন এক—কি আশ্চর্য্য! ব্রজসুন্দরী বলিলেন,—"তুমি আপনাপনি দেখি প্রশ্ন তুলিতেছ, আর আপনাপনি নিষ্পত্তি করিতেছ—একটু ভাল করিয়া বল, আমরা শুনি।

রমা। বল দেখি, রতিকান্তের মুখের সহিত, মহারাণীর মুখের সাদৃশ্য আছে কি না?

ব্রজ। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া সহাস্যে) হাঁ-চক্ষে এক ভাব, চাহনি এক প্রকার, দাড়ির গঠন এক, কাণ দুখানি দুজনেরই ছোট— হাঁ, মুখখানি ঠিক মহারাণীর মতন।

রমা। আমার বোধ হয় রতিকান্ত মহারাণীর হারান পুত্র।

ব্রজ। কেমন করিয়া বুঝিলে?

রমা। জলেশ্বরের নিকটস্থ বনেই তিনি পুত্রত্যাগ করেন। আমি রাজবাটী চলিলাম; মহারাণীকে সংবাদ দিই।

এই বলিয়া রমানাথ ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

শরৎসুন্দরী প্রথমে বিস্মিত হইলেন। রতিকান্ত রাজপুত্র হইবেন শুনিয়া, আহ্লাদের সীমা রহিল না। কতক্ষণ কত ভাবে তাঁহার মূর্ত্তি চিন্তা করিলেন। ভাবিলেন,—সংসারে ঈশ্বরের প্রেম, ন্যায় ও দয়া অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। তিনি যথাসময়ে

সকলের দিকে দৃষ্টি করেন ও ন্যায়বিচার করিয়া সকলকে যথাস্থানে স্থাপন করেন। রতির ভূত জীবনের সহিত, ভাবী জীবনের তুলনা করিয়া তিনি যার পর নাই উল্লাসিত হইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই মুখ মলিন হইয়া আসিল। উৎসাহ চলিয়া গেল। আহ্লাদের স্রোত বন্ধ হইল। শরীর ভার ও বিষণ্ণ হইল। কে যেন অলক্ষিতরূপে কাণে কাণে কহিয়া গেল, শরৎ সুখের এই অবসান, আশার এই বিনাশ, প্রণয়ের এই শেষ চিত্র। তিনি অনেকক্ষণ বিষণ্ণ বদনে দুঃখের চিন্তা করিতে লাগিলেন। শেষে গর্ব্বের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"কি, আমি এতই স্বার্থপর যে, প্রিয় সুহৃদের সুখেতে দুঃখিত হইব? যায় যাক্ আমার সুখ—দূর হইয়া যাউক, তথাপি আমার 'কান্ত' রাজা হউন। আহা! তাঁহার মত এত কষ্ট রাজকুলে জন্মিয়া কেহ সহ্য করিয়াছে কি, জানি না।"

সন্ধ্যার সময় রতিকান্ত কাছারী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন,—রমানাথ বাবুর বাটীর অবস্থার সমূহ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বহির্ব্বাটীতে দ্বারবানের দল বসিয়া আছে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র নতশির হইল। অন্তঃপুরেও নবাগত দাসীরা হুড়াহুড়ি করিতেছিল, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলে পলকহীন নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। রমানাথ তাঁহার আগমন শ্রবণ করিয়া মহাব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন, এবং নতশির হইয়া বলিলেন,—"আপনিই এই রাজ্যের রাজা, আমার অনেক অপরাধ হইয়াছে, সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। না জানিয়া আপনাকে কত ক্লেশই দিয়াছি।"

রতি বিস্ময়প্রফুল্লমুখে তাঁহার হস্ত চাপিয়া ধরিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আজ এই সকলের তাৎপর্য্য বুঝিতে আমি নিতান্তই অক্ষম, এ সকল যেন অভিনয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে, অথবা আমার

জ্ঞান বুঝি হ্রাস হইয়া আসিতেছে ? এ সকল কি, অনুগ্রহ করিয়া মহাশয় সবিশেষ বলুন।"

রমা। আপনি মহারাজ শশধর রাও বাহাদুরের পুত্র। মহারাজ্ঞী আপনাকে অনিবার্য্য কারণে জলেশ্বরের অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কল্য প্রত্যূষে রাজবাটী গমন করিতে হইবে, এই জন্য এই সকল ভৃত্যেরা আয়োজন করিতে আসিয়াছে।

রতিকান্ত কিছুই বলিলেন না। অধরের হাসি অধরে মিলাইয়া গেল। আকাশে চাহিয়া কহিলেন,—"রৌদ্রের পর বৃষ্টি, বৃষ্টির পর রৌদ্র, এই সংসারের নিয়ম। আমাকে আবর্ত্তনে ফেলিয়া বিধাতা তুমি খেলা করিতেছ, বোধ হয় কপালে আরও বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত আছে, নহিলে ভয়ানক শীত গত না হইতে হইতে, কেন একেবারে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড গগনে উদয় হইবে ?" এই বলিতে বলিতে শরৎসুন্দরীর কক্ষাভ্যন্তরে গমন করিলেন।

শরৎ রতিকান্তের দর্শন মাত্র দুই হাত তুলিয়া 'মহারাজের জয় হউক' বলিলেন।

রতি। তুমিও কি বিধাতার বাজীতে যোগ দিয়া ঠাট্টা আরম্ভ করিবে ?

শর। এ কি বাজী, না ঠাট্টা ? এ যে প্রকৃত কথা।

রতি। প্রণয়িনীর কি এই সাজে ?

শর। এখনও ভোল নাই, আমি বলি সে কথা ভুলিয়াছ ?

রতি। যাহার হৃদয় আছে, যে মানুষ, সে কি জড়ের পরিবর্ত্তনে অন্তরের কথা ভুলিতে পারে ?

শর। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, এক আধারে একই সময়ে দুই বিষয়ের সমাবেশ হয় না। যেখানে প্রেম, সেখানে রাজ্যচিন্তা থাকিতে

পারে না। রামচন্দ্র তাহার সাক্ষী। রাজ্যলোভের জন্য সীতার নির্ব্বাসন হইল। ধন্য প্রেম!

রতি। আমি কি রাম হইলাম? কিন্তু রামের প্রেম অকপট, সরল ও বিশুদ্ধ।

শর। সেই জন্য বুঝি জীবন্ত সীতাকে জ্বলন্ত আগুনে পোড়াইয়া গ্রহণ করেন?

রতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তবে আমি রাম হইব না,—আমি যাহা তাহা আছি, তুমি না আমায় অলঙ্কার দিতেছ?

শর। তা যা হক্,—কাল নিতান্তই যাইবে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য—সুখ ও দুঃখ এক সময়ে উপস্থিত হয়, তাহা এই নূতন দেখিলাম।

রতি। সুখ কি?

শর। এত দিনের পর গৌরমোহন দত্তের মুখে চুণ কালী পড়িল। এত দিন পরে সে বুঝিবে যে, তাহার সেই জাতিনাশা ভৃত্য, এখন রাজরাজেশ্বর। পোড়া বিধাতারও মুখে ছাই যে, তার শিকলী কেটে তুমি সুখের সংসারে প্রবেশ করিলে।

রতি। দুঃখ কি?

সরোবরে নলিনী প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, মনে করিয়াছিল সেই সরোবরে চিরদিন নিষ্কম্প প্রদীপের মত বিরাজ করিবে। এখন প্রবল ঝটিকা উপস্থিত, শেষে মূল অবধি না ছিঁড়িয়া যায়।

রতি। তুমি কি এই পরিবর্ত্তনকে ঝটিকা বিবেচনা কর; আর তাহার এত ক্ষমতা হইবে যে, প্রণয়ের কঠিন মৃণাল ভগ্ন করিবে? এই বিচ্ছেদরূপ মৃদু মৃদু বায়ুহিল্লোলে নলিনী ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া আরও নয়নের প্রীতিকর হইবে, অলি স্থানচ্যুত হইয়া দ্বিগুণ আক্রোশে স্বস্থান অধিকার করিবে। যে নদীতে তরঙ্গ উঠে

না, সে নদী, নদীই নয়। বিচ্ছেদে প্রণয় শিথিল হয় না, বরং দৃঢ় হয়।

এবম্বিধ নানা প্রকার কথোপকথনে অনেক রাত্রি হইল। ক্রমে শরতের আলস্যলক্ষণ প্রকাশ পাইল। রতিকান্ত অলিন্দে উঠিয়া আসিয়া বসিলেন। শরৎ নিদ্রাগত হইলেন। নিম্নে ব্রজসুন্দরী রন্ধনকার্য্যে ব্যস্ত। রাজস্বসচিব মহাশয়ের স্ত্রী আজ একাকিনী হইয়াও দশভুজার ন্যায় অন্নক্ষেত্রে অন্নপূর্ণারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের বধূদিগের ন্যায়, ব্রজসুন্দরী পরিশ্রমকাতরা, শ্বশ্রূর সহিত মল্লযুদ্ধ-ক্ষমা, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ-তৎপরা, স্বার্থসাধন-পরবশা, রন্ধনকার্য্যে সম্যক জ্ঞানহীনা ও গর্ব্বিতা ছিলেন না। গৃহের সকল কার্য্যেই তিনি তৎপরা, বিশেষতঃ তাঁহার প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন লোকে আহার করিবে এবং তিনি স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলের মনস্তুষ্টি করিবেন, এ আহ্লাদ রাখিবার তাঁহার স্থান ছিল না। এখন মেম সাহেবদিগের দেখাদেখি রন্ধনকার্য্য নিতান্ত নীচ ও ঘৃণ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন সকলেই রন্ধনকারী ব্রাহ্মণ রাখিবার জন্য ব্যস্ত। গৃহিণীদের নানা রূপ ব্যারাম হইতে দেখা যাইতেছে ; যথা—স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য, মূর্চ্ছা ও নানা প্রকারের স্ত্রীরোগ। এই সকল ব্যারাম পূর্ব্বে ছিল না—সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। বাঙ্গালীর জীবন কেবল অপদার্থ ব্যবহারগুলির অনুকরণে কাটিয়া গেল। কোথায় গেল ধর্ম্ম, কোথায় গেল স্বার্থত্যাগ, কোথায় গেল স্বজাতিপ্রেম, আর কোথায় গেল দেহের ব্যায়াম সাধন। এখন যেমন জীর্ণ শীর্ণ দেহ, তেমনই নিস্তেজ মন, তেমনই অখাদ্য খাদ্য দ্রব্য, তেমনই নর্থানটনের উপর বিলাসিতা। গড়াইতে গড়াইতে কোথায় যে এই জাতি শেষে দাঁড়াইবে তাহা ,সেই ব্রহ্মাণ্ডদেবই বলিতে পারেন।

রতিকান্তের হৃদয়ে চিন্তার স্রোত খরধারে প্রবাহিত হইতেছিল, এমন সময় শরৎসুন্দরী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন; পরে অতি মধুর ও করুণস্বরে কহিলেন,—"কি হইয়াছে শরৎ?"

শর। কান্ত, আমি জাগরিত! এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি! তবে কি তোমার সহিত এ জীবনে আর দেখা হইবে না? এই কি শেষ দেখা? এই কি জন্মের শোধ আলিঙ্গন দিতেছ?

রতি। (ব্যস্তভাবে) কি হইয়াছে? এই শরীরে যতদিন এক বিন্দু রক্ত বহিবে, তত দিন আমার প্রতিজ্ঞার অন্যথা নাই—ছার রাজ্যলোভ! শরৎ, তুমি কি একেবারে উন্মাদিনী হইয়াছ?

শরৎ। কান্ত, দেখিলাম—তোমাতে আমাতে দূর দেশে পলাইয়া যাইতেছি। অনেক দূর গমন করিবার পর সম্মুখে নদী পাইলাম পার হইবার নৌকা একখানিও ঘাটে নাই। কেবল পরপারে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আছে। তুমি কহিলে, আমি সাঁতার দিয়া পার হই—পরে নৌকা আনিয়া তোমায় পার করিব। আমি সম্মত হইলাম না; কহিলাম—এক মুহূর্ত্তও তোমার বিচ্ছেদ সহিতে পারিব না; যদি নদী পার হইতে না পারি, চল অন্য পথে যাই। তুমি শুনিলে না, অনেক বুঝাইলে, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীকার করিলাম। তুমি লম্ফ দিয়া জলে পড়িলে। অল্প পরে অপর পারে পৌঁছিলে। আমার দিকে আর ফিরিয়াও চাহিলে না, তুমি যেন উন্মনা হইয়া বরাবর চলিয়া গেলে। আমি কত চেঁচাইলাম, কত অনুনয় বিনয় করিলাম, কত কাঁদিলাম, কিন্তু তুমি যেন কিছুই শুনিলে না, বরাবর চলিয়া গেলে। এই সময় নদীতটস্থ বন হইতে এক কামিনী বাহির হইয়া তোমার হাত ধরিল। অমনি দুজনে অরণ্য মধ্যে কোথায় লুকাইয়া পড়িলে।

শরৎসুন্দরী নিস্তব্ধ হইলেন; ঝর ঝর করিয়া নয়নবারি ঝরিতে লাগিল।

রতি। (মধুর হাসিয়া) তুমি কি জান না যে, দিনের ভাবনা রাত্রে স্বপ্নমূর্ত্তি ধরে। একটু পূর্ব্বে তুমি সামান্য বিচ্ছেদকে ঝটিকা মনে করিয়াছিলে, সুতরাং তোমাকে নিস্তেজ দেখিয়া স্বপ্ন ঝড়ে উড়াইতেছিল।

শর। চিন্তা করিলে কি হইবে? সংসারে অদৃষ্ট সকলের মূল। আমি বিচ্ছেদকে ভয় করি না; তবে অভাগিনী অবলাগণের কপাল মন্দ, তা নহিলে পতি-সোহাগিনী দময়ন্তী কেন নলের দারুণ বিচ্ছেদ সহ্য করিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইবে? কেনই বা পঞ্চবীর-পত্নী পাঞ্চালী পতি সম্মুখে দুঃশাসনের অন্যথা শাসনের বশীভূতা হইবে?

রতি। তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না?

শর। সে কথার কি আবার প্রশ্ন হইতে পারে? আমি, যতদূর হইতে পারে বিশ্বাস করি; তুমিও যতদূর সম্ভব ততদূর বিশ্বাসী; কিন্তু এ সংসারে কোন্ মানুষ আপনার অবস্থার দাস নহে? কে অবস্থা, সময় ও অদৃষ্টের বিরুদ্ধে মনের ইচ্ছা সফল করিতে পারিয়াছে? রামচন্দ্র কি স্বেচ্ছায় জানকীকে বনবাস দিয়াছিলেন? না উগ্র ভীমসেন সহজে প্রিয় পত্নীর অবমাননা সহ্য করিয়াছিলেন? আমি সকল বুঝি, কিন্তু অদৃষ্টের ভয়ে ব্যস্ত হইয়াছি।

রতি। তুমি স্থির ও নিশ্চিন্ত মনে জগদীশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ কর, তোমার ও আমার সকল বিপদ দূর হইবে।

রজনীর অবসান হইল। বহির্ব্বাটীতে স্বর্ণ চতুর্দ্দোলা প্রস্তুত। সকলে ভাবী মহারাজার অপেক্ষা করিতেছে। তিনি প্রেরিত রাজ-

পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, ললাটে শ্বেত চন্দনের প্রলেপ দিলেন, গলায় মতির মালা পরিলেন, কর্ণে বীরবৌলি ধারণ করিলেন। সেই অলোক-সামান্য রূপসম্পন্ন রতিকান্ত আজ অলৌকিক ও অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যপ্রভা প্রকাশ করিলেন। শরৎসুন্দরী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, স্বহস্ত-গ্রথিত বেল ফুলের মালা গলায় পরাইয়া দিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"শরৎ, এই মালাই তোমার প্রতিনিধি হইয়া আমার হৃদয়ে রহিল। আমি যেখানে কেন থাকি না, এই হৃদয় শরতের চিত্র ভিন্ন কোন কালে অন্য কোন মূর্ত্তি ধারণ করিবে না। তুমি প্রফুল্লমনে আমাকে আজ বিদায় দাও।" শরৎ হাসিতে পারিলেন না; কেবল গলা ধরিয়া বলিলেন,—"আমরা চির অভাগিনী, নহিলে এ সুখের সময়, কেন তোমায় প্রাণ ভরিয়া রাজসভায় বসিতে দেখিতে পাইলাম না?"

রতি। তুমি কি জান না, পাটেশ্বরী রাজসভায় রাজার বামে বসিয়া থাকেন।

এইবার না হাসিয়া শরৎ থাকিতে পারিলেন না। কুন্দ দন্তপাঁতি ঈষৎ বাহির করিয়া কহিলেন,—"অত লোকের মধ্যে তা হয়ত আমি পারিব না।

রতি। তবে কি তোমার প্রেমে খুঁত আছে, নহিলে আমার নিকট বসিতে তোমার লজ্জা হইবে কেন

শর। এইবার ঠকেচি—আর লজ্জা দিও না।

রতি। অভিষেকের সময় তোমাকে রাজবাটী যাইতে হইবে।

তিনি শরৎসুন্দরীকে গাঢ় প্রণয়ভরে আলিঙ্গন করিয়া ও ব্রজসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া চতুর্দ্দোলায় উপবেশন করিলেন। প্রথম, বাদ্যকরেরা বাদন করিতে করিতে চলিল; দ্বিতীয়, পদাতিক সৈন্যেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পতাকা ধারণ করিয়া চলিল; তৎপরে অশ্বা-

রোহী সৈন্য ঐ রূপ দুই ভাগে চলিল; চতুর্থ ভাগে রাজকর্ম্মচারী কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ যানে গমন করিলেন। সর্ব্বশেষে রতিকান্ত আটজন অশ্বারোহী শরীররক্ষককে পশ্চাতে করিয়া চলিলেন। তিনি শিবিকায় উঠিবা মাত্র সকলে "জয় জয়" ধ্বনি করিতে লাগিল। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত রাস্তায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুরস্ত্রীদিগের মধ্যে কেহ শয্যা উত্তোলন করিতেছিল, এমন সময় কোলাহল শ্রবণ করিয়া বাতায়নের নিকট আগমন করিল, হাতের উপাধান হাতে রহিয়া গেল, রাখিবার সাবকাশ কোথায়? কেহ বা বিশ্লিষ্ট কণ্ঠমালা সূত্রে পরাইতেছিল, অকস্মাৎ বাদ্যোদম শ্রবণ করিয়া গবাক্ষে চলিল, হাতে কণ্ঠমালা আছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। ঝর ঝর করিয়া দানাগুলি পড়িতে পড়িতে শেষে একটী মাত্র হস্তে অবশিষ্ট রহিল। কেহ বা বস্ত্রান্তর গ্রহণে উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে সংবাদ পাইয়া, বিবস্ত্রা বাতায়নে ধাবমানা হইল। কাহার হস্তের মুকুর হস্তে রহিয়া গেল। এইরূপ সকলে নিস্পন্দভাবে অনিমিষ নয়নে, সেই অনিন্দিত প্রদীপ্ত নির্ম্মলকান্তি সন্দর্শন করিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী বিবেচনা করিতে লাগিল।

যতক্ষণ চতুর্দ্দোলা দেখিতে পাওয়া গেল, ততক্ষণ শরৎসুন্দরী একদৃষ্টে, একাগ্রমনে দেখিতে লাগিলেন। যখন দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল, তখন চারিদিক্ আঁধার দেখিলেন। উমার তেমন হেমবর্ণ তাঁহার নিকট বিবর্ণ বোধ হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

—):*:(—

উইল।

এক অতি বৃহৎ উদ্যানে, সকল দেশের ফল ও ফুলের বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া প্রকৃতির চমৎকার শ্রী সম্পাদন করিতেছিল। মধ্যস্থলে এক সরোবর—শ্বেত ও স্বচ্ছ সলিলে পরিপূর্ণ। তাহারই পশ্চাদ্ভাগে এক সুবৃহৎ প্রস্তর নির্ম্মিত ত্রিতল রাজপ্রাসাদ। এমন সুন্দর, এমন গগনভেদী, এমন শিল্পকৌশলসংযুক্ত অট্টালিকা আর দ্বিতীয় রাজধানীতে ছিল না, অন্যদেশেও এইরূপ প্রাসাদ অতি বিরল। উদ্যানের চারিদিকে প্রাচীর; মধ্যে সিংহদ্বার; সশস্ত্র রক্ষীবর্গ দ্বারা দিবারাত্রি রক্ষিত। উদ্যানের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর। তথায় সময়ে সময়ে সৈন্যগণ সমবেত হইয়া সামরিক কৌশল প্রকাশ করিত, কখনও বা কৃত্রিম যুদ্ধে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া শত্রুব্যূহ ভেদ করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রাসাদের সন্নিকটে পশুশালা, প্রমোদ উদ্যান, বিলাস ভবন, নন্দন কানন, পুস্তকাগার প্রভৃতি সুসজ্জিত নানাপ্রকার উদ্যান ও প্রাসাদের শ্রেণী।

আজ প্রান্তরের মধ্যে সৈন্যগণ সশস্ত্রে ও রাজকীয় পরিচ্ছদে (Uniform) ভূষিত হইয়া, মহোল্লাসে কোলাহল করিতেছিল। চতুর্দ্দোলা তোরণে উপস্থিত হইবা মাত্র, উদ্বেলিত সৈনিকগণ নিস্তব্ধ হইল। সেনাধ্যক্ষের এক ইঙ্গিতে সকলে সমান্তরাল রেখাতে দাঁড়াইল। তর-

বারির খেলা আরম্ভ হইল। শত শত সৈন্যের অসির ঝন্‌ঝনায় তুমুল শব্দোৎপন্ন হইল। রতিকান্ত হস্তকৌশল ও লঘুহস্ততা দর্শন করিয়া অবাক্ হইলেন। সিংহদ্বারে প্রকাণ্ড ধ্বজা পত্ পত্ শব্দে উড়িতেছে। দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একশত হস্তী কারুকার্য্য-খচিত মখমলের পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, নবমহারাজাকে শুণ্ডাত্তোলন পূর্ব্বক আহ্বান করিল। শুণ্ড দ্বারা তিন বার 'সেলাম' করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণিপাত করিল। তৎপরে সকলে উঠিয়া মহারাজার প্রতি একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল। আহ্লাদে গর্ব্বিত হইয়া গভীর নির্ঘোষ করিল। গর্ব্বের চিহ্ন স্বরূপ দুইচক্ষু হইতে মদ ক্ষরিতে লাগিল। এতক্ষণ পঞ্চশত ঘোটকারোহী রাস্তার দুই পার্শ্বে নিঃশব্দে দাড়াইয়া ছিল। এখন ভাবী মহারাজকে সমাগত দেখিয়া, অশ্বগণকে ইঙ্গিত করিল। এক সময়ে সমুদয় ঘোটক আরোহী লইয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিল। দ্বিতীয় ইঙ্গিতে উঠিয়া দাড়াইল। অশ্বারোহীর দল ক্ষিপ্র হস্তে তরবারি সঞ্চালন করিতে করিতে, এমন সরল রেখাতে দৌড়িতে লাগিল যে, রতিকান্ত ক্ষণকাল আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একমনে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহারা অদৃশ্য হইলে দেখিলেন, প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

রেসিডেণ্ট কাপ্তেন লুইস সাহেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রাজ্যের সমুদয় উচ্চ কর্ম্মচারিগণ রাজকুমারকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। আজীবন রাজ-সেবিত ও শিক্ষিত রাজকুমারের ন্যায় তিনি সকলকে সুমধুর বচনে যথাযোগ্য প্রত্যভিবাদন করিলেন। একদিকে কাপ্তেন সাহেব, অন্যদিকে প্রধান মন্ত্রী অযোধ্যানাথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সভাগৃহ অতিশয় প্রশস্ত। চতুর্দ্দিকে যুগ্ম স্তম্ভ, তদুপরি ছাদ সংরক্ষিত। প্রত্যেক স্তম্ভে এক একখানি বৃহদালেখ্য। একখানিতে উগ্র ভীমসেন

জরাসন্ধের গ্রীবা ধারণ করিয়া, ভূতলশায়ী করিবার চেষ্টা পাইতেছে। দুরাত্মা জরাসন্ধ রোষপরবশ হইয়া, লোহিত লোচনে, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে, শত্রুর বক্ষে পদাঘাত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেন উভয় পদদেশ বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিল। দ্বিতীয়ে, চিতোর-রমণী পদ্মিনী দক্ষিণ হস্তে শাণিত খড়্গ ধারণ করিয়া, ঘোটকারোহণে পলায়নপরায়ণ সৈন্যদিগকে কহিতেছেন—"ভীরু! ক্ষত্রিয়-কুলকলঙ্ক! রণে পৃষ্ঠ দিয়া কি এইরূপে স্বদেশ রক্ষা করিতে শিখিয়াছ? এ অপদার্থ জীবনে প্রয়োজন কি?" সৈনিকেরা এই কথা শুনিয়া যেন মোহিতপ্রায় হইয়া, সেই সূর্য্যপ্রভা পদ্মিনীর দিকে চাহিয়া আছে। তৃতীয়ে, দুই জন বীরপুরুষ মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একজন পড়িয়া গিয়াছে। জেতা বিজিতের বক্ষে বসিয়া বলিতেছে—"হারি স্বীকার কর, নহিলে এক পদাঘাতে মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলি।" বিজিত যেন মুখ-ভঙ্গী করিয়া বলিতেছে,—"অধর্ম্ম যুদ্ধে আমাকে ফেলিয়া দিয়া আবার গর্ব্ব! তোর গর্ব্বে ধিক্! প্রাণ থাকিতে পতঙ্গের নিকট হারি স্বীকার করিব না।" চতুর্থে,—ঐ দুই বীর পুরুষের মধ্যে বিজিত যেন চপলার প্রভার ন্যায় এক মুহূর্ত্তে আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিল এবং শত্রুকে পাতিত করিয়া গ্রীবা ধারণ করিল। সে মুখ কুটিল করিয়া গোঙ্গাইয়া বলিতে লাগিল,—"একেবারে কি মারিবে?" ক্ষত্রিয় হাস্য করিয়া কহিল,—"রে অনার্য্য! প্রাণ ভিক্ষায় তোর লজ্জা নাই।" সিংহাসনের পশ্চাদ্দিকের ভিত্তিতে এক বৃহদালেখ্য। এক অসাধারণ শ্রী ও বীর্য্য সম্পন্ন যুবা পুরুষ ঘোটক হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক, বাম হস্তে জীবিত ব্যাঘ্রের গলদেশ কঠিনরূপে ধারণ করিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণ অসি লইয়া তাহার মুখবিবরে প্রবেশ করাইতেছেন। ব্যাঘ্রের মুখ হইতে অনর্গল শোণিতস্রাব হইতেছে। ব্যাঘ্র লাঙ্গুল নাড়িয়া দারুণ

যন্ত্রণা প্রকাশ করিতেছে। রতিকান্ত এই বীরমূর্ত্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইলেন। ভক্তির স্রোত উথলিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন,—"কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কি অসাধারণ ক্ষমতা! কি জ্বলন্ত তেজঃ! ইনি কে?" নিম্নের লেখা পড়িয়া দেখিলেন—'মহারাজ শশধর বাহাদুর ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে স্বহস্তে জীবিত ব্যাঘ্র এইরূপে বিনাশ করেন।' তিনি বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এই ক্ষীণ, এই নিস্তেজ, এই সাহসশূন্য হতভাগা কি ঐ বীরপুরুষের পুত্র। তিনি গাঢ় ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

সভাগৃহের মধ্যস্থলে অপূর্ব্ব হৈম সিংহাসন। কুলধর্ম্মানুসারে অভিষেক না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ সিংহাসনে বসিতে পারেন না। আজ রতিকান্ত অন্য আসনে উপবেশন করিলেন। পার্শ্বে কাপ্তেন লুইস, মন্ত্রী অযোধ্যানাথ ও রাজস্বসচিব রমানাথ, সেনাপতি প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারী স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে উপবেশন করিলেন। সভাগৃহের একপার্শ্ব সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা আবৃত ছিল। স্বর্ণ ঝালরে তাহার চাকচিক্য বৃদ্ধি করিতেছিল। আবশ্যক হইলে রাজমহিষী অথবা অন্য পুরস্ত্রীগণ এই স্থানে আগমন করিয়া রাজসভার কার্য্য দেখিতে পারিতেন। আজ মহিষী কমল-কুমারী অন্যান্য সঙ্গিনীগণে পরিবৃতা হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। রাজভৃত্য অযোধ্যানাথের আদেশে এক সুন্দর গজদন্ত-বিনির্ম্মিত বাক্স আনয়ন করিলে পর, কাপ্তেন সাহেব তাহা উদ্ঘাটন করিয়া মৃত মহা-রাজার উইল বাহির করিয়া, পড়িবার জন্য এক সভাসদের হস্তে দিলেন। সে এইরূপে পড়িতে লাগিল ঃ—

"আমি পূর্ণজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে নিম্নলিখিত আদেশ লিপিবদ্ধ করিলাম। আমার মৃত্যুর পর এই আদেশানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

সকলেই অবগত আছেন যে, মহিষী কমলকুমারী দেবী * সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে গর্ভ ধারণ করেন। নবম মাস হইতে তাঁহার উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। রাজবৈদ্য ইহা গর্ভের আনুষঙ্গিক লক্ষণ বলিয়া স্থির করিলেন। প্রকৃত পক্ষে তাহাই বটে, কারণ প্রসবান্তে সেই ভাব অচিরে তিরোহিত হয়। ইতিপূর্ব্বে নবকুমার দে নামক জনৈক রাজ-কর্ম্মচারীর ভগিনী উৎফুল্লময়ী ভ্রূণহত্যার অপরাধে অপরাধিনী হইলে, রাজদরবার হইতে বিশেষরূপে দণ্ডিত হয়। রাক্ষসী নিতান্ত অসন্তুষ্টা ও হিংসার বশবর্ত্তিনী হইয়া আমার সর্ব্বনাশ সাধনে ব্রতী হয়। উৎফুল্লময়ীকে রাণী স্নেহ করিতেন। দণ্ডাবসানে রাণী তাহাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এমন কি সমাজের দোষে যে সকল স্ত্রীলোক বিপথগামিনী হইয়াছে, তাহাদের জন্য তিনি স্বতন্ত্র বিধি নির্দ্ধারণ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। উৎফুল্লময়ীর হৃদয়ে তখন প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছা অতিশয় বলবতী ছিল। সে রাণীর অবস্থা বুঝিয়া, তাঁহাকে তদবস্থায় জগন্নাথ দর্শনের পরামর্শ দিয়াছিল। তিনি তখন একরূপ উন্মত্তা ছিলেন। হিতাহিত বিবেচনা করিতে অক্ষম হইয়া জগন্নাথ দর্শনের জন্য সাতিশয় ব্যস্ত হইলেন। রজনীযোগে উভয়ে গুপ্তদ্বার দিয়া বাহির হইলেন। দুইখানি পাল্কি করিয়া উভয়ে সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্ত্তী বনপথে অনেক দূর চলিয়া গেলেন। পূর্ব্ব-ঘাটের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে উপস্থিত হইয়া পিশাচী বাহকদিগকে বিদায় দিল তখন পদব্রজে যাইবার জন্য পরামর্শ করিল। একে অসূর্য্যম্পশ্যা, তাহাতে সেই অবস্থায় রাণী আর কতদূর যাইতে পারেন? জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বনে

* মৃত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের মহাভারতে দ্রৌপদীকে দেবী বলিয়া অনেক স্থানে সম্বোধন করা হইয়াছে। তাহাতে বোধ হয় ক্ষত্রিয় জাতির স্ত্রীদিগকে দেবী সম্বোধনে দোষ হইতে পারে না।

রাণীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল ; তিনি এক দিবা নবকুমার প্রসব করিলেন। দুর্বৃত্তা পিশাচী রাণীর বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া, সেই রাজকুমারকে তদুপরি শয়ন করাইল, এবং শীঘ্র শীঘ্র সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পুরীর পথে চলিতে লাগিল। কিন্তু অপত্যস্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! রাণী পুত্রের জন্য ব্যথিতা হইলেন, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তখন পিশাচীর অনিচ্ছায়ও তিনি প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু হায়! সে রাজকুমার তখন কোথায় কোন্ অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া গিয়াছে। তিনি কাতরা হইয়া রাক্ষসীকে কতই তিরস্কার করিলেন। বন্য জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহার শোকের সীমা রহিল না। কিন্তু ছিন্ন অঞ্চল না দেখিয়া একটু সন্দিহান হইলেন। অনেক অন্বেষণ করিয়াও পুত্রের কোন সন্ধান পাইলেন না। কিন্তু বিধাতার কি বিড়ম্বনা! উৎফুল্লময়ীর প্রাণের আশঙ্কা করিয়া বহুকাল এ সকল কথা রাণী আমাকে বলেন নাই। আমি বুঝিযাছিলাম যে, মৃত সন্তান মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। উৎফুল্ল-ময়ীকে এই দুষ্কর্ম্মের মূল ও স্ত্রীহত্যা মহাপাপ বিবেচনা করিয়া তাহার মস্তকমুণ্ডন পূর্ব্বক পরিবার সহ রঘুনাথগড় হইতে বাহির করিয়া দিলে, তাহারা ইংরেজ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে।

সেই গর্ভের চারি বৎসর পরে, আমার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তাহার চারি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, আমি সপরিবারে জগন্নাথ দর্শনে গমন করি। বৈতরণী-তীরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া, আমি সৈন্যসহ মৃগয়া করিতে পূর্ব্বাচলে গমন করিলাম। সে দিন কি কুগ্রহ যে, সন্ধ্যার পর প্রবল বৃষ্টি ও বাতাসে আমরা দিক্ হারা হইয়া, এক সন্ন্যাসীর গুহাতে সেই রাত্রি আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে শিবিরে আসিয়া দেখি, সমুদায় লণ্ডভণ্ড হইয়াছে, শিবিরের পূর্ব্বশ্রী

নাই। দুই তিনটা পড়িয়া গিয়াছে। দুই চারটা মনুষ্যের মৃতমুণ্ড মধ্যে মধ্যে গড়াগড়ি দিতেছে। শুনিলাম নিশাকালে একদল প্রবল দস্যু শিবির আক্রমণ করিয়া সমুদায় ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছে। যোদ্ধৃ-পুরুষেরা প্রথমে নিদ্রিত ছিল, তাহারা সংখ্যায়ও অল্প ছিল। শীঘ্র নিরস্ত্র হইল। রত্নের সহিত তাহারা আমার একমাত্র কন্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। রাণী সেই সময় স্বর্ণালঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সামান্যা দাসীর পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন। দস্যুপতি রাণীকে ধৃত করিবার জন্য উৎসুক হইলে, এক ক্ষুদ্রকায় দস্যু তাহাকে সে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া আমার প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছিল।

পুত্রের দক্ষিণ জানুতে এক বৃহৎ কৃষ্ণ চিহ্ন (জটুল) আছে, তাহা এখনও আছে কি না বলিতে পারি না। বাম হস্তে ছয়টী অঙ্গুলি। পরিত্যক্ত ছিন্ন অঞ্চলে রাণীর নাম লেখা ছিল। আমার অবর্ত্তমানে এই পুত্র পাওয়া গেলে, তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন ; কিন্তু বাল্যকালের প্রতিজ্ঞায় আমি আবদ্ধ বলিয়া তাহাকে আমার প্রিয়সুহৃদ্ পরলোকগত বসন্ত সিংহের কন্যা শ্রীমতি যোগেশ্বরীকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার মৃত্যু হইলে স্বতন্ত্র কথা। অভিষেকের সময় পুত্রের পূর্ণচন্দ্র নামকরণ করিতে হইবে। বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, পুত্র দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা বাৎসরিক বৃত্তি পাইবেন ও আমার পিণ্ডের অধিকারী হইবেন না।

কন্যার নাম প্রভাবতী। তাহার সহিত আমার মুখের অনেক সাদৃশ্য আছে। তাহাকে এখনও দেখিলে অনেকে চিনিতে পারিবেন, এইরূপ ভরসা আছে। পুত্রের নিরুদ্দেশে অথবা বিবাহে অস্বীকৃত হইলে এবং কন্যার উদ্দেশ পাইলে, প্রভাবতী মহিষীর অবর্ত্তমানে রাণী হইবে। মহিষী জীবিতকালে কন্যার নামে রাজ্য শাসন করিবেন।

কন্যা ও যোগেশ্বরী প্রত্যেকে দ্বিসহস্র মুদ্রা মাসিক বৃত্তি পাইবেন। পুত্র কন্যার অবর্ত্তমানে রাণী মাসিক দশ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি পাইবেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সদাশয় ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমার নিকটস্থ কোন উপযুক্ত জ্ঞাতিকে সিংহাসন প্রদান করিবেন।

আমার রাজ্য যে ভাবে শাসিত হইতেছে, ভবিষ্যতেও সেইরূপ ভাবে শাসন করিতে হইবে। ইংরেজদিগের রীতি নীতি, শাসনকৌশল প্রভৃতি সদৃষ্টান্ত সকল ও তাঁহাদের উপদেশ সর্ব্বসময়ে গ্রহণ করিয়া, দিন দিন প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইবে। ইতি।

প্রভাবতীর নাম শুনিয়া রতিকান্ত একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আহ্লাদের সহিত বলিলেন,—"প্রভাবতী নারায়ণগড়ের জমিদার নরেন্দ্র-লাল বাবুর বাটীতে আছে। তথায় তাহাকে চারি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় কতিপয় দস্যু পরিত্যাগ করিয়া আইসে। তাহার সহিত ঐ আলেখ্যমধ্যস্থ ব্যাঘ্রহন্তা মহাপুরুষের মুখের অনেক সাদৃশ্য আছে।" এই সময় পার্শ্ববর্ত্তী বস্ত্রাভ্যন্তরে অস্ফুট রোদনধ্বনি সমুত্থিত হইল! এক সময়ে পুত্র ও কন্যা পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া কমলকুমারীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এত ভাব মনে উঠিতে লাগিল যে, তিনি তাহার বেগ ধারণে অসমর্থা হইলেন। ক্রমে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। কিঙ্করীগণ মুখে শীতল বারি সেচনে ও তালবৃন্ত ব্যজনে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল।

রতিকান্তের দক্ষিণ বাহুতে এখনও কৃষ্ণ চিহ্ন রহিয়াছে। বাম হস্তে ছয়টি অঙ্গুলি। তিনি কহিলেন, "জলেশ্বর গ্রামের রামনারায়ণ সিংহ আমাকে বন হইতে কুড়াইয়া আনেন এবং সযত্নে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। একখণ্ড বস্ত্রাঞ্চলে 'কমলকুমারী' রেসমের সূতায় লেখা আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি। অনেক দিন তিনি আমার জন্ম গোপন

করিয়া, আমি যে তাঁহার ঔরসজাত পুত্র এইরূপ প্রচার করেন। মাতা পদ্মমুখী সেই সময়ে এক মৃত সন্তান প্রসব করেন। আমাকে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহারা পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন। আমি বড় হইয়া রামনারায়ণ সিংহের ভ্রাতৃবধূর নিকট এই সংবাদ পাইয়া, মাতা পদ্মমুখীকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি অতি কষ্টে সমুদয় সত্য ঘটনা আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন। এখনি সেই পরিবারকে এখানে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরিত হউক। উৎফুল্ল-ময়ী রামনগরে আছে। যখনই সুবিধা পাইয়াছে, তখনই পিশাচী আমার অপকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এখনও বিন্দুমাত্র তাহার রাগের শমতা হয় নাই। পাপিনী বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল।"

সকল সন্দেহ দূরীকৃত হইল। ভীষণ "জয় জয়" ধ্বনি আকাশে উঠিয়া জগৎ কাঁপাইয়া তুলিল। উদ্যানে নহবত অপেক্ষা করিতেছিল, এখন মধুর শব্দে বাজিতে লাগিল। বাজীকর একশত বোমে অগ্নি প্রদান করিল। দেশ, আকাশ ও দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া, মহানির্ঘোষে দূরদূরান্তরে রাজবাটীর উৎসব জানাইল। মাতঙ্গের বৃংহতি, ঘোটকের হ্রেষা রব, পিঞ্জরবদ্ধ পশুপক্ষীদিগের চীৎকার, নাগরিকদিগের কোলাহল, সৈনিক পুরুষদিগের "জয় মহারাজের জয়" ধ্বনি, বাজনার সহিত মিলিত হইয়া তুমুল কোলাহল সমুৎপন্ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভা ভঙ্গ হইল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

মা ও ছেলে।

মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি সুবর্ণ থালে লইয়া রাণী কমলকুমারী এক প্রশস্ত কক্ষের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। সাধের পুত্রকে তিনি আলিঙ্গন করিয়া, বহুকালের সাঞ্চত জ্বালা আজ হৃদয় হইতে দূর করিবেন। পুত্রও মহাব্যস্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীর ন্যায় এক রমণী হস্ত বিস্তার করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। স্বর্গীয় জ্যোতিঃ যেন তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি সাষ্টাঙ্গে সেই দেবীপ্রতিমাকে প্রণাম করিয়া, মাতার পাদদেশে আপন মস্তক স্থাপন করিলেন। মাও তাঁহাকে সযত্নে উত্তোলন করিয়া, প্রথমে মাঙ্গলিক ক্রিয়া সকল একে একে নিষ্পন্ন করিলেন, পরে উভয় হস্তে পুত্রকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। এতদিন যে স্নেহরাশি হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ ছিল, আজ যেন তাহার দ্বার খুলিয়া গেল। বেগে—অতিবেগে স্নেহের স্রোত প্রবাহিত হইল। অবিরলধারে ক্রন্দন করিতে করিতে মা আজ হৃদয়ে শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন। মা যত কাঁদিতে থাকেন, পুত্রও তত ক্রন্দন করেন। উভয়ের শোকবেগ আজ উথলিয়া উঠিল। গত জীবনের কত কথা একেবারে রাশি রাশি মনে উঠিতে লাগিল। ধরায় উপবেশন করিয়া মা পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। রতিকান্ত নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক জননীর মুখ

নিরীক্ষণ করিয়া যেন অপার আনন্দ লাভ করিলেন। সদানন্দ ব্রহ্মচারী যে ভাবে তাঁহার রূপ ও মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন, যে দেবীমূর্ত্তি তিনি মানসপটে প্রতিষ্ঠা করিয়া, এতদিন ধ্যান করিয়া আসিতেছিলেন, আজ এই জীবন্ত ভুবনেশ্বরীর সম্মুখে সে সকলের তুলনাই হইতে পারে না বলিয়া মনে হইল। এমন পবিত্র, এমন স্নেহোদ্দীপক, এমন সৌন্দর্য্যময়, এমন অপার্থিব মুখমণ্ডল তিনি জগতে আর কোথায়ও দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। কি বিশাল বিস্তীর্ণ নয়নযুগল! যেন অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবে বিভোর রহিয়াছে, সে চক্ষু যেন সংসারের কোন নিকৃষ্ট বস্তুতে কখন পতিত হয় না; যেন সদাই বিশ্বপতির বিশ্বমোহন ভাবে মুগ্ধ রহিয়াছে।

রতিকান্ত যতই মাতার মুখাবলোকন করেন, ততই যেন ভক্তিরসে প্লাবিত হইতে থাকেন। চক্ষু হইতে অনর্গল বারি বিগলিত হইতে লাগিল। করুণ কণ্ঠে বলিলেন,—"জননি, তোমার ক্রোড়ে আজ শয়ন করিয়া আমার অন্তরের দারুণ জ্বালা বিদূরিত হইল। আমি পথে পথে, নগরে নগরে, অনিদ্রায়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া, মা-মা বলিয়া এতদিন যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, মনের আবেগে ও যাতনায় জলে ঝাঁপ দিয়া যে জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে গিয়াছিলাম, জীবনে কেবল নৈরাশ্যের স্রোত বহিতেছিল ভাবিয়া ঈশ্বরের বিশ্বপ্রেমে সন্দিহান হইয়াছিলাম, আজ কিন্তু এই মুহূর্ত্তে, আমার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা, সকল চিন্তা কে যেন দূর করিয়া দিল। মা! সংসারে আমার মত ভাগ্যবান আজ কে আছে?"

এমন সময় মার মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রবেশ করিয়াছে। তিনি বলিলেন,—"বৎস, আমার মনে হইতেছে, যেন সুবর্ণরেখা নদী আজ নির্জ্জন ও গভীর বনের ভিতর প্রবাহিত; তাহারই একদেশে আজ তোমাকে প্রসব করিয়া আমি ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছি। এখনও

যেন তুমি আমার সেই ক্ষুদ্র, সেই অপরিপুষ্ট, সুন্দর ও লাবণ্যযুক্ত শিশু। বিংশতি বৎসর কেমন করিয়া গেল, আমি তাহাই ভাবিতেছি।"

রতি। মা, ভগবানের কৃপায় আমার সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, প্রার্থনা করিবার বিষয় এখন আমার কিছুই নাই। আমি কি কম পুণ্যবান্, তাই ইহ জগতে তোমার মত দেবীকে আমার জননী বলিয়া পাইয়াছি। তোমার পদধূলি আমার মস্তকে দাও, জন্ম-জন্মান্তরে তুমিই আমার মা হইও, যেন চিরজীবন তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া এ নশ্বর জীবন শেষ করিতে পারি।

মাতা অনিমিষ নয়নে পুত্রের দিকে চাহিয়া আছেন। পুত্রের রূপ দেখিয়া পরিতৃপ্তি কিছুতেই হইতেছে না। রতিকান্তের হৃদয় আজ নানা ভাবে পরিপূর্ণ। সেই ভাবের উত্তেজনায় ললাটে ও গণ্ড-স্থলে যে লালরেখা পড়িয়াছে, তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছেন। অকস্মাৎ মানসপটে যেন গভীর স্মৃতিচিহ্ন জাগিয়া উঠিল। নয়নযুগলে অনর্গল অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে পুত্র ব্যথিত হইয়া, ক্রোড় হইতে উঠিয়া ধরায় বসিলেন। কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"মা—ওমা—কি হইয়াছে—কেন মা তুমি হঠাৎ ব্যাকুলা হইয়া উঠিলে?"

মা। বৎস,—কতদিন, কতমাস, কতবৎসরের পরে আজ পুত্র ও কন্যা পাইয়া আমি অসীম দুঃখের তরঙ্গ পার হইয়া কূল পাইলাম। হায়! মহারাজা জীবদ্দশায় এ সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। পুত্র ও কন্যার শোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া, যৌবনেই জীবন বিসর্জ্জন করিলেন!—তিনি আর বলিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া বুক ভাসা-ইলেন।

রতি। মা, শাস্ত্রে বলে, পিতা স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ,—তুমি

আমাকে সেই পিতার কথা বল। আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার কথা শুনি। এ জীবনে যে সেই মহাপুরুষকে আর দেখিব না, এই মহাদুঃখ এ জন্মের তরে প্রাণে বিদ্ধ হইয়া রহিল।

মা। বৎস, স্বর্গীয় মহারাজা এক অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। এমন প্রতিভাশালী, এমন শক্তিশালী পুরুষ এ রাজ্যে আর দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তিনি দৈহিক ও মানসিক বলে সকলকেই পরাস্ত করিতেন। পুত্র কন্যার জন্য তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। এত যে মনের কষ্ট, কিন্তু তাহা মুখে প্রকাশ করিতেন না। দিন রাত্রি—কি উপায়ে এই হিন্দুরাজ্য আদর্শরাজ্য হইবে, তাহারই চিন্তায় কালক্ষেপ করিতেন। গ্রামে গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া স্বচক্ষে প্রজার অবস্থা দেখিতেন ও তাহাদের আবেদন গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য বিচার করিতেন। কাহারও কষ্ট দেখিলে, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইত। এই পরিশ্রমের উপর পুত্র কন্যার বিয়োগদুঃখে তাঁহার মানসিক স্ফূর্ত্তি ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল, কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে তাহা কেহই বুঝিতে পারিত না এক দিন দ্বিপ্রহরে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত, ভৃত্য তাঁহাকে সংবাদ দিতে ছুটিয়া গেল। তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছিলেন। ভৃত্যের কথা শুনিয়া সবলে বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কি যে হইল, মাথা ঘুরিয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন। সংজ্ঞা লোপ পাইল, বাক্য রহিত হইল। অল্পক্ষণ পরে মানবলীলা সাঙ্গ করিলেন। রাজবৈদ্য বলিলেন, ইহাকে হৃদ্‌-রোগ বলে, এ রোগ শিবের অসাধ্য। সেই দিন হইতে এই রাজপুরী যেন শ্মশানে পরিণত হইল, জ্বলন্ত দীপকে যেন কে ফুঁদিয়া নিবাইয়া দিল, সমুদায় রাজ্য অন্ধকারে পূর্ণ হইল।

রতি। মা, তুমি নাকি সেই দিন হইতে অন্নব্যঞ্জন পরিত্যাগ

করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বন করিয়া দুগ্ধ ও ফল ভোজনে দেহ ক্ষয় করিতেছ?

মা। বৎস, মহারাজ যে অন্নব্যঞ্জন পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গবাসী হইলেন, তাহাতে কি আমার আর অধিকার আছে? আমি কোন্ মুখে অন্নব্যঞ্জন আহার করিব? আর এ জীবনের কি মূল্য আছে? রাজ্যরক্ষার জন্য এতদিন আমার জীবনের বরং প্রয়োজন ছিল; এখন তুমিই রাজ্যভার গ্রহণ করিবে। বৎস, আর আমার পৃথিবীর সহিত কি সম্বন্ধ?

রতি। মা! তবে কি আমি সমুদ্রে ভাসিয়া যাইব? তোমাকে দেখিয়া আমার তৃপ্তির শেষ এখনও হইতেছে না—তুমি চলিয়া গেলে, মা আমি কোথায় যাইব, কাহাকে আশ্রয় করিব, আমার কে আছে মা? আমি অতিশয় ভাগ্যহীন, তাহা না হইলে, মা কেন পুত্র পাইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইবেন।

মা। না বৎস, আমি জীবিত থাকিতে কখনই তোমাকে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে পারিব না। পুত্র বিনা যে আমি এতদিন জীবিত ছিলাম, ইহাই আশ্চর্য্য।

এইরূপে মাতা ও পুত্রে কত কথাই হইতে লাগিল। অফুরন্ত কথার কি শেষ হইতে পারে? একবার অপার আনন্দ-স্রোতে আবার দুঃখের স্মৃতির মধ্যে উভয়ে ডুবিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পরে কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র করযোড়ে বলিলেন,—"মা—তোমার আদেশ হইলে আমি এখনই নারায়ণগড় হইতে প্রভাবতীকে আনয়ন করিতে পারি।" কমল-কুমারী ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া কহিলেন,—"এ কার্য্য কি সেনাপতি করিতে পারিবেন না? তোমার যাইবার কি নিতান্তই আবশ্যক হইবে?" তিনি বিনীত মস্তকে ও নম্র বচনে কহিলেন,—

"না, এতদিন প্রভাবতী সেই স্থানে আছে কি না সন্দেহ;—আমি তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আনিতে পারিব।" মাতার সম্মতি গ্রহণ ও চরণবন্দনা করিয়া পরদিন রতিকান্ত পঞ্চাশৎ গজারোহী ও একশত অশ্বারোহী ও তিনশত পদাতিক সৈন্য সঙ্গে নারায়ণগড়ে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে, রামনারায়ণ ও শ্যামনারায়ণ ও তাহাদের পরিবারবর্গকে আনিবার জন্য যথাযোগ্য লোক প্রেরিত হইল। কালাচাঁদের জননী ও স্ত্রীকে এই সময় ভুলিলেন না। তাহাদের জন্যও লোক ছুটিল। একজন বাহক দ্বিসহস্র মুদ্রা ও একখানি ক্ষুদ্র লিপি লইয়া ঈশ্বরদাস বাবুর বাটীতেও অশ্বারোহণে চলিয়া গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

—)ঃ*ঃ(—

নরবলি।

আজ কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথি। পূর্ব্বাচল-সন্নিহিত, গভীর-অরণ্য-মধ্যস্থিত সেই উগ্রচণ্ডার মন্দিরে সন্ধ্যাসময়ে নৃত্যগীত হইতেছে। দেবী পুষ্পাভরণে সুশোভিতা,—লোহিত জবাপুষ্পহার গলদেশে দোদুল্যমান, কপালে রক্তচন্দনের কোঁটা; লোল জিহ্বা লক্ লক্ করিতেছে। সম্মুখে উজ্জ্বল মশাল সারি সারি জ্বলিতেছে। দস্যুদল আজ মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ গীত গাহিতেছে, কেহ হুঙ্কার ছাড়িতেছে। সেনাপতি ভীমসিংহ রক্তাম্বর পরিধান করিয়া, চণ্ডীর সম্মুখে যোড়করে দণ্ডায়মান আছে। মুখ শুষ্ক, বিমর্ষ ও গম্ভীর। নয়নে জল নাই, কিন্তু অন্তর বিষাদ-চিন্তায় পরিপূর্ণ। নিরাশার স্রোত বহিতেছে। সেই স্রোতস্বিনীর উভয় পার্শ্বে মরুভূমি। কোন্ কূলে আশ্রয় লইবে, ভীমসিংহ তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। কতক্ষণ ধ্যানমগ্ন হইয়া ভক্তির সহিত করযোড়ে কহিতে লাগিল ;—"মা জগদম্বে! ভুবনপালয়িত্রি, সর্ব্বার্থসাধিকে! অভাগাকে কি একেবারে পরিত্যাগ করিলে? এমন দুর্ভাগ্য, এমন নরাধম, এমন পাষণ্ডকে তবে কেন পৃথিবীতে প্রেরণ করিলে? আমি তোমার ঐ শতদল-পদ্ম-শোভিত শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে তোমার অসি গ্রহণ করিয়া, বঙ্গে হিন্দু জাতির গৌরব রক্ষা করিব, মনে করিয়াছিলাম ; সেই

জন্য আজ চতুর্দ্দশ বৎসর তোমাকে ভক্তিভরে পূজা করিতেছি, বুক চিরিয়া রক্ত দিতেছি, কিন্তু তথাপি কেন প্রফুল্ল হইতেছ না? মা, তবে কি আমি নিতান্ত হতভাগ্য? যদি আমার দ্বারা সংসারের কোন কার্য্যই না হইল, তবে পাপাত্মা ভীমসিংহের জীবনে প্রয়োজন কি? তবে কোন্ কার্য্য সাধনের জন্য তাহার জন্ম হইল? মা—তুমি অন্তর্য্যামিনী, তুমি পতিতপাবনী, তুমি মহিষাসুরমর্দ্দিনী, নৃমুণ্ডমালিনী, তুমি সকলই জানিতেছ, সকলই বুঝিতেছ, তবে কেন এ দাসের অন্তর্জ্বালা নিবারণ করিতেছ না?” ভীমসিংহ চক্ষু মুদ্রিত করিল। রঘুবীর সিংহ পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। এইভাবে কিছুক্ষণ চলিয়া গেল।

অনন্তর ভীমসিংহ কহিল,—“প্রতিহারী, কুলপুরোহিতকে ডাকিয়া আন।” এক সপ্ততিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে, সেনাপতি কহিল,—“দেব, লগ্ন উপস্থিত;—দেবীর পূজায় উপবেশন করুন।” সে ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া আসনে উপবিষ্ট হইল।

এক ঘণ্টার পর, বৃদ্ধ পুরোহিত গাত্রোত্থান করিয়া কহিল,—“রাজন্, শুভলগ্নে বলি প্রদান করুন, আজ দেবী সন্তুষ্টা হইয়া আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন; আমার দক্ষিণ চক্ষু ও দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে।” ভীমসিংহ সহাস্য বদনে কহিল,—“প্রতিহারী, শীঘ্র বলি আনয়ন কর।” অল্পপরে চারিজন দস্যু হতভাগ্য কৃষ্ণশঙ্করকে স্কন্ধে লইয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদতলে শয়ান করাইল। তাঁহার হস্ত পদ আবদ্ধ, কটিদেশে রক্তাম্বর, গলদেশে জবামালা, ললাটে সিন্দূরবিন্দু। তাঁহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ, মুখ ম্লান, কখনও চক্ষু বুজিতেছেন, কখনও বা মেলিতেছেন। সে অবস্থা দেখিয়া অজ্ঞাতসারে রঘুবীরের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। ভীমসিংহ উচ্চকণ্ঠে কহিল,—“নরাধম, আজ তোর অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে;

তুই হস্তীর ন্যায় বল পাইয়া কেবল পদসেবা করিতে শিখিয়াছিস্; তুই সংসারের কণ্টকবৃক্ষ, তোর দ্বারা ভারতের কোন উপকার নাই; এই জন্য আজ এই মুহূর্ত্তে তোকে দেবীর সম্মুখে উপহার দিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিব।"

কৃষ্ণশঙ্কর কোন উত্তর দিলেন না। তিনি কেবল অর্থশূন্য চক্ষে একদিকে চাহিয়া রহিলেন। রঘুবীর কহিল,—"যদি কিছু বলিবার থাকে, বলিতে পারেন, সময় অল্প।" মৃদুস্বরে কৃষ্ণশঙ্কর কহিলেন,—"এই পবিত্র সময়ে, মৃত্যুর সম্মুখে দস্যুর সহিত কথা কহিতে ঘৃণা করি; যাহা বলিবার তাহা ঈশ্বরকে বলিয়াছি—মারিতে ইচ্ছা হয় মার—কিন্তু এ দুর্ব্বৃত্ত, কাপুরুষ ভীমসিংহের সম্মুখে আমায় অধিকক্ষণ রাখিও না।" শরীরের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, এই উত্তেজনায় তাঁহার মোহ উপস্থিত হইল।

পুরোহিত পুনরায় পূজায় উপবেশন করিল। আড়ম্বরের সহিত ঢাক ও দামামা বাজিয়া উঠিল। দস্যুরা হুঙ্কার করিয়া উঠিল। তুমুল কোলাহল নৈশ গগনে উত্থিত হইয়া দিক্‌দিগন্তরে ছড়াইয়া পড়িল। পুরোহিত পূজা সমাপনান্তে, রক্তচন্দনে ও সিন্দূরে কৃষ্ণশঙ্করের অঙ্গ বিভূষিত করিল। কর্ম্মকারকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—"রামধন, দেবীর ইচ্ছায় সকলই প্রস্তুত।" অমনি বাদ্য স্থগিত হইল। প্রকৃতি এককালে নিঃশব্দ হইল।

কৃষ্ণশঙ্করের সংজ্ঞা নাই। অস্বাস্থ্যকর স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া ও দূষিত বায়ু সেবনে এত নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বাহ্যজ্ঞান প্রায় তাঁহার লোপ পাইয়াছিল। দুই জন দস্যু তাঁহাকে প্রাঙ্গণে নামাইয়া লইয়া আসিল। হাড়িকাঠে গলদেশ রাখিয়া দিল। তিনি স্পন্দশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন। সকলে মশাল লইয়া চতুর্দ্দিকে

দাঁড়াইল। গভীর কণ্ঠে 'মা, জয় মা চণ্ডী' বলিয়া চীৎকার করিল। বার্দ্ধক্যের ভারে রামধন কর্ম্মকারের কটিদেশ এখন আর বক্র নহে। বেশ সরল ও সবল দেহে ও কঠিন হস্তে ভীষণ খড়্গোত্তোলন করিল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলে নিস্তব্ধ হইল। কৃষ্ণশঙ্করের একবার চেতনা হইল। তিনি বাহ্য জগতের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিলেন, ভাবিলেন,—"পিতার কি অনির্ব্বচনীয় স্নেহ! এমন বিপদে, এমন দুঃসময়ে তিনি আমাকে যেন অভয় দিতেছেন।"

ঠিক এই সময় উত্তরদিক্ হইতে দুইজন রক্ষকদস্যু দৌড়িয়া আসিল! হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"সর্ব্বনাশ—মহারাজা—হাতী, অশ্ব, সৈন্য।" সকলে চকিত হইল। ভীমসিংহ উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল দস্যুদল উদ্বেলিত হইয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল।

ক্রমে ক্রমে কোলাহল আরম্ভ হইল। হস্তীর আস্ফালনে, বৃক্ষরাজীর সমূল উৎপাটনে, হয়শ্রেণীর পদশব্দে, সৈনিকদিগের চীৎকারে দিক্ পরিপূর্ণ হইল। ভীমসিংহ 'অস্ত্র' বলিয়া চীৎকার করিল। কেহ লইতে সাবকাশ পাইল, কেহ বা দুর্গাভিমুখে পলায়ন করিল। সকলে বিশ্লিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হইল। মহারাজ পূর্ণচন্দ্র নারায়ণগড় অভিমুখে যাইবার জন্য এই সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অরণ্যে পথ হারাইয়া শেষে উগ্রচণ্ডীর মন্দিরসম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দস্যুদলকে দেখিবামাত্র সেনাপতি অমরসিংহ বিগল বাদন করিলেন। কি সৈন্য, কি অশ্ব, কি গজ—সকলে নিস্তব্ধ হইল। তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'অশ্ব—চন্দ্র—অস্ত্র।'

অশ্বারোহী সৈন্যেরা এক লম্ফে এক দিকে গমন করিয়া এক চমৎকার অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ রচনা করিয়া অস্ত্রোত্তোলন পূর্ব্বক দ্বিতীয় আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিনি ব্যূহের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া কহিলেন,

"শুনিয়াছি দুরাত্মা ভীমসিংহ এই অরণ্যে এক বৃহৎ চণ্ডী স্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মের ছলনা করিয়া নরবলি দিয়া থাকে। বোধ হয় আমরা সেই চণ্ডীর সম্মুখীন হইয়াছি। আমি অনেক সন্ধান করিয়াও ভীমসিংহের উদ্দেশ পাই নাই। অদ্য তোমরা সাবধানে যুদ্ধ করিবে এবং কৌশলে তাহাকে জীবিতাবস্থায় ধৃত করিবে।"

দস্যুদলের অর্দ্ধেক দুর্গাভিমুখে পলাইয়াছে। রামধন কর্ম্মকার খড়্গ ফেলিয়া নিকটস্থ অরণ্যে গাত্রাচ্ছাদন করিয়াছে। ভীমসিংহ নিরুপায় হইয়া দেবীর হস্তস্থিত রক্তচন্দনমিশ্রিত শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিয়া মন্দিরের দ্বারদেশে দাঁড়াইল। একটি একটি করিয়া কতকগুলি স্বাধীন নগরের সৈন্য একত্রিত হইল। যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অর্দ্ধ-শিক্ষিত নিরস্ত্র সৈন্য কতক্ষণ শিক্ষিত সৈন্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে? একে একে সকলে ধরাশায়ী হইল। যুদ্ধ অসাধ্য বিবেচনা করিয়া ভীমসিংহ হাতের অসি দুঃখে দূরে ফেলিয়া দিল। ভ্রূকুটী করিয়া কহিল,—"হতভাগার মরণই শ্রেয়;—যাহার কোন আশা সফল হইল না, তাহার জীবনে ধিক্! দেবি! তবে কি জন্মভূমির হিত কামনায় বৃথা এতদিন অক্ষত হৃদয়কে ক্ষত করিয়া স্বশোণিতে তোমার পূজা করিলাম? আজ আমার ও তোমার শেষ দিন। আজ স্বাধীন নগরের শেষ হইল।" এই বলিয়া বজ্রমুষ্টিতে প্রতিমার কেশাকর্ষণ করিল। উগ্রচণ্ডী মড় মড় শব্দে ভূতলে পড়িয়া গেল। নির্ব্বিরোধে ভীমসিংহ অমরসিংহের করায়ত্ত হইল।

সেনাপতি পূর্ণচন্দ্রের নিকট শৃঙ্খলাবদ্ধ ভীমসিংহকে উপস্থিত করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! এই ভীমসিংহ, ইহার প্রবল প্রভাবে এই অরণ্য কম্পান্বিত। পাপাত্মার এতদূর সাহস যে, স্বর্গীয় মহারাজার সহিত একবার যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহাকে পূর্ব্বে কেহ

কখন ধৃত করিতে পারে নাই। অদ্য আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়া সে ধৃত হইয়াছে।” পূর্ণচন্দ্র আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া স্বীয় তরবারি তাঁহাকে পুরস্কার দিলেন। অমরসিংহ নতশির হইয়া বন্দি সহ বিদায় হইলেন।

ভীমসিংহ, রঘুবীর, রামধন কর্ম্মকার, পুরোহিত, উৎফুল্লময়ী প্রভৃতি অনেক দস্যু ধৃত হইল। অমরসিংহ পুরোহিতকে কহিলেন,—“তোমাদের দুর্গ কোথায়, শীঘ্র দেখাইয়া দাও, নহিলে এই তরবারির আঘাতে তোমার মুণ্ড দুইখানা করিব!” বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহাব্যাকুল হইয়া কহিল,—‘বাবা, আমি কিছুই জানি না, এই দুরাচার ভীমসিংহ কহিতে পারে, আমাকে প্রাণে মারিও না—আমি মরিলে আমার দশবর্ষীয়া স্ত্রী পি[illegible] না হইবে।”

অমরসিংহ হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—“পিতৃহীনা—না স্বামী-হীনা—কি বলিতে চাও?”

পু। বাবা,—এত তরবারি দেখিয়া কি আমার আর জ্ঞান থাকিতে পারে?

অ। এখন দুর্গের পথ দেখাইয়া দাও।

পু। এস বাবা এস বলিয়া মনে মনে কহিল—“আজ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মরক্ত দুই পয়সার জন্য গিয়াছিল আর কি! ভীমসিংহ বেটা বড় দুষ্ট, দক্ষিণার বেলা কসাই—আজ গোবধের প্রায়শ্চিত্ত হউক।”

ব্রাহ্মণ উগ্রচণ্ডীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল,—“বাবা, এই কালী,—যে দুর্গা সেই কালী।”

অ। আমি দুর্গার কথা বলি নাই—দুর্গ—দুর্গ।

পু। (মনে মনে) কি আপদ্—দুর্গ আবার কি হইল, দুর্গ কি পুরুষলিঙ্গ—শিবার্থ না কি? (প্রকাশ্যে) বাবা সেপাই, এখানে দুর্গ নাই, মা দুর্গাই একা আছেন।

অ। তোমার মুণ্ড।

পু। আমি অর্থ বুঝি নাই, তবে আজ নরবলি হইতেছিল।

অ। (সচকিতে) নরবলি! কোথায়—শীঘ্র চল।

ব্রাহ্মণ হাড়িকাঠের নিকট এক শবাকৃতি দেখাইয়া দিল। অমরসিংহ তখনই তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন। নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখেন, অল্প অল্প শ্বাস বহিতেছে, কিন্তু চেতনা এককালে নাই। তিনি তখনই তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া হাওদার উপর মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি বিস্ময়ের সহিত কহিলেন,—"সেনাপতি, এ শব কাহার?"

অ। মহারাজ! ভীমসিংহ ইহাকে বলি দিবার জন্য আয়োজন করিয়াছিল। ইহার চেতনা নাই।

"সেনাপতি, ইহার মস্তকে জল সেচন কর, নাসিকার নিকট সুগন্ধ ধর।" এই বলিয়া তিনি স্বয়ং তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে লুপ্ত চেতনা ফিরিয়া আসিল। পূর্ণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?"

কৃষ্ণ। প্রভাবতী!

মহা। প্রভাবতী! প্রভাবতী তোমার কে?

কৃষ্ণ। আমার জীবন।

মহা। প্রভাবতী কোথায়?

কৃষ্ণ। জীবন এই হৃদয়ে!

মহা। প্রভাবতীকে কি দেখিবে?

তিনি চক্ষু মুক্ত করিলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—"প্রভাবতী! আজ তোমার সর্ব্বনাশ—দুরাত্মা ভীমসিংহ আজ তোমার বিবাহ দিয়া জ্বলন্ত আগুনে পোড়াইয়া মারিবে। হাঁ-গা—আপনি কি ক্ষত্রিয়?"

মহা। হাঁ—কেন?

কৃষ্ণ। প্রভাবতী চণ্ডালিনী, তাহার পিতা-মাতার কোন উদ্দেশ নাই। আপনি ক্ষত্রিয় হইয়া কেমন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবেন?

মহা। প্রভাবতী আমার ভগিনী।

কৃষ্ণ। তবে এ সভা কেন? আমি কোথায়?

অম। তুমি রঘুনাথগড়-অধিপতির হাওদার উপরে।

কৃষ্ণ। ভীমসিংহ কোথায়?

অম। বন্দি হইয়াছে।

কৃষ্ণ। দুরাত্মা বন্দি—আমি এখন সুখে মরিব।

হাওদার উপর একপ্রকার অন্ধকার ছিল। দূরের আলোতে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিলেন না। এই জন্য পূর্ণচন্দ্র বলিলেন,—"তুমি কে?"

কৃষ্ণ। হতভাগার নাম কৃষ্ণশঙ্কর।

পূর্ণচন্দ্র একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুইহাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, গদ্‌গদ বচনে কহিলেন,—"প্রাণের কৃষ্ণ, ভীমসিংহ কি তোমার অস্থিচর্ম্ম সার করিয়া শেষে অনাথের ন্যায়, অভাগার ন্যায় উৎসর্গ করিতেছিল?"

কতক্ষণ তাঁহারা কেহই কথা কহিতে পারিলেন না। একজন অপরের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে অমরসিংহ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০—

মিলন।

শঙ্করীর হৃদয়ধনেরা কোথায় রহিয়াছে, কি খাইতেছে, কি করিতেছে, এই সমস্ত চিন্তায় তাঁহার চক্ষে শতধারা বহিত। দিবানিশি হাহাকার করিতেন, কখন কেশ ছিন্ন করিয়া ধূলায় পড়িতেন, কখন বা আত্মঘাতিনী হইবার জন্য উন্মাদিনীর ন্যায় পুষ্করিণীর দিকে ধাবিত হইতেন। সকলে সান্ত্বনা করিয়াও কিছু ফল হইত না। কখন 'কৃষ্ণশঙ্করকে আনিয়া দে'—কখন 'কেশবশঙ্করের নিকট লইয়া চল'—বলিয়া রোদন করিতেন। রাত্রিতে নিদ্রা ছিল না, আহার প্রায় বন্ধ, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহার উপর কঠোর চিন্তা, সুতরাং অচিরে উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। বিনোদিনী পতিপ্রাণা, তবে অমিতভাষিণী বলিয়া স্বামীর সহিত মধ্যে মধ্যে কলহ হইত। কিন্তু এখন স্বামীবিহীনা হইয়া সর্ব্বদাই বলিতেন,—"আর কখন কলহ করিব না, স্বামীকে ঠিক দেবতার মত জ্ঞান করিব, নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীকে সুখী করিব। ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া তাঁহাকে আমার নিকট একবার পাঠাইয়া দাও, আমি চিরদিন তাঁহার পদতলের দাসী হইয়া থাকিব।" তিনি ভবশঙ্করকে সঙ্গে লইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় তুলসীমূলে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেন। মাতার দেখাদেখি ভব তুলসীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত এবং আধ আধ স্বরে কহিত,—"মা, ভাব কেন—বাবা শীগ্‌গির আসিবে।" দুঃখের দিন গজগমনে এইরূপে একটী একটী করিয়া নারায়ণগড়ে চলিতে লাগিল।

আজ শঙ্করীর হৃদয় সর্ব্বাপেক্ষা ব্যথিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে তাঁহার চক্ষে জল ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে এমন বিষাদের তরঙ্গ উঠিয়াছে যে, তিনি ক্রমে চৈতন্য হারাইতে লাগিলেন। বহির্ব্বাটীতে নরেন্দ্রলাল বাবু প্রশান্ত ও নির্ভীক হৃদয়ে বসিয়া আছেন। সম্মুখে টাকার বাক্স মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহার চারিদিকে দুঃখী, কাঙ্গাল হাত বাড়াইয়া সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। কৃষ্ণশঙ্করের অনুদ্দেশাবধি তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন। যেদিন কেশব কারাগারে প্রবেশ করিল, সেই দিন হইতে আহার ব্যতীত অন্যান্য সম্বন্ধ পৃথিবী হইতে দূর করিলেন। দানই তাঁহার বাহ্যিক এবং অহোরাত্র ঈশ্বরচিন্তাই তাঁহার মানসিক ক্রিয়া হইল।

এদিকে শঙ্করীর হৃদয় উদ্বেলিত, আলোড়িত, শেষে ঝটিকা-বিঘূর্ণিত সংক্ষুব্ধ সমুদ্রোচ্ছ্বাসের ন্যায় হইল। যতক্ষণ হৃদয়ে একবিন্দু স্থান ছিল, ততক্ষণ নানা প্রকার প্রলাপ বকিতেছিলেন। কিন্তু যখন স্থান শূন্য হইল, তখন মুখের শব্দ বন্ধ হইল। তিনি উন্মাদের ন্যায় হস্তপদ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমেই অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটিতেছে দেখিয়া পরিজনেরা ব্যস্ত হইয়া নরেন্দ্রবাবুকে সংবাদ দিলেন। তিনি ধীরে ধীরে চলিলেন, ভাবিতে লাগিলেন—"পৃথিবীতে প্রলয় হইলে আমার আর ক্ষতি কি? এ সংসারে ত আমার বলিতে আর কেহ নাই।"

গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, শঙ্করী জ্ঞানশূন্যা, নয়নতারা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, মুখ রক্তিমাকার, সর্ব্বশরীর থরথর কম্পিত হইতেছে। তিনি বুঝিলেন, পা হইতে চুল অবধি তাঁহার শরীরে ভাবের বৈদ্যুতিক ক্রীড়া হইতেছিল। কলসী কলসী জল লইয়া মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। অবশেষে হিমজলের পটী মাথায় বাঁধিয়া দিলেন। পরিজনেরা ব্যজন

আরম্ভ করিল। শরীরের সহিত মনের নিগূঢ় সম্বন্ধ। শরীর শীতল হইবামাত্র মনের উদ্বেগ অৰ্দ্ধেক কমিয়া গেল। শঙ্করী তখন নিদ্রাভিভূতা হইলেন।

নরেন্দ্রবাবু বহির্ব্বাটীর গৃহে বসিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে মহা কোলাহল শুনিয়া অলিন্দে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন—হস্তী, অশ্ব ও সৈনিকে তাঁহার বাটীর প্রাঙ্গণ ভরিয়া গেল। জন্তুদিগের চীৎকারে ও সৈনিকের কোলাহলে তুমুল শব্দোৎপন্ন হইল। কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তথায় উপস্থিত হইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিয়া যায়। প্রতিবাসীরা নিজ নিজ বাটীতে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে দেখিতেছে এবং কেহ ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া দুঃখ করিতেছে; আবার খলপ্রকৃতির দুই চারিজন একটু আনন্দ উপভোগ করিয়া বলাবলি করিতেছে,—"বড় বড় দুই ছেলে গেল, আবার শেষকালে বুড়ের হাতে বুঝি দড়ি পড়িল, এ সকল ত ইংরেজ সরকারের সৈন্য দেখিতেছি, বুড়ের পাপের শেষ নাই। মানুষ মানুষকে ঠকাইয়া ধাম্মিক সাজিতে পারে কিন্তু ঈশ্বর ত আর দানে ভোলেন না, আর হরিনামের ঝুলি দেখিয়া ক্ষান্ত হন না।" বলা বাহুল্য, এই লোকগুলি সর্ব্ববিষয়ে নরেন্দ্রবাবুর নিকট ঋণী, এমন্ কি তিনি আছেন বলিয়া তাহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যাইতেছে।

পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণশঙ্করের হস্ত ধারণ করিয়া উপরে উঠিলেন। সম্মুখে নরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি অবাক্! একজনের কেমন সুন্দর সহাস্য প্রীতি-প্রফুল্ল বদন, কেমন অপূর্ব্ব বেশ-ভূষা, মস্তকে স্বর্ণ-সূত্র-খচিত উষ্ণীষ, গলায় মুক্তাহার; অপরের কঙ্কাল-পর্য্যবসিত দেহ, মুখের শ্রী দূরে থাকুক মুখের মাংস অবধি কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে; তিনি হাসিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মনের হাসি মুখে ফুটিতেছে না। বেশ-ভূষা আছে বটে কিন্তু প্রথমের মত

তেমন পরিপাটী ও পরিচ্ছন্ন দেখাইতেছে না। দুই জনের এত ভেদ সত্ত্বেও উভয়ে কেমন হাতাহাতি করিয়া উপস্থিত হইলেন, কেমন একসঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আজ্ঞার জন্য সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পূর্ণচন্দ্র তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া কহিলেন,—"মহাশয়! ইনিই আপনার বীরপুত্র কৃষ্ণশঙ্কর।" নরেন্দ্রবাবু সেই দ্বিতীয়ার চন্দ্রাবশেষ দেহ চিনিতে পারিলেন। মায়ার নিকট বৈরাগ্য গলিয়া গেল হৃদয়ে মমতার স্রোত বহিল। ভাবে মন পরিপূর্ণ হইল। তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার গলদেশ ধরিয়া অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

বহির্ব্বাটীর কোলাহল শুনিয়া পুরনারীগণ গবাক্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভব 'মা-মা' করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু পশ্চাদ্দিকে চাহিতে বিনোদিনীর অবসর ছিল না। বামা বহির্বাটীতে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু যোদ্ধৃপুরুষদিগের আকৃতি দেখিয়া সত্বর দ্বার রুদ্ধ করিল। বিনোদিনীর নিকট গিয়া বলিল,—"দিদি, আর একটু হইলে প্রাণটা এখনি ক্যাঁক্ করিয়া বাহির হইত।" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"কেন বামা, কি হইয়াছে?" তখন সে ইতিহাস আরম্ভ করিল।

এই সময় একজন যুবতী বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও বিশাল, অথচ সুন্দর। কর্দ্দমাক্ত গোলাপের ন্যায় সৌন্দর্য্য ছিন্ন ও মলিন বসন হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। চক্ষু আয়ত ও রক্তিম। চক্ষুর উভয় পার্শ্ব যেন একটু স্ফীত। তাঁহার ভ্রমরনিন্দিত সুদীর্ঘ কৃষ্ণ-কেশ আলুথালু হইয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। বিষাদের কালিমায় যেন মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন।

এত অশ্ব, এত গজ, এত সৈনিক দেখিয়াও তাঁহার মনে ভীতির সঞ্চার হয় নাই। কোন দিকে মন নাই। ভাব দেখিয়া বোধ হয় যেন ভীমা বামা উন্মাদিনী। তিনি নরেন্দ্রবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলে, সৈনিকেরা যেন ভীত, চমকিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে লাগিল। পথ রোধ করিতে বা অযথা অসহায়িনীকে ব্যঙ্গ করিতে কাহারও পা উঠিল না, বা মুখ ফুটিল না। তিনি সিঁড়ির নিকট আসিয়া একজন সৈনিককে কহিলেন,—"নরেন্দ্রলালবাবু কোথায় ?" সিপাহীর হৃদয় অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। কথা বাহির হইল না কেবল অঙ্গুলি বাড়াইয়া ঊর্দ্ধদিকে দেখাইয়া দিল। তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন।

পূর্ণচন্দ্র উপর হইতে সেই বীরপ্রতিমা দেখিয়া নিম্নে আসিতে-ছিলেন, এখন সিঁড়িতে আসিয়া পথাবরোধ করিয়া, মনে মনে ভাবি-লেন,—"সেই অপরিস্ফুটা, অপ্রাপ্তযৌবনা, ক্ষীণা প্রভাবতী কি এই ?" তিনি যতই তাহার মুখ দেখিতে লাগিলেন, ততই সেই ব্যাঘ্রহন্তা শশধর বাহাদুরের মুখ মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যেন দুইটী মুখ এক ছাঁচে ঢালা। প্রভাবতী গম্ভীর স্বরে বলি-লেন,—"আপনি যে কেন হউন না—আমার পথ ছাড়ুন, অপরের এক মুহূর্ত্ত আমার এক যুগ।" তিনি মৃদু স্বরে বলিলেন,—"তুমি এমন বেশে, এমন ভাবে কোথা হইতে আসিতেছ ?" 'তুমি' কথাটি প্রভার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। তাঁহার ভাল বোধ হইল না; সেইজন্য বুঝি বলিলেন,—"অবলা বলিয়া দুর্ব্বলার ন্যায় ব্যবহার করিবেন না।" পূর্ণচন্দ্র হাসিতে হাসিতে উষ্ণীষ ও হার ভূমে ফেলিয়া দিলেন। সস্নেহে কহিলেন,—"প্রভা, তুমি উন্মাদিনী—একবার

মুখ তুলিয়া দেখ ত, আমার সহিত তোমার লড়াই করিতে ইচ্ছা হয় কি ?"

সেই মধুর স্বর, সেই সস্নেহ ভাব, সেই মিষ্ট সম্ভাষণ, সেই সুন্দর দেহ দেখিয়া ও শুনিয়া প্রভা হতবুদ্ধিপ্রায় হইলেন। পূর্ণচন্দ্র কহিলেন,—"ভগিনী, আমাকে চিনিতে পার নাই ?" প্রভা 'দাদা" উচ্চারণ করিয়া নির্ব্বাক হইলেন। অভূতপূর্ব্ব ভাব আসিয়া কণ্ঠরোধ করিল। সে ভাব অনির্ব্বচনীয়, তাহা মুখে বাহির হইল না। পূর্ণচন্দ্র বলিলেন,—"এমন বেশে, এমন ভাবে কোথা হইতে আসিতেছ ?" "দাদা, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এ সংসারে আমার কেহই নাই। আমি ভিখারিণী—অনাথিনী",—গঙ্গায় যেন বন্যা আসিল। হৃদয়স্রোত উথলিয়া উঠিল। কথা বন্ধ হইল। অবিরল চক্ষু হইতে জল ঝরিতে লাগিল। তিনি কহিলেন,—"প্রভা, এ জগতে তোমার সকলই আছে, একদণ্ড বিশ্রাম কর, দেখিবে এই অন্ধকারময় অদৃষ্ট-আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র একটি একটি করিয়া প্রকাশ পাইবে।" এই সময় বাম হস্ত হইতে প্রভার একখানি পত্র পড়িয়া গেল। পূর্ণচন্দ্র তুলিয়া লইলেন। তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"দাদা, ও চিঠি তুমি পড়িও না।"

"আমি ত সকলই জানি, কৃষ্ণজীবন ত সকলই আমাকে বলিয়াছেন, তোমার কোন ভয় নাই ?"

কৃষ্ণজীবনের নাম শুনিয়া প্রভা শান্ত হইলেন ; বুঝিলেন, তবে একদিন না একদিন দুঃখের অবসান হইবে। পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে শিবিরে লইয়া গেলেন।

আর বিস্তারিত করিয়া এই পরিচ্ছেদ লিখিবার আবশ্যক নাই। নারায়ণগড় আনন্দময় হইয়া উঠিল। নরেন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণভোজন ও দানে ব্যস্ত হইলেন। আশুতোষবাবু উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণশঙ্করকে

ঔষধ ও উপযুক্ত পথ্য সেবন করাইলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার পূর্ব্ব-স্ফূর্ত্তি, পূর্ব্বলাবণ্য, পূর্ব্বসাহস ও বীর্য্য ফিরিয়া আসিল। পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণ-জীবনের পলায়নের কারণ নরেন্দ্রবাবুকে বিবৃত করিয়া নিজের ও প্রভার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং কহিলেন,—"আপনার অনুমতি হইলে কৃষ্ণজীবনকে সঙ্গে লইয়া রঘুনাথগড়ে গমন করিতে পারি এবং আপনার সমক্ষে আমার অনিন্দ্যসুন্দরী ভগিনী প্রভাকে বাল্যসহচর স্বাধীনচেতা কৃষ্ণশঙ্করকে সম্প্রদান করিতে পারি।"

প্রভা রাজার কন্যা, জাতিতে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের বাটীতে প্রতিপালিতা, যৌবনের ও রূপের প্রতিমা। এমন লক্ষ্মীকে কি পুত্রবধূ করিতে অনিচ্ছা করে? সর্ব্বান্তঃকরণে নরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সম্মতি প্রদান করিলেন তাঁহারা এত সুখী হইয়াছিলেন যে, স্ত্রী-পুরুষে অভি-ষেকের সময় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পূর্ণচন্দ্র আশুতোষ বাবুকে তাঁহার রাজ্যের সার্জ্জন জেনারেল নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন আশু বাবু সস্ত্রীক রঘুনাথগড়ে মহাসমারোহে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অভিষেক।

আজ পূর্ণচন্দ্রের অভিষেক। উইলের মর্ম্মানুসারে বিবাহান্তে অভিষেক হওয়াই মৃত মহারাজার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সম্মুখে মলমাস প্রবৃত্ত মহারাণী, মন্ত্রী অযোধ্যানাথ ও রাজস্বসচিব রমানাথের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহের পূর্ব্বেই অভিষেকের প্রস্তাব করিলেন। রাজ-কর্ম্মচারী ও প্রজাবর্গ এই কথা শুনিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। রমানাথ রেসিডেণ্ট সাহেবের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসিলে, তিনি আগ্রহের সহিত অনুমোদন করিলেন। সুতরাং অবাধে কমলকুমারীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

রাজপ্রাসাদ আনন্দময়। শারদীয় পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী জাহ্নবীর ন্যায় রাজবাটীর উল্লাস উথলিয়া উঠিতেছে। চারিদিকে নহবত বাজিতেছে, সুমধুর স্বরে সঙ্গীত হইতেছে, নৃত্যকরী স্থানে স্থানে নৃত্য করিয়া ও অঙ্গচালনার দ্বারায় দর্শকের মন হরণ করিতেছে। রাজ্যের সমুদায় সম্ভ্রান্তলোক একত্রীভূত হইয়া সভা সমুজ্জ্বল করিতেছেন। প্রতি গৃহদ্বার পুষ্পমালায় বিভূষিত ; তোরণে হৈমধ্বজা সগর্ব্বে আকাশে উড্ডীন হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে বোম গর্জ্জিয়া উঠিতেছে ; পশুশালা, নন্দন-কানন, বিলাস-ভবন, দেবালয়, আজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নাই। রাজার ইচ্ছায় কৃষক হইতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছে। আজ রাজবাটীর সিংহদ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত।

আজ প্রতিহারীগণ ভীষণ মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক সকলের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

বেলা দশটা। রাজসভা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে। ঊর্দ্ধে বিচিত্র চন্দ্রাতপ মুক্তাহারে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ নরেন্দ্রবাবুকে সম্মুখে করিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। এমন সময় মহারাজ পূর্ণচন্দ্র রাজ-পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া, হস্তে ধনুঃ পৃষ্ঠে তূণ, কটিতটে তরবারি ধারণ পূর্ব্বক সভাগৃহে আগমন করত সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দক্ষিণদিকে ব্রিটিশ-গবরমেণ্টের প্রতিনিধি মেজর গর্ডন, রেসিডেণ্ট কাপ্তান লুইস, সেনাপতি অমরচন্দ্র, সহকারী সেনাপতি অর্জ্জুনকৃষ্ণ, বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি সামরিক বিভাগের প্রধান প্রধান ব্যক্তি আসন পরিগ্রহ করিলেন। বামে মন্ত্রী অযোধ্যানাথ, উৎকল রাজপ্রতিনিধি রণবীর ও অন্যান্য অনেক রাজপুরুষ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পূর্ব্বভাগে বিচিত্র বস্ত্রগৃহ। তদভ্যন্তরে রাজ্ঞী কমলকুমারী, প্রভাবতী, শরৎসুন্দরী, ব্রজসুন্দরী, যোগেশ্বরী, শঙ্করী, পদ্মমুখী প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর ও ভূম্যধিকারীর পুরস্ত্রীগণ অনিমেষ নয়নে কখন রাজা, কখন সভা দর্শন করিতেছিলেন।

ঋষিশ্রেষ্ঠ হৃষীকেশ গাত্রোত্থান করিয়া মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া মহারাজার মস্তক স্পর্শ করিয়া সংস্কৃত শ্লোকোচ্চারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা করযোড় করিয়া মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাজগুরু সস্মিতবদনে বলিলেন,— "মহারাজ! একদিন এই পবিত্র মুখশ্রী দর্শন করিয়াই বুঝিয়াছিলাম যে, এতদিন পরে এই রাজাশূন্য রাজ্যে মহানুভব ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাই ঠিক হইল। এক্ষণে ধর্ম্মসাক্ষাতে রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় রাজ্যশাসন করুন।" মন্ত্রী অযোধ্যানাথ দণ্ডায়মান

হইয়া স্বর্গীয় রাজার উইল সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। পরে মেজর গর্ডনের অনুমতি লইয়া তাঁহার মস্তকে স্বর্ণ মুকুট, গলদেশে গজমুক্তার হার, হস্তে রাজদণ্ড প্রদান করিয়া বলিলেন,—"অদ্য স্বর্গীয় মহারাজার সুযোগ্য কুমার পূর্ণচন্দ্রের হস্তে এই শাসনভার ন্যস্ত হইল। মহারাজ! ন্যায়বিচারে, অসংখ্য প্রজাদিগকে সংরক্ষণ করুন।"

অনন্তর গর্ডন মহোদয় গাত্রোত্থান করিয়া ভারতের তৎকালীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিলেন। পত্রে এই লেখা ছিল :—

"মহারাজ বাহাদুর!

এতদিন পরে রঘুনাথগড়ের শূন্য সিংহাসন পূর্ণ হওয়াতে আমি যার পর নাই সুখী হইয়াছি এবং আমার প্রতিনিধি স্বরূপ মেজর গর্ডন আপনাকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় করাইবেন। স্বর্গীয় মহারাজ শশধর রাও বাহাদুর আমাদিগের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি সর্ব্ব সময়ে মহারাষ্ট্রীয় তস্করদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া আমাদের ও নিজের রাজ্যের প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহারাজ! স্বর্গীয় পিতার ন্যায় উদারস্বভাবসম্পন্ন ও প্রজাবৎসল হইয়া ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যের দ্বারা রাজ্য শাসন করুন। আমরা সকল সময়ে আপনার যথোচিত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

পাঠ সমাপনান্তে গর্ডন বাহাদুর যৎকিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিয়া নাইট উপাধির নিদর্শন স্বরূপ মণিমুক্তা-খচিত এক অপূর্ব্ব ষ্টার ও এক স্বর্ণ-মেডেল তাঁহার বক্ষে ঝুলাইয়া দিলেন।

রাজা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"মেজর গর্ডন, মন্ত্রী অযোধ্যানাথ ও নাগরিকগণ! আজ আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি যে, নিজের সুখ উপেক্ষা করিয়া প্রজার

সুখবৰ্দ্ধনই আমার প্রধান কার্য্য হইবে। ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য চিরদিনই থাকিবে এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আমার রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে তৎপর থাকিব। প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে ঈশ্বর আমাকে শক্তি দিন, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।"

এই সময়ে একশত বোম গর্জ্জিয়া উঠিল। একশত কারাবাসী মুক্ত হইল। একশত ব্রাহ্মণ একশত দুগ্ধবতী সবৎসা গাভী লাভ করিলেন। এক সঙ্গে চারিদিকে নহবত বাজিয়া উঠিল। অশ্বারোহী-গণ ক্রীড়াক্ষেত্রে ঘোটকের উপর অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। সামরিক বাজনা আরম্ভ হইল। নাট্যশালায় নর্ত্তকী নৃত্য ও গায়কী সময়োচিত গীত আরম্ভ করিল :—

গীত।

১

জয় মহারাজ! জয় জয় আজ—প্রকৃতি আপন-হারা,
(তব) টুটিল কালিমা, ভাতিল গরিমা,—বরিষ অমৃত-ধারা।
নগরে নগরে বাজিছে বিষাণ,
প্রতি গৃহ-চূড়ে উড়িছে নিশান,
অম্বরে নব গৌরব তব গর্ব্বে ধ্বনিয়া যায়,
সৌরভ তব সমীরণ সাথে, আনন্দে মাতিয়া ধায়।

২

ওই পুরনারী উল্লাস-মগনা বাজায় শঙ্খ হর্ম্ম্যে,
আজি মঙ্গল গীতি, তোমার আরতি পশিছে প্রজার মর্ম্মে।

ঘন অন্ধকারে ধ্রুব তারা মত,
উজলিয়া দিশি বিরাজ নিয়ত ;
জয় মহারাজ ! জয় জয় আজ—প্রকৃতি আপন-হারা,
(তব) টুটিল কালিমা, ভাতিল গরিমা,—বরিষ অমৃত-ধারা ।

হ'ক্ প্রচারিত তোমার রাজ্যে নূতন ধর্ম্ম, শিক্ষা,
হউক পূর্ণ তোমার আলোকে ভূলোকে নবীন দীক্ষা,
চন্দ্রমা-শালিনী মধু-নিশীথিনী
দিয়াছে মুছায়ে অতীত কাহিনী ;
জয় মহারাজ ! জয় জয় আজ—প্রকৃতি আপন-হারা,
(তব) টুটিল কালিমা, ভাতিল গরিমা,—বরিষ অমৃত-ধারা

শূন্য সিংহাসন পূর্ণ এতদিনে বিকসি কনক ভাতি,
ধন্য বিধাতঃ তোমার করুণা, ধন্য তোমার নীতি।
বিরাজ সৌম্য ! পুণ্য আসনে,
নূতন রতনে, নূতন ভূষণে ;
জয় মহারাজ ! জয় জয় আজ—প্রকৃতি আপন-হারা,
(তব) টুটিল কালিমা, ভাতিল গরিমা,—বরিষ অমৃত-ধারা ।

সঙ্গীতে দর্শক ও শ্রোতৃবর্গ মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। চারিদিকে আহারের আয়োজন হইতে লাগিল। মহারাণী কমলকুমারীর অনুগ্রহে মহাকালীর মন্দিরে, রঘুনাথের বাটীতে ও রাজপ্রাসাদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে

সহস্র সহস্র দরিদ্র লোকদিগকে প্রভূত অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন ও অর্থে পরিতৃপ্ত করা হইল।

অদ্য অপরাহ্ণে সভাসদ্-বেষ্টিত হইয়া রাজা মন্ত্রণাগৃহে উপস্থিত হইয়া শাসন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিলেন; এবং সভাসদ্গণকে তাঁহার অভিপ্রেত সমুদয় বিষয় আহরণ করিতে বলিয়া, মেজর গডন ও কাপ্তান লুইসের অট্টালিকাতে গমন করিয়া নানা কথায় সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।
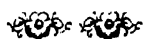
অদ্য মহারাজা পূর্ণচন্দ্র হৈম-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া দস্যুদিগের বিচার আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রী অযোধ্যানাথ ও অমরসিংহ যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। সেনাপতির অনুমতি লইয়া, জনৈক কর্ম্ম-চারী শৃঙ্খলাবদ্ধ ভীমসিংহ, রঘুবীর সিংহ, উৎফুল্লময়ী প্রভৃতি দস্যুগণকে সভাগৃহে আনয়ন করিল। মহারাজ কতক্ষণ অনিমেষ নয়নে রঘুবীর, উৎফুল্লময়ী ও ভীমসিংহের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে প্রথম ব্যক্তিকে কহিলেন,—"তোমার নাম কি?"

রঘু। আমার নাম রঘুবীর সিংহ।

মহা। তুমি কি ভীমসিংহের একজন অনুচর?

রঘু। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।

মহা। যদি তোমার কিছু বক্তব্য থাকে বলিতে পার এবং কেন তোমার প্রাণদণ্ড হইবে না তাহাও প্রদর্শন কর।

রঘু। মহারাজ,—বিশেষ কিছু বলিবার নাই। আজ আঠার বৎসর হইল, ভীমসিংহ কর্ম্মক্ষেত্রে সেনাপতি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার কি উদ্দেশ্য, তাহা আমার বলিবার অধিকার বা আবশ্যক নাই। উদরপূর্ত্তির জন্য আমরা নিরন্তর দস্যুবৃত্তি করিয়াছি, এবং ব্যাধ যেরূপ পক্ষীগণকে ফাঁদে ধৃত করে, আমরাও সেইরূপ নানাস্থানে কৃত্রিম

রাস্তা প্রস্তুত করিয়া ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া পথিকদিগকে উগ্রচণ্ডীর মন্দিরে আনিয়া ধন লুণ্ঠন করিতাম। একদা স্বর্গীয় মহারাজা শশধর বাহাদুর বৈতরণীকূলে শিবির সন্নিবেশিত করেন। আমরা তখন অনতিদূরেই বনমধ্যে অপেক্ষা করিতেছিলাম। যখন শুনিলাম যে, তিনি মৃগয়া করিতে পূর্ব্বঘাটে চলিয়া গিয়াছেন, এবং দুর্য্যোগে রাত্রিতে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তখন সুযোগ বুঝিয়া শিবির আক্রমণ করিয়া মহারাজার কন্যাকে অপহরণ করিলাম। রাণীর সহচরী সুলোচনাকে আমি চিনিতাম, কারণ বাল্যকালে আমি আমার মাতার সহিত রাজ-অন্তঃপুরে গমন করিতাম। রাণীর উপরে আমার অচলা ভক্তি পূর্ব্ব হইতেই ছিল। সেনাপতি ভীমসিংহ রাজাকে সকার্য্য-সাধনে নিয়োজিত করিবার অভিপ্রায়ে, রাণীকে ধৃত করিবার অনুমতি প্রদান করেন। আমি বুঝিতে পারিয়া সুলোচনাকে ইঙ্গিত করিয়া আসি। তাহাতেই বোধ হয়, রাণী পরিচারিকা-বেশ ধারণ করিয়া কোনক্রমে অব্যাহতি পান। রাজকন্যার নাম প্রভাবতী। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম চারি বৎসর মাত্র। তাঁহাকে হরণ করিয়া আমরা নিশীথ সময়ে নারায়ণ-গড়ের জমিদার নরেন্দ্রলাল বাবুর বাটীতে প্রতিপালনের জন্য রাখিয়া আসি। সেই হইতে প্রতি দুই মাস অন্তর, একবার করিয়া গোপনে প্রভাবতীকে দেখিয়া আসিতাম। মহারাজার স্মরণ থাকিতে পারে, একবার স্বয়ং নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে গৌরমোহন বাবুর গড়ের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন -”

মহা। (সবিস্ময়ে) সে কি তুমি ?

রঘু। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ। এই অভাগা সেই সময় মহারাজাকে প্রবোধ দিতে বাধ্য হইয়াছিল।—ইহার পর শ্যামনারায়ণের স্ত্রীবিয়োগ হইলে তাহার সহিত প্রভাবতীর বিবাহ দিবার জন্য ভীমসিংহের অভি-

লাষ হইয়াছিল। দুঃশীলা উৎফুল্লময়ী এই বিবাহের ঘটিকা। কিন্তু অকালে স্বর্ণপ্রতিমাকে জ্বলন্ত অনলে বিসর্জ্জন দিতে আমার অন্তরে দারুণ কষ্ট হইল। আজ কাল করিয়া আমি এই পর্য্যন্ত তাঁহাকে অবিবাহিতা রাখিয়াছি। বিশেষতঃ কৃষ্ণশঙ্কর বাবুর সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মিয়াছে, এই কথা শুনিয়া অবধি, আমি সর্ব্বপ্রকারে ভীমসিংহের অভি-প্রায়কে অসিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম।

মহারাজ! এক গর্হিত কার্য্যের কথা এখন অবধি বলি নাই। সে অপরাধের জন্য, প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেও আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। আমি অকারণে বীরপ্রতিম কৃষ্ণশঙ্করকে অন্যায় ও অধর্ম্ম যুদ্ধে ধৃত করিয়া অকারণ যম-যাতনা প্রদান করিয়াছি। তবে অন্যায় যুদ্ধ স্থানবিশেষে প্রয়োজনীয় ও স্বকার্য্য সাধনের কারণ স্বরূপ।

কৃষ্ণশঙ্কর গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন,—"রঘুবীর, তোমার গুণেই আমি এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছি। আমার অদৃষ্টে কষ্ট ছিল, তাহার জন্য তুমি দায়ী নহ, তোমার উপর আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই।"

এই সময় প্রভাবতী স্বগত বলিতে লাগিলেন,—"এই কি সেই ছায়া—নিশীথ সময়ে সেই নির্জ্জন পুরীর গবাক্ষ পথে আমাকে চমৎকৃতা করিয়াছিল?"

পূর্ণচন্দ্র কহিলেন,—"রঘুবীর, তুমি দস্যু হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছ, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তোমার গুণের শেষ নাই। দস্যু-চর্ম্মে সাধুর মন আচ্ছাদিত। এই সভাস্থ সমস্ত লোক তোমার গুণের পক্ষপাতী। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। অধিকন্তু আজ হইতে তোমার পঞ্চশত মুদ্রা বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত রহিল এবং ইচ্ছা করিলে আমার সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে পারিবে।"

দৌবারিক শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া দিলে, রঘুবীর মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া অদূরে দাড়াইয়া রহিল।

মহারাজ পূর্ণচন্দ্র ভীমসিংহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—“ভীমসিংহ, অনুগ্রহের প্রার্থী হইলে জীবনের আমূল কথা সত্য করিয়া বল।”

ভীমের সাড়ে চারি হস্ত উন্নত শরীর সভাস্থ সকল লোকের লক্ষ্য হইয়াছিল। সেই প্রশস্ত বক্ষঃস্থল, সেই গম্ভীর ভয়ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল, বিশাল উরু ও হস্ত সেই সময় এক চমৎকার ভাব প্রকাশ করিতেছিল। অমর ও অর্জ্জুনসিংহ সেই বিশাল দেহ দেখিয়া মনে মনে কতই প্রশংসা করিতেছিলেন। তাহার ন্যায় সবলকায়, মহারাজার সৈনিক বিভাগে একজনও ছিল কি না সন্দেহ।

ভীমসিংহ ঈষৎ গর্ব্বিত, অথচ শান্ত ও গম্ভীর বচনে কহিল,—“মহারাজ! যে দিন উগ্রচণ্ডীর সম্মুখে হস্তের অসি পরিত্যাগ করিয়াছি, সেই দিন হইতে আমার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন আমি মৃত মনুষ্য, ইচ্ছা হইলে আমাকে খণ্ড খণ্ড করিতে পারেন, অথবা জ্বলন্ত অঙ্গারে এই দেহ দগ্ধ করিতে পারেন। আমার অনুগ্রহ লাভের ইচ্ছা বা জীবনের সাধ নাই।

মহা। ভীমসিংহ, তোমার সহিত তর্ক করা নীতিবিরুদ্ধ, কারণ তুমি দস্যু; নতুবা কহিতাম, জীবনের সদুদ্দেশ্য থাকিলে কি এখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না?

ভীম। আমি সকল সহ্য করিতে পারি, কিন্তু মহারাজ আমাকে দস্যু বলিয়া সম্বোধন করিবেন না। আমি দস্যু নহি। আমার উদ্দেশ্য মহৎ। যে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য নাই, যে সময়ে আহার করে, সময়ে নিদ্রা যায়, সন্তান সন্ততি পালন করে, তাহাকে আমি মনুষ্য মধ্যে

বিবেচনা করি না। তিনি রাজা হউন, প্রজা হউন, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন মানুষ পশুর সমান। জীবনের উদ্দেশ্যই মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের লক্ষণ।

মহা। এ জীবনে সকলেরই উদ্দেশ্য আছে, কাহার নাই? তবে সকলেই যে রাজা হইবে, কি বিদ্বান্ হইবে, কি যোদ্ধা হইবে বা পণ্ডিত হইবে, তাহা অসম্ভব।

ভীম। মহারাজ! আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি বন্দি—নির্ভয়ে সকল কথা বলিতে আমার ক্ষমতা নাই, নতুবা—

মহা। আমার প্রশ্নের উত্তর তুমি নির্ভয়ে ও স্বাধীনভাবে দিতে পার।

ভীম। জীবনের উদ্দেশ্য অতি অল্প লোকেরই আছে। যদি তাহাই থাকিবে, তবে পৃথিবীর এ দুর্দ্দশা হইত না। অধিকাংশ লোক উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া কেবল পশুর মত স্বার্থ সাধন করিয়া শেষে অনন্ত কালে মিশিয়া যায়। তাহারা কাহার কোন্ উপকারে আইসে? না দেশের, না প্রতিবেশীর, না মনুষ্যের কোন কর্ম্ম সাধন করিতে পারে? তবে কি দ্বিপদ ও চতুষ্পদে কেবল গঠনের প্রভেদ? তবে কেন মনুষ্য পৃথিবীর উপর আধিপত্য করিবে? তবে কেন মনুষ্যের ভয়ে সংসার কম্পিত হইবে? স্বার্থ! স্বার্থ!—তবে কি সংসারে অকিঞ্চিৎকর স্বার্থই মনুষ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে? এমন মনুষ্যজীবনে প্রয়োজন কি? মহারাজ, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য মহৎ না হইলে কি জাতীয় উন্নতি হইতে পারে? যদি প্রত্যেক হিন্দুর তাহা থাকিবে, তবে কেন হিন্দুকুলগৌরব ভারত হইতে চলিয়া যাইবে? দিন দিন এই জাতি ক্ষীণকলেবর ও ক্ষীণ-প্রাণ হইয়া মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হইবে? যে হিন্দু ত্রিভুবনে ধর্ম্ম, বিদ্যা ও গুণের জন্য একদিন আধিপত্য লাভ করিয়াছিল, আজ তাহার সে রাজত্ব

কোথায় অন্তর্হিত হইল? একদিন হিন্দুস্থানে মনুষ্যের মহান্ উদ্দেশ্য ছিল; সেই জন্য মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ মাধবচন্দ্র রাও রাজগুরু শশাঙ্ক-শেখরের সাহায্যে এই স্থানে রাজ্যস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন; মহাত্মা শিবাজীর মহান্ উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া ওরংজেবের পতাকা ছিন্ন করিয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন; পশুপালিকা জোন আর্কের মহদুদ্দেশ্যেই ফরাসি সেনা বিজয়ী হয়। জীবনের উদ্দেশ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে কাহারও অধীনতার শৃঙ্খল কর্ত্তন, কাহারও সমাজ সংস্করণ, কাহারও ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণ, কাহারও বা দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করা জীবনের উদ্দেশ্য। এই এক এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতে শিবাজী, মনু, রামমোহন, চৈতন্য, বেদব্যাস, কর্ণ ও অহল্যাবায়ের জন্ম হইয়াছিল।

মহা। ভীমসিংহ, তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?

ভীম। বঙ্গে স্বাধীনতার স্রোত প্রবর্ত্তিত করাই আমার জীবনের ব্রত ছিল।

মহা। তোমার উদ্দেশ্যকে আমি সম্পূর্ণরূপে নিন্দা করি। একটু আলোচনা করিয়া দেখিলেই এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম হইবে। যখন দিল্লীতে মোগল রাজ্যে সমূহ বিশৃঙ্খল উপস্থিত হইল, যখন আলিবর্দ্দি খাঁর পরে বঙ্গে উপযুক্ত শাসনকর্ত্তার অভাব জন্মিল, যখন সেরাজউদ্দৌলার মন্ত্রিগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল, হিন্দু ও মুসলমান কর্ম্মচারিগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নবাবকে অতিক্রম করিয়া প্রজাদিগের রক্তশোষণ আরম্ভ করিল, যখন পাঠানেরা চারিদিকে অত্যাচার আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা পাইল, যখন মহারাষ্ট্রীয় তস্করেরা শাসনের ভাণ করিয়া বঙ্গে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার গর্হিত উপায়ে চৌথ আদায় করিতে লাগিল, ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগ্যাল, হলাণ্ড, দেনমার্ক দেশের বণিক্‌গণ নানাস্থানে

নানাভাবে ভারতের অর্থ অপহরণ করিতে লাগিল, তখন ইংরেজগণ কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বাহু ও বুদ্ধিবলে রাজ্য গ্রহণ করিয়া অতি প্রকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়া শাসন আরম্ভ করিলেন। প্রথম সময়ে অর্থানটন নিবন্ধন দুই একস্থানে ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অর্থ সং-গ্রহ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল; কিন্তু যেমন আয়ের পথ উন্মুক্ত হইল, অমনি সকল প্রকার ন্যায়ানুমোদিত কার্য্যও আরম্ভ হইল। 'ভারতের হিতের জন্য ভারত সাম্রাজ্য'—এই সত্য অবলম্বন করিয়া শাসন আরম্ভ করিলেন। এই নীতির ফলে দেখা যাইতেছে যে, সকল স্থানে সকল প্রকারের অত্যাচার কেমন ধীরে ধীরে কমিয়া যাইতেছে, দিন দিন বিদ্যা-শিক্ষা বিস্তারিত হইতেছে, যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত হইতেছে, একমাসের পথ একদিনের হইতেছে, সহস্র যোজনের সংবাদ নিমিষে আসিতেছে, নির্ব্বিঘ্নে সমুদয় পৃথিবী বিচরণের কি সুবিধা হইয়াছে। শাসন কাহাকে বলে, ভারতবাসী তাহা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করি-য়াছে। প্রজার স্বত্ব কি, তাহা ইংরেজশাসনে ভারত প্রথম বুঝিতে পারিল। এখন ইংরেজ ভারত হইতে চলিয়া গেলে, কবি যে বলিয়াছেন "তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" পতিত হইয়া অন্ধের ন্যায় বিচরণ করিবে।

যে ইংরেজ প্রভূত প্রতাপে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া-ছেন, আজ তুমি কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দস্যুর বেশে অশিক্ষিত একমুষ্টি সৈন্য লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছ? উদরপূর্ত্তির জন্য নিরন্তর দস্যুতা করিতেছ এবং আবশ্যক হইলে গুপ্তস্থান হইতে কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীদিগকে বিনাশ করিতেছ? তাহার ফল এই হইতেছে যে, অধর্ম্মস্রোতে ভারত রসাতলে যাইতেছে। মনে রাখিও, কর্ম্মমূলে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে, কখনও কোন জাতি

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। হিন্দুকুলগৌরব রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া যেরূপ অস্থিরতা দেখাইতেছ, মনে থাকে যেন, সে কুল-গৌরব কেবল ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যায়ী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, লোভহীন, হিংসাশূন্য, স্বার্থত্যাগী, অরণ্যবাসী ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া নিরন্তর ধর্ম্ম ও নীতি অযাচিত ভাবে রাজা ও প্রজাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে চারিবর্ণ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এখন তাহার পরিবর্ত্তে আমরা স্বার্থপর, মিথ্যা-বাদী, বিদ্যাহীন, ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন, লোভী ও অসংযমী হইয়া রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় ম্লান হইয়াছি। যদি ভারতের গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা কর, তবে একপ্রাণ হইয়া দ্বেষ হিংসা ত্যাগ করত ইংরেজ-দিগকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের তেজস্বিতা, উদারতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা অনুকরণ কর, দেশের লোক একত্র হইয়া যৌথ কারবার দ্বারা দেশে ধনা-গমের চেষ্টা কর, সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর কর, দিন দিন শিক্ষার বিস্তার কর ; কৃষ্ণ, চৈতন্য,নানক, তুলসীদাস যে ভাবে সকল শ্রেণীর লোকদিগকে ভালবাসিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে সকল সম্প্রদায়ের লোককে আপনার বলিয়া গ্রহণ কর, হিন্দু ও মুসলমানে একমত ও একপ্রাণ হইয়া এক উদ্দেশে চলিতে থাক। তোমার মত লোক জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া, যদি এইরূপ জাতীয় গঠনরূপ মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে পারে, তবে বুঝিব যে তোমার উদয়ে ভারত ধন্য হইল। একেইত অধর্ম্মস্রোতে ভারত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার উপর হত্যা ও দস্যুতাকে প্রশ্রয় দিয়া জাতীয় জীবনকে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর করিলে, সে জাতি আর কতদিন পৃথি-বীতে তিষ্ঠিতে পারে ?

মহারাজ পুনরায় কহিলেন,—"ভীমসিংহ, এখন বল কি কারণে তুমি প্রভাবতীকে অপহরণ করিয়াছিলে ?"

ভীম। মহারাজ! যখন আমার বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, তখনই আমার জীবনের উদ্দেশ্য স্থির হয়। তখন আমি উৎকলের রাজার একজন সুবেদার ছিলাম। বংশপরম্পরাগত উৎকল রাজপুত্রগণ অকর্ম্মণ্য ও নির্জ্জীব। আমার মহদুদ্দেশ্য মহারাজার কাণে উঠিবামাত্র, আমাকে তাঁহার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। শুনিয়াছিলাম, রাজা শশধর রাও বড় বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি স্বহস্তে যোড়শ বৎসরে প্রচণ্ড ব্যাঘ্রকে বিনাশ করেন। আমি সাহসে ভর করিয়া রঘুনাথগড়ে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার অবয়ব দৃষ্টে বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সন্ধ্যাকালে আমাকে আহ্বান করিয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমগ্র প্রদেশে কি বাহুযুদ্ধে, কি তরবারি সঞ্চালনে, কি ঘোটকারোহণে কেহই তাঁহাকে কখন পরাস্ত করিতে পারে নাই। আমি কি সুযোগে বলিতে পারি না, মহারাজাকে পরাজিত করিলাম; কিন্তু নিজের নিগুর্ণতা বুঝিয়া তাঁহার চরণধূলি মস্তকে অর্পণ করিলাম। সেই দিন হইতে আমি তাঁহার প্রিয় হইলাম। আমাকে তিনি তাঁহার শরীররক্ষক নিযুক্ত করিলেন। প্রতিদিন মল্লযুদ্ধ হইত, কখনও বা তরবারি লইয়া খেলা করিতাম, তাহাতে হয় তিনি হারিতেন, না হয় আমি হারিতাম, বা উভয়ে সমান হইতাম। একদিন অমাবস্যার রাত্রে তিনি মহাকালীর পূজা করিয়া উঠিয়া আসিতেছেন, এমন সময় আমি কহিলাম,—"মহারাজ এই পূজার কি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে?" তিনি কহিলেন,—"ভক্তি ভিন্ন কিছুই নাই।" আমি কহিলাম,—"রাজগুরু শশাঙ্কশেখর এই স্থানে কালী স্থাপন করিয়া, পরে স্বাধীনরাজ্য স্থাপন করেন, মহারাজার সেই বীর পুরুষের অনুসরণ করিতে কি অভিলাষ হয় না?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন, পরে কাপুরুষের ন্যায় বলিলেন,—"ভীমসিংহ, তুমি কি বিদ্রোহ উত্তেজনা করিতে চাও? ইংরেজ সিংহের সহিত কি কারণে, কোন সাহসে যুদ্ধ করিব? তাঁহারা আমার

অকৃত্রিম বন্ধু ; সুখে দুঃখে তাঁহারা আমার সহায় ;—এ ক্ষুদ্ররাজ্য তোমার উপযুক্ত নয়, তুমি এখনই স্থানান্তর হও।" তিনি কাপুরুষের ন্যায় কথা কহিলেও বহুদর্শী। বাস্তবিক রাজসংসারে অধিক দিন থাকিতে পারিলে, আমি সমুদায় সৈন্যকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিতাম। আমি বহিষ্কৃত হইয়া উৎকল, বালেশ্বর ও নানা স্থান হইতে নানাপ্রকারের যুবক সংগ্রহ করিয়া এক দল বাঁধিলাম ; কিন্তু তাহার দ্বারা কোন সুবিধা দেখিলাম না। নিরাশ্রয় লোক পীড়ন ও দুই চারিজন ইংরেজ ও দেশীয় কর্ম্মচারীর হত্যা ভিন্ন, অন্য কোন ফল হইল না। বুঝিলাম, কোন রাজার সাহায্য ভিন্ন, এই সময়ে এই মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে না। আমি জানিতাম, মৃত মহারাজার কন্যা ভিন্ন আর কেহ উত্তরাধিকারিণী ছিল না ; তাহাকে অপহরণ করিয়া আমার ইচ্ছামত বিবাহ দিতে পারিলে, জামাতা আমার বশীভূত হইবে, এবং কালে তাহার দ্বারা স্বকার্য্য সাধন করিব। কিন্তু বিধাতা আমাকে সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছেন। আর এ জীবনে প্রয়োজন নাই ;—এ ছার, অপদার্থ, ঘৃণিত জীবনে আর কি প্রয়োজন ?"

ভীমসিংহের স্বরভঙ্গ হইল। অবশেষে ঝর ঝর করিয়া চক্ষু হইতে জল পড়িয়া বিশাল বক্ষকে প্লাবিত করিল। পাষাণে জল দেখিয়া যেন সভাস্থ সকলে আর্দ্র হইল। পূর্ণচন্দ্র কহিলেন,—"বিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড পূর্ব্বাপর ব্যবস্থা রহিয়াছে ; তুমি উদরপূর্ত্তির জন্য নিরন্তর অসহায় লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছ, মহারাজাকে দারুণ মনকষ্ট দিয়া তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর কারণ হইয়াছ, প্রভাবতীকে দুঃখিনী করিয়া, অবশেষে বিবাহ দিয়া চির-দুঃখিনী করিবার আয়োজন করিয়াছিলে, কৃষ্ণশঙ্করকে মর্ম্মান্তিক যাতনা দিয়া শেষে অনাথের ন্যায়, পশুর ন্যায় বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে।"

ভীম। প্রাণ ভিক্ষা করা অপেক্ষা কাপুরুষের কার্য্য জগতে আর আছে কি না সন্দেহ। ভীমসিংহ সে ঘৃণিত প্রার্থনা এ জীবনে করিবে না।

ইচ্ছা হইলে তাহাকে যেরূপে হয় বধ করুন;—কিন্তু একটা প্রার্থনা আছে।

মহা। কি?

ভীম। নিরাশ্রয় ছাগের ন্যায় আমাকে বধ না করিয়া মল্ল বা অসিযুদ্ধে কেহ আমাকে বধ করেন, এই আমার এক ও শেষ ভিক্ষা।

মহারাজা ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া, ভীমসিংহ পুনরায় কহিল,—"পূর্ব্বাপর হইতে এই প্রথা এই সূর্য্যবংশে চলিয়া আসিতেছে। দোষী ইচ্ছা করিলে মল্ল বা অসিযুদ্ধ প্রার্থনা করিতে পারে।" তিনি মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সম্মতি প্রদান করিয়া কহিলেন,—"ভীমসিংহের সহিত অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কে তাহাকে সংহার করিতে ইচ্ছা করে?"

সভা নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কথা নাই। সেনাপতি অমরসিংহ হইতে সাধারণ সৈন্য অবধি স্থির। ভীমসিংহ গর্জ্জন করিয়া, যোড়পদে ভূমে পদাঘাত ও যোড়হস্তে কাষ্ঠাসনে মুষ্ট্যাঘাত করিল। ধ্বনি প্রতি-ধ্বনিতে ভয়ানক শব্দোৎপন্ন হইল। ভীষণ বাহুযুগল আস্ফালন করিয়া কহিল,—"তবে কি বঙ্গের বীরত্ব আজ হইতে লোপ পাইল? আজ হইতে কাপুরুষের ন্যায় এই সকল সৈনিক ও সেনাপতি বৃদ্ধ ও মৃত্যুর নামে কাঁপিয়া উঠিল। ধিক্ পুরুষত্বে? ধিক্ অমর ও অর্জ্জুনের জীবনে! ধিক্ হিন্দুরাজত্বে! ধিক্ বাঙ্গালী ও ক্ষত্রিয়প্রাণে!"

ভীমসিংহ এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, তাহার লোহিত লোচন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। প্রতি শিরা, প্রতি ধমনী ধিক্ ধিক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভীমসিংহ উন্মত্তপ্রায় হইল। শরীরের সমুদায় তেজ শৃঙ্খলাবদ্ধ অঙ্গে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিন্তু কতক্ষণ সে লৌহ শৃঙ্খল সে ভীম ভীমসিংহের ভীমাবেগ সহ্য করিতে পারে? হস্ত ও পদ-শৃঙ্খল মড়্ মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল।

এতক্ষণ অর্জ্জুনসিংহ স্থির ছিল, এখন আস্ফালন করিয়া কহিল,—"মহারাজ, পতঙ্গের মৃত্যু উপস্থিত হইলে ফর্ ফর্ করে। দুর্দ্দান্ত দুর্ব্বুদ্ধি দস্যুর সহিত যুদ্ধ করা আমি নিতান্ত অপমানের কার্য্য মনে করি। তবে যদি মহারাজা অনুমতি করেন, এই দণ্ডে পাপাত্মার শিরশ্ছেদন করিয়া কর্ত্তিত মুণ্ড পদপ্রান্তে অর্পণ করিতে পারি।"

মহা। অর্জ্জুনসিংহ, বংশপরম্পরাগত বলিয়াই, আমি এই অসিযুদ্ধে সম্মতি দিয়াছি। কাহাকে অনুরোধ বা উপরোধ করিতে আমার ক্ষমতা নাই। ভীমসিংহকে পরাজিত করিতে পারিলে যে, জগতে বীর বলিয়া আপনি ঘোষিত হইবেন, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি যুদ্ধে কোন বীর উপস্থিত না হন, অগত্যা তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

অর্জ্জু। মহারাজ, বুঝিলাম, পাপাত্মার দণ্ডবিধানের ভার আমার উপর পড়িয়াছে। আমি প্রসন্নচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——*(:0:)*——

অসি-যুদ্ধ।

অসি-যুদ্ধের জন্য প্রাঙ্গণের একাংশে কাঠগড়া দ্বারা একখণ্ড ভূমি বেষ্টিত হইল। উভয় যোদ্ধার ভীম কায়, প্রশস্ত বক্ষ, বিশাল উরু, বাহু ও দীর্ঘাকৃতি দেখিয়া দর্শকদিগের মন তর তর নাচিতে লাগিল। লোকে লোকারণ্য, মহারাজা মধ্যস্থলে উপবেশন করিলেন। একপার্শ্বে অমরচন্দ্র, বীরচন্দ্র, শৌরেন্দ্র, নরেন্দ্র প্রভৃতি সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী, অন্যদিকে মন্ত্রীগণ ও বিভাগীয় অধ্যক্ষগণ ও সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারিগণ উপবেশন করি-লেন। কাঠগড়ার একদেশে সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রাদি ও ঔষধাদি লইয়া সার্জ্জন জেনারেল আশুতোষ ও প্রধান রাজবৈদ্য উপবেশন করিলেন। উপরে বিচিত্র বস্ত্রাভ্যন্তরে রাজমহিষী, প্রভাবতী, শরৎসুন্দরী, যোগেশ্বরী, পদ্মমুখী ও অপর অপর সম্ভ্রান্তপুরস্ত্রীগণ একদৃষ্টে যোদ্ধাদিগের উপর চাহিয়া রহিলেন।

বংশীবাদন করিয়া অমরসিংহ ইঙ্গিত করিবামাত্র উভয় যোদ্ধা ভীমরোলে উভয়কে আক্রমণ করিল। ঝন্‌ঝনা, ঠন্‌ঠনা, ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ অনবরত উঠিতে লাগিল। উভয়ের কি চমৎকার শিক্ষা! উভয় অসি ভিন্ন দিক্ হইতে উত্থিত হইয়া কেমন একস্থানে সংঘর্ষণ করিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে ভীমসিংহ নিরস্ত্র হইল। অর্জ্জুনের এক

আঘাতে ভীমের তরবারি উড়িয়া গেল। দর্শকেরা 'হা হা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। অনেকে 'ভয়ো ভীম' বলিয়া উপহাস করিল। আর একখানা তরবারি তাহার কটিতটে ঝুলিতেছিল। বলা বাহুল্য যে প্রত্যেক যোদ্ধাই দুখানি করিয়া তরবারি সঙ্গে লইয়াছিলেন। ভীম এক নিমিষে তাহা গ্রহণ করিয়া অর্জ্জুনকে দ্বিগুণ রোষভরে আক্রমণ করিল। ক্রোধের সহিত বল চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইল। এমন প্রচণ্ড বেগে অসি ঘূর্ণিত করিতে লাগিল যে, সকলেই ভীমসিংহকে বর্ত্তুলাকার দেখিল। এমন ক্ষিপ্র ও লঘুহস্ততা, কেহ কখন দেখে নাই বলিয়া স্বীকার করিল। অর্জ্জুনসিংহ ধীরে ধীরে পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন। অবশেষে 'কাঠগড়ার' নিকটবর্ত্তী হইলেন। আর নড়িবার স্থান নাই দেখিয়া, অগত্যা বীর অর্জ্জুন দাড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ভীমের তরবারি বক্রভাবে আঘাত করিবামাত্র, হস্ত হইতে অসি পড়িয়া গেল। দ্বিতীয় আঘাতে অর্জ্জুন হতজ্ঞান হইয়া 'কাঠগড়ার' পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। অতি উৎকট ও প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীমসিংহ মধ্যস্থলে অসি নিম্ন করিয়া দাড়াইয়া রহিল। এখনও তাহার শরীরের বেগ হ্রাস হয় নাই; অনর্গল বৈদ্যুতিক ক্রীড়া ধমনীতে হইতেছিল। ঝড় কখন থামিয়া গিয়াছে, তরঙ্গাস্ফালন তখনও নদীতে ছুটিতেছিল।

সার্জ্জন জেনারেল ও রাজবৈদ্য অতি বেগে অর্জ্জুনের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"ভয় নাই, আকস্মিক আঘাতে মস্তিষ্কের ক্রিয়া লোপ পাইয়াছে; এখনই ইঁহার জ্ঞান হইবে।" চারিজন বাহক তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ডাক্তারের ক্ষুদ্র তাম্বুর মধ্যে লইয়া গেল।

এদিকে অমরসিংহ উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"যদি কেহ বীর থাক,

পরিচয় প্রদান করিয়া মুখোজ্জ্বল কর।" কিন্তু একপ্রাণীও নড়িল না। কি সৈনিক কি দর্শক সকলেই নিস্তব্ধ। ভীমের সেই পর্ব্বতাকার নিবিড়, বৃহৎ ও রক্তরঞ্জিত মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে জড়ের ন্যায় স্থির রহিল। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহিল,—"ভীমের সহিত লড়িতে পারে, এমন পুরুষ এখনও জন্ম গ্রহণ করে নাই; স্বর্গীয় মহারাজাই স্বয়ং পরাস্ত হইয়াছিলেন।" অমরসিংহ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এক প্রাণীও উঠিতে সাহস পাইল না। কেবল "হিস্ হিস্" শব্দ চারিদিকে হইতে লাগিল। একজন সিপাহী কহিল,—"কি দুঃখে, এ নবীন বয়সে ভীমের হাতে মারিতে যাইব—বাঁচিলে অদৃষ্টে অনেক সুখ ভোগ হইবে।" এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র ভীম গর্জ্জিয়া কহিল,—"কাপুরুষ! তোর জীবনই ত মরণ, তোর আবার মরিবার ভয় কেন? তুই আবার কি সুখের ইচ্ছা করিস্?"

কেহই যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র লজ্জিত হইলেন। মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন। এমন সময় এক বীর পুরুষ এক লম্ফে কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে তুমুল শব্দোৎপন্ন হইল। সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিল; ভাবিতে লাগিল এ নবাগত যুবা কে? অন্তঃপুরে প্রভাবতীর হৃদয় তর তর নাচিয়া উঠিল। তিনি ভাব গোপন করিতে না পারিয়া, শরৎসুন্দরীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"বল দেখি, কৃষ্ণশঙ্করকে এই সময় কেমন দেখাইতেছে?" শরৎ কোমল স্বরে কহিলেন,—"ভাই, এ যুদ্ধ দেখিতে আমার ইচ্ছা নাই, আমার মন কেমন করিতেছে। হায়! জীবিত অর্জ্জুনসিংহ এই সগর্ব্বে কথা কহিতেছিল, এখন কোথায় গেল? এ পোড়া যুদ্ধ হইল কেন? জীবন দিয়া এ বীরত্ব কেন?

কান্ত—(একটু জিহ্বা বাহির করিয়া) মহারাজার এ অতৃপ্তিকর তামাসা দেখিবার ইচ্ছা কেন বুঝিতে পারি না।"

প্রভাবতী হাসিয়া কহিলেন, "শরৎ, ভীমসিংহের সহিত যদি কেহ যুদ্ধ করিতে না উঠিত, তাহা হইলে আমিই উঠিতাম।"

শরৎ। (অবাক্ হইয়া) বল কি ? তুমি কি করিয়া ঐ ডাকাতের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস কর ? উহাকে দেখিলে ত আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠে।"

প্রভা। আমি ঘোড়া চড়িয়া উহার সহিত লড়াই করিতাম।

শর। তুমি লড়াই কোথায় শিখিলে ?

প্রভা। লড়াই কি আবার শিখিতে হয় ? নরেন্দ্রলালবাবুর দ্বারবানেরা লাঠা ও তলোয়ার খেলিত, তাহা দেখিয়া আমি ঘরে বসিয়া কতদিন লাঠা ও তরবারি ঘুরাইয়াছি।

শরৎ। ঘোড়া চড়িতে কোথায় শিখিলে ?

প্রভা। তুমি যে আমাকে অবাক্ করিলে ? লোকে পাল্কী, গাড়ি চড়িতে আবার শেখে নাকি ? আমি বাল্যকালে ঘোড়ায় চড়িয়াছি, এমন মনে হয় ;—তা ভিন্ন আমি, মহারাজা ও কৃষ্ণশঙ্কর উদ্যানের মধ্যে ঘোড়া চড়িতাম ও অস্ত্র খেলা করিতাম।

শরৎ। ভাই, আমার এ সকল বিষয়ে সাধ নাই। আমরা স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মত থাকিতেই আমার ইচ্ছা করে। পুরুষের বারয়ে আমাদের আবশ্যক কি ?

প্রভা। স্বভাব লইয়া শিক্ষা। আমার প্রকৃতি আর তোমার প্রকৃতি ভিন্ন, সুতরাং আমাদের প্রবৃত্তি ও কার্য্য ভিন্ন হইবে।

এই সময় ভীমসিংহ কৃষ্ণশঙ্করকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন,— "আজ আমার সুপ্রভাত, আপনার হস্তে যে জীবন উৎসর্গ করিব, ইহা

অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য নাই। আপনি মহারাজ চক্রবর্ত্তী, কপালে রাজদণ্ড বিদ্যমান, বঙ্গদেশ—না হয় এই রঘুনাথগড়ের রাজা আপনি একদিন হইবেন।”

কৃষ্ণশঙ্কর কহিলেন,—“ভীমসিংহ, তুমি অধর্ম্মের অবতার, তুমি বিদ্রোহী, তোমার কোন কর্ম্মের সহিত আমি একমত হইতে পারি না ও কখনও পারিব না।”

ভীমসিংহ হাস্য করিয়া কহিলেন,—“ভাগ্যবান্, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, মরণসময়ে আমার উদ্দেশ্যকে নিন্দা করিবেন না।” এই বলিয়া স্বাধীননগরের সেনাপতি অস্ত্রোত্তোলন পূর্ব্বক কৃষ্ণশঙ্করকে আক্রমণ করিল।

কৃষ্ণশঙ্করের শরীর নাতিদীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল, প্রশস্ত কপাল, বিশাল বক্ষ, অল্প অল্প শ্মশ্রুজালে মুখের শোভা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহার হস্ত আস্ফালনের সহিত, পদ সঞ্চারের সহিত, মস্তক কম্পনের সহিত, প্রভাবতীর হৃদয়ও তর তর নাচিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ঘন ঘন অসি সঞ্চালিত ও সংঘর্ষিত হইল। বিদ্যুতের ন্যায় অসি-প্রভা দর্শকের চক্ষে প্রতিফলিত হইল। সকলেই অধীর হইয়া যুদ্ধ দেখিতেছে ও মনে মনে কৃষ্ণশঙ্করের মঙ্গল কামনা করিতেছে ; এমন সময় ভীমসিংহের এক আঘাতে তিনি ভূতলশায়ী হইলেন। শরীর নিঃস্পন্দ হইল। বিন্দু বিন্দু শোণিত বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার মোহ হইল। তিনি উঠিতে পারিলেন না। সার্জ্জন জেনারেল দ্রুত আসিয়া সুষুপ্ত বীরের মস্তকোত্তোলন করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণশঙ্করের অবস্থা দেখিয়া, প্রভাবতীর স্থিরতা এককালে নষ্ট হইয়া গেল। হৃদয়ে এক অভিনব অস্বাভাবিক ভাব উঠিল। সেই ভাবে তাঁহার শরীর ও মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি এক লম্ফে

অলিন্দে আসিলেন, দ্বিতীয় লম্ফে রাজমহিষীর অদৃশ্য হইলেন। কন্যার জন্য মাতা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। শরৎসুন্দরী ও যোগেশ্বরী কতকদূর পশ্চাদ্ধাবমানা হইলেন; কিন্তু আকাশচ্যুত-তারকা-সুন্দরীর ন্যায়, কাদম্বিনী-প্রসূত-সৌদামিনীর ন্যায়, ত্বরিতগমনা প্রভাকে কেহই ধৃত করিতে পারিলেন না। তিনি অন্তঃপুরের বাহির হইয়া গেলেন।

কৃষ্ণশঙ্কর এখনও স্পন্দহীন হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। সভা স্থির ও গম্ভীর। কাহারও মুখে কথা নাই। ভীমসিংহ অবনত বদনে মধ্যস্থলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার উগ্রমূর্ত্তি বিনম্র হইয়াছে। অজ্ঞাতসারে পূর্ণচন্দ্রের চক্ষে জল পড়িতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, কিছুদিন পূর্ব্বে নরেন্দ্রলাল বাবু কর্ম্মোপলক্ষে বাটী চলিয়া গিয়াছিলেন। আজ এই সময়ে রাজার মনে অতীত ঘটনা সকল একে একে উঠিতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে মনোভাব দমন করিয়া প্রস্তরের ন্যায় উপবিষ্ট রহিলেন।

এই সময় পূর্ব্বদিকে জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায়, কৈলাসশিখরে হৈমবতীর হেমপ্রভার ন্যায়, নব কাদম্বিনীর নিবিড়-নীলিম-বক্ষঃস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় এক অপূর্ব্ব জ্বলন্ত বীরপ্রতিমা ঘোটকারোহণে সভায় আগমন করিলেন। তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ, তন্নিম্নে কুঞ্চিত কেশপাশ চারিদিকে উড়িতেছে; কর্ণে বীরবৌলি, অঙ্গে বর্ম্ম, হস্তে শাণিত তরবারি, কটিতটে কটিবন্ধ, তাহা হইতে সমুজ্জ্বল কিরীচ দোদুল্যমান।

সেই বীরপ্রতিমা দেখিয়া সভাস্থ সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল। মহা কোলাহল উপস্থিত হইল। সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—"একি—মহারাজ শশধর রাও কি বালকরূপে স্বর্গ হইতে ভূতলে আসিলেন?" পূর্ণচন্দ্র দেখিলেন,—সেই আলেখ্য-চিত্রিত ব্যাঘ্রহন্তা পুরুষ। কমলকুমারীর চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইল। ভীমসিংহ প্রভাকে কখন

দেখে নাই, এখন সেই বীরকায়া দেখিয়া তাহার শরীর প্রকম্পিত হইল; বলিয়া উঠিল,—"আজ রক্ষা নাই।"

সেই পুরুষবেশধারিণী বীরাঙ্গনা তখন গম্ভীর, গর্ব্বিত অথচ সুমধুর স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আজ তোমার গর্ব্বের শেষ হইবে। যে প্রভূত বলসম্পন্ন হইয়াও অধর্ম্ম, দুষ্প্রবৃত্তি ও দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া দূষণীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যে তারকাসুরের ন্যায় এই শান্ত সুপ্রসন্ন বঙ্গে প্রবেশ করিয়া অকারণে, অসময়ে ও অবিবেকীর ন্যায় বঙ্গবাসীর সুখভঙ্গ করিতে চায়, সেই নরপিশাচের মস্তক আজ দ্বিখণ্ড করিব।" এই বলিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক তিনি বিশাল অসি ঘুরাইতে ঘুরাইতে একলম্ফে অশ্বিনীসহ কাঠগড়ার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দর্শকবৃন্দ চীৎকার করিয়া—"জয় মহারাজার জয়"—বলিয়া উঠিল। কেহ কেহ নির্ব্বাক্ হইয়া সেই না-পুরুষ, না-স্ত্রী প্রতিকৃতির বীর মুখমণ্ডলের মধ্যে অলোকসামান্য রূপরাশি হাঁ করিয়া দেখিতে লাগিল।

ভীমসিংহ শান্তভাবে কহিল,—"দেবি! আমি বঙ্গের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ বঙ্গে সরোজিনীর উদয় দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইতেছে, এই অন্ধকারময় বঙ্গেও একদিন সূর্য্য উঠিবে।" এই বলিয়া সে অসি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্মুখে অগ্রসর হইল। মস্তক প্রসারিত করিয়া কহিল,—"আমাকে বিনাশ করুন—আজ আমি প্রসন্নমনে সংসার হইতে বিদায় লই।" প্রভাবতী উদ্ধতা ফণিনীর ন্যায় কহিলেন,—"তস্কর! কাপুরুষের ন্যায় অসি পরিত্যাগ করিয়া এখন দোষীর ন্যায়, নরহত্যাকারীর ন্যায়, বিদ্রোহীর ন্যায় রাজদণ্ড মস্তকে ধারণ করিতে আসিয়াছ? আমি রাজা নই—অস্ত্র গ্রহণ কর—আবশ্যক হয়, সেনাপতি মহাশয়ের নিকট ঘোটকের প্রার্থনা কর।"

প্রভাবতীর সেই সুমধুর, সেই বীররসাভিষিক্ত কণ্ঠস্বর, অমৃতবিন্দুর

ন্যায় কৃষ্ণশঙ্করের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহার নির্জীব শরীর নড়িয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মূর্চ্ছার শেষ হইল। পুনরায় অসিহস্তে কহিলেন,—"ভীমসিংহ, আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করিও না—এইবার হয় মরিব, না হয় মারিব।" এই বলিয়া তিনি ভীমের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণশঙ্কর অবমানিত হইয়া মনে করিলেন,—"এই প্রাণ যাউক, আর থাকুক, ভীমসিংহকে একবার আঘাত করিবই করিব।" এই স্থির করিয়া তিনি হুঙ্কার দিয়া অসি চালনা করিলেন। সেনাপতি তাঁহার অসি চালনার অবস্থা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিল না। কৃষ্ণশঙ্কর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভীমের অসির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তাহার অসি ঘুরিয়া না আসিতে, তিনি তাহার বক্ষে প্রচণ্ড আঘাত দিলেন। সেই আঘাতে স্বাধান নগরের সেনাপতি অসি হস্তে পড়িয়া গেল; সহাস্যমুখে কহিল,—"বীর! তোমাকে অগ্রসর করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিলাম না এই দুঃখ, বিধাতার নিকট বলিব।" ভীম জন্মের মত নীরব হইল।

প্রভাবতী এক্ষণে অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণশঙ্করকে ইঙ্গিত করিলেন। তিনি পশ্চাদ্বর্ত্তী দ্বিতীয় অশ্বে লম্ফত্যাগে উঠিলেন। অমনি উভয়ে তীরের ন্যায় দৌড়িয়া গেলেন। প্রাসাদের সন্নিহিত উপবনে তাঁহারা কোথায় কতক্ষণ মিশিয়া গিয়াছেন, তত্রাপি দর্শকেরা এখনও সেইদিকে চাহিয়া আছে। সেই যুগল অশ্বের, যুগল আরোহীদিগের গমনচ্ছবি, কাহারও অন্তর হইতে বিলীন হইল না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—):০:(—

এক ক্ষুদ্র অভিনয়।

রাজদরবারে এক অভিনয় মাত্র অবশিষ্ট ছিল। অদ্য তাহারই শেষ হইল। কালাচাঁদের জননী গৌরমোহন বাবুর উপর হত্যাভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। জমিদারীর মধ্যে এই হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া, পূর্ণচন্দ্র তাহাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আজ পরাক্রমশালী, অমিত-তেজঃসম্পন্ন গৌরমোহন দত্ত মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মুখের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনই হইয়াছে। গোঁফের সে তাড়া নাই, চক্ষে সে গর্ব্ব নাই, মুখ ভার ও বিষণ্ণ। শরীরে এমন বল নাই যে দ্রুত চলিতে পারে। দুইজন লোক অতি ধীরে ধীরে সম্মুখে আনয়ন করিলে, গৌরমোহন বামহস্তোত্তোলন পূর্ব্বক মহারাজাকে অভিবাদন করিল। পূর্ণচন্দ্র তাহার আকৃতি দেখিয়া ও বাম হস্তের অভিবাদনে চমৎকৃত হইয়া মুখের দিকে চাহিলেন। গৌরমোহন অতি কাতরে ও অতি বিনয়ে বলিল,—"মহারাজ, যে সময়ে দেব-প্রতিম রতি-কান্তের পবিত্র দেহে হস্তক্ষেপ করি, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যেন মন্ত্রবলে আমার হস্ত অবশ হইয়া গেল। সে হস্ত এখনও অবশ রহিয়াছে। এত চিকিৎসা করিলাম, এত ব্যয় করিলাম, আমার সকলই বৃথা হইল। এখন বুঝিতেছি যে, এতদিন দুর্ব্বলের উপর যে অন্যায়াচরণ করিয়া আসিয়াছি, ও ধনের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, জগৎকে মৃৎভাণ্ড জ্ঞান করিয়াছিলাম,

তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। ঋষিশ্রেষ্ঠ হৃষীকেশের উপদেশে আমার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে। হায়! আমি কেন দুর্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া জগৎপিতার কার্য্য সাধন করিতে পারিলাম না? এমন ভাগ্যহীন, এমন অপদার্থ, এমন দুশ্চরিত্র কি আমার মত আর কেহ আছে?"—তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; কাঁদিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া ফেলিল।

পূর্ণচন্দ্রের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় দয়ার স্রোত প্রবাহিত হইল। গৌরমোহনের যে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি বলিলেন,—"গৌরমোহন, তুমি গুরুতর অভিযোগে আজ অভিযুক্ত, আমি বিচারের জন্য তোমাকে মেদিনীপুর পাঠাইতে পারি।" আবার গৌরমোহন ক্রন্দন করিয়া ধরা ভাসাইল; কাতরে কত কথা বলিল, তাহার সংখ্যা নাই। শেষে অনেক চিন্তা করিয়া মহারাজা কাপ্তেন লুইস কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মহারাজা প্রত্যুত্তর লাভ করিয়া সন্তোষের সহিত গৌর-মোহনকে বলিলেন,—"তুমি দুইলক্ষ মুদ্রা তোমার জমিদারীর মধ্যে সৎকর্ম্মে অর্থাৎ বর্ত্ম নির্ম্মাণে, বিদ্যালয়, দেবালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনে, অসহায় বালক বালিকা ও বিধবা রমণীগণের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় কর। তোমার যেরূপ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে অন্য কোন প্রকার কায়িক শাস্তি অধিক ফলোপধায়ক হইবে না। কালাচাঁদের জননী ও স্ত্রী চিরকালই আমার প্রতিপাল্যে থাকিবে। তাহাদের জন্য তোমার কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে না।"

গৌরমোহন কৃতজ্ঞহৃদয়ে কহিল,—"দুইলক্ষ কেন, আরও অধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া মহারাজার অভিপ্রায়ানুযায়ী সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত। ঋষি কহিয়াছেন যে, মনুষ্যের দুই হস্ত

ও দশ অঙ্গুলি; অর্থাৎ দুই হস্তে সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া দশ-জনের ভরণ-পোষণ করিবে। আমার একমাত্র পুত্র, অধিক অর্থে আমার প্রয়োজন কি? মহারাজ! আমার এক প্রার্থনা আছে, সে প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে আমার জীবনে কখন শান্তির স্রোত প্রবাহিত হইবে না। অতি নৃশংসভাবে আমি কালাচাঁদকে হত্যা করিয়াছি, তাহার জননী, স্ত্রী ও ভাবী পুত্রের ভরণপোষণের উপযুক্ত আয়োজন করিয়া না দিলে বিশ্বনাথ কি আমায় কখন মার্জ্জনা করিবেন? তাহাদের ভার আমাকে অর্পণ করুন। আমি তাহাদের জন্য প্রশস্ত বাটী প্রস্তুত এবং চিরকাল সুখে থাকিতে পারে এমন তালুক ক্রয় করিয়াছি। কালাচাঁদের স্ত্রী পুত্রসন্তা-বিতা বলিয়া শুনিয়াছি। (মহারাজকে নিরুত্তর দেখিয়া) প্রভো! যদি দয়া করিয়া আমাকে ক্ষমা করিলেন, তবে আমাকে আমার কৃত পাপ-মোচনের রাস্তা পরিষ্কৃত করিতে দিউন। অভাগিনীর তপ্তশ্বাসে আমার অধোর্দ্ধ সপ্তপুরুষ ধ্বংস হইয়া যাইবে।—"

গৌরমোহন আর বলিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিল। পূর্ণচন্দ্র তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে মুক্তি দিলেন।

যে দিন গৌরমোহনের বিচার আরম্ভ করিয়া পূর্ণচন্দ্র ভারত গবর্ণ-মেণ্টে পত্র লিখিলেন, সেই দিন অন্যান্য দস্যুদিগের বিচারও নিষ্পত্তি হইয়া গেল। দস্যুদলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া যাহারা স্বীয় রাজ্যের প্রজা, তিনি তাহাদিগের মধ্যে দুই চারিজন পুরাতন দস্যু ভিন্ন অল্পবয়স্ক সকলকে "আমরা ভবিষ্যতে আর বিদ্রোহী বা পাপাসক্ত হইব না" এই অঙ্গীকার লেখাইয়া লইয়া অব্যাহতি দিলেন। ইংরেজ-রাজ্যবাসী দস্যু সকলও ঐরূপ ভাবে মেদিনীপুরে বিচার প্রাপ্ত হইয়া ইংরেজরাজের মহানুভাবতা উপলব্ধি করিয়া আনন্দিত হইল। উৎফুল্লময়ী প্রভৃতি দুই একজনমাত্র চির-নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা লাভ করিল।

দরবার ভঙ্গ হয় এমন সময় এক দূত দ্রুতপদনিক্ষেপে আগমন করিয়া এক পত্র ও দ্বিসহস্র মুদ্রা সম্মুখে রাখিয়া করযোড়ে কহিল,—"মহারাজ, ঈশ্বরদাস বাবু রামনগর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জন্মভূমিতে চলিয়া গিয়াছেন। যে দিন তিনি তাঁহার জন্মদায়িনী জননীর পত্র হারাইয়া ফেলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার মনে ক্ষোভ ও দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। পরে চিন্তা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি জন্মভূমি চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সে চিঠিতে যে কি লেখা ছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না।" পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"অবোধ ব্রাহ্মকে ঈশ্বর স্বয়ং শিক্ষা দিয়াছেন।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আদর্শ হিন্দুরাজ্য।*

রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূর্ণচন্দ্র রাজ্য পরিদর্শনের জন্য বহির্গত হইলেন। প্রত্যেক কর্ম্মচারী, ভূম্যধিকারী, ব্যবসায়ী, কৃষক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের সুখ দুঃখ, অভাব আকাঙ্ক্ষা পরিজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। অতীত অবস্থার সহিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন। কখন কখন ছদ্মবেশে বহির্গত হইয়া কত অপূর্ব্ব, কত আশ্চর্য্য তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া দৈনন্দিন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। অচিরে রাজ্যের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সকল সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

একদিন তিনি স্বামী হৃষীকেশ, মন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান অমাত্য-বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া ও মহারাণীর অনুমতি লইয়া রাজসভায় এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করাইলেন। প্রথমে সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া সভা গঠিত করিলেন। সেই সভায় প্রত্যেক বিষয়ের বাদানুবাদের পর যাহা স্থিরনিশ্চয় হইল, তাহাই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়া বিধিবদ্ধ

---

* উপন্যাসের সহিত এই পরিচ্ছেদের কোন সম্বন্ধ নাই। তবে গ্রন্থকার সকলকে এই পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্করণের জন্য অনুরোধ করেন। অলস হইয়া সময় প্রতীক্ষা করিলে, হিন্দুর অস্তিত্ব লোপ পাইবে।

করিলেন। বলা বাহুল্য, কাপ্তান লুইস্ এই সম্বন্ধে রাজাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। একদিনে বিধিগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে হয়ত অনেকস্থলে অশুভ ফলোৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা, এই জন্য সমাজ ও ধর্ম্ম-নীতি ক্রমে ক্রমে প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজ্য, ধর্ম্ম ও সমাজ শাসনের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন, তাহারই সার মাত্র নিম্নে বিবৃত হইল।

ভূমিকা।

রাজা যথেচ্ছাচারী ও প্রজা-পীড়ক হইতে না পারেন, এইজন্য তাঁহার ক্ষমতা সংযত ও প্রজার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই মূলভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া সকল সুসভ্য দেশের শাসনকার্য্য সংসাধিত হইয়া থাকে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এই নীতি অবলম্বন করিয়া ভারতরাজ্য শাসন করিতেছেন। তবে তাঁহারা প্রজার ধর্ম্মে ও সমাজে হস্তক্ষেপ করেন না। হিন্দুরাজ্যে রাজা ইচ্ছা করিলে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে পারেন। ধর্ম্ম ও সমাজ উন্নত না হইলে কেবল উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা (আইন) দ্বারা কোন জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। আমরা মহর্ষিদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলী হইতে উৎকৃষ্ট নীতি সকল সংগ্রহ করিয়া, আধুনিক ইংরেজ জাতির উদার নীতির সহিত সম্মিলিত করিয়া, হিন্দুসমাজ সংস্কারে, ধর্ম্ম সংস্থাপনে ও প্রজার স্বত্ব সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইলাম।

রাজনীতি।

১। যে কার্য্যের দ্বারা কোন প্রজার ইষ্ট বা অনিষ্ট হইতে পারে, এমন কোন কার্য্য রাজা একাকী করিবেন না।

২। সকল সময়ে রাজা সত্য এ ধর্ম্মের অবতার বলিয়া গণ্য ও পূজ্য হইবেন। তিনিও প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহ ও প্রতিপালন করিবেন।

৩। বিচারকার্য্য স্বাধীনভাবে স্বাধীনচেতা বিচারকের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবে। ন্যায়ের জন্য তিনি ঈশ্বরের নিকট দায়ী থাকিবেন। রাজা তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

৪। বিচার না করিয়া রাজা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

৫। রাজ্যরক্ষার জন্য আপদ্‌কালে যেরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে, তাহা তিনি সভাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৬। একবিংশতি জন সভ্যের দ্বারা রাজার সভা গঠিত হইবে। এই সভা সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবে, আয়-ব্যয়ের হিসাব করিবে, রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের দোষগুণানুসন্ধান করিবে, রাজকার্য্য যাহাতে উত্তরোত্তর ভাল হয় ও সকলের হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহা করিবে। ৭ জন সভ্য রাজা আপন কর্ম্মচারী বা অন্য স্থান হইতে মনোনীত করিবেন, অবশিষ্ট ১৪ জন দেশের লোক নির্ব্বাচন করিবেন। রাজা বা তাঁহার মন্ত্রী এই সভার সভাপতি হইবেন।

৭। নির্ব্বাচন প্রথা। এই রাজ্যে দশ গ্রামের উপর একজন তহশীলদার আছেন। ১০ জন তহশীলদারের উপর একজন সব্-কালেক্টর ও ১০ জন সব্‌কালেক্টরের উপর একজন কালেক্টর আছেন। এই রাজ্যে মোট ১০ জন কালেক্টর আছেন। ইহাঁরা সকলে রাজস্ব-সচিবের অধীনে কার্য্য করেন। যে সকল প্রজা কৃষি, ব্যবসা কি অন্য কোন উপলক্ষে দুই টাকা মাত্র কর রাজকোষে দেয়, তাহারাই ভোটর নিযুক্ত করিবেন। ইহা ভিন্ন উপাধিধারী পণ্ডিত, শিক্ষিত লোক, মৌলবী,

শিক্ষক ও অন্য কোন যোগ্য লোকেরও ভোটর নির্ব্বাচনের ক্ষমতা থাকিবে। প্রত্যেক দশ গ্রামের পূর্ব্বোক্ত প্রকারের লোক তহশীল-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ২ জন ভোটর নির্ব্বাচন করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক কালেক্টারের কেন্দ্রে ২০০ শত ও সমুদায় রাজ্যে ২০০০ সহস্র ভোটর মনোনীত হইবেন। ইঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া ১৪ জন সভ্য নিযুক্ত করিবেন। যাঁহারা সভ্য হইবেন, তাঁহারা পূর্ব্বাহ্নে আবেদন করিবেন। এই সকল প্রার্থী ও রাজ্যের অন্যান্য উপযুক্ত লোকদিগের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখা হইবে। প্রত্যেক ভোটর ১৪ জন সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। তন্মধ্যে স্মৃতির পণ্ডিত ১, ন্যায়ের ১, মৌলবী ২, চিকিৎসক ২, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ১, কৃষিতত্ত্বজ্ঞ ১, ইঞ্জিনিয়ার ১, ধর্ম্মসংরক্ষণ ও সংস্করণোপযোগী ব্যক্তি ১, সমাজ-সংস্কারক ১, অবশিষ্ট ৪ জন কৃতবিদ্য ব্যক্তি হইবেন। উপযুক্ত সভ্য নির্ব্বাচনের উপর রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে।

৮। অধিকাংশ সভ্যের দ্বারা স্থিরীকৃত যে মত, তাহা রাজা গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবেন অথবা সংক্ষেপে যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই মত অগ্রাহ্য করিয়া পুনরায় মত সংগ্রহ করিবেন। দ্বিতীয় মতের সহিত তিনি ঐক্য হইতে না পারিলে, পুনরায় যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক অগ্রাহ্য করিতে পারেন। এইরূপ হইলে দুই বৎসরের জন্য সেই প্রস্তাব স্থগিত থাকিবে।

ব্যয়সংক্ষেপ বিধি।

৯। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের বহিঃশত্রু দূর করিয়াছেন, ঠগী ও দস্যুর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং এই রাজ্যে অধিক সৈন্য রক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন। ৫০ গজারোহী, ২০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ পদাতিক

মাত্র আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত থাকিবে। প্রত্যেক সৈন্যকে তাহার কর্ত্তব্য কি এই বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। অবশিষ্ট সৈন্য-দিগকে পুলীশ কি অন্য কার্য্যে নিয়োজিত করা হইবে। কাহাকেও বা অবসর-বৃত্তি দেওয়া হইবে, কিন্তু কোন স্থানে পীড়া দিয়া কাহাকেও অপসারিত করা হইবে না। রাজা প্রত্যেক প্রজার সুখ ও দুঃখের জন্য দায়ী।

পুলীশ সংস্কার।

১০। কার্য্যের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বুঝিয়া পুলীশ কর্ম্মচারীর বেতন স্থির করিতে হইবে। পুলীশ রাজার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। প্রজা পুলী-শের মধ্য দিয়া রাজাকে দৃষ্টি করিতে ও বুঝিতে সক্ষম হয়। পুলীশ দুর্বৃত্ত হইলে রাজার কলঙ্ক ঘোষিত হয়। রাজা দয়ালু ও ধার্ম্মিক হইলেও পুলীশের অত্যাচারে যখন তাহারা জর্জ্জরীভূত হয়, তখন তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়া থাকে। দেশে অশান্তির স্রোত বহিতে থাকে এবং শেষে প্রজা রাজার ক্ষমতা অপহরণ করিতে চেষ্টা করে। পুলীশের জন্য লোক নির্ব্বাচন করিতে হইলে প্রথমে বংশমর্য্যাদা, বিদ্যা, চরিত্র ও স্বাস্থ্যের উপর দৃষ্টি করিয়া আবেদনপত্র গ্রহণ করিতে হইবে। পরে নির্ব্বাচিত লোকেরা পরীক্ষায় আহূত হইবে। যে যে উত্তীর্ণ হইবে, কেবল তাহারাই কার্য্যে প্রবেশ লাভ করিবে। রাজ্যের মধ্যে যখন যে বিভাগে কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইবে, তখন পূর্ব্বোক্ত উপায়ে লোক নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য। ইহার ফল এই যে, রাজাকে কেহ কখন পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী করিবে না। নির্ব্বাচিত লোকদিগের আত্ম-মর্য্যাদাও যথেষ্ট থাকিবে এবং চাকুরীর জন্য চাটুকারিতা করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে না ও উদরের জন্য আত্মসম্মান বিনষ্ট করিতে হইবে না।

পুলীশ কর্ম্মচারী সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, তিনি সাধারণের ভৃত্য এবং সকলের সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্যই তাঁহাকে প্রচুর ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। সে ক্ষমতার অপব্যবহার তিনি কখনই করিবেন না। বিনয়ী, মিষ্টভাষী ও কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া প্রফুল্লচিত্তে, সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিবেন। বিশেষতঃ স্ত্রী ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে কখন অকারণে পীড়ন করিবেন না। যে স্থানে কোন কর্ম্মচারী প্রশংসার কার্য্য করিবেন, তথায় তাঁহাকে উপযুক্ত পারি-তোষিক দিতে হইবে এবং যে স্থানে তিনি কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ হইয়া লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইবেন, সেস্থানে তাঁহাকে পুলীশ হইতে বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য হইবে। পুলীশ মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকিবেন। মাজিষ্ট্রেট দেশে শান্তিরক্ষা করিবেন। তিনি বিচারের কার্য্য করিবেন না। এইরূপ হইলে পুলীশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আর প্রয়োজন হইবে না।

বিচার বিভাগ।

১১। প্রত্যেক তহশীলদার দুইজন নির্ব্বাচিত সভ্য (জুরর) লইয়া পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের দেওয়ানী ও পঁচিশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডের ফৌজদারী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

১২। সব্ কালেক্টর জুরর সহ ১০০ টাকার দেওয়ানী ও ৫০ টাকা অর্থদণ্ডের অথবা ৭ দিন কারাবাসের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।

১৩। কালেক্টর জুরর সহ এক সহস্র টাকার দেওয়ানী ও ২৫০ টাকার অর্থদণ্ড বা তিনমাস কারাবাসের মোকদ্দমা করিতে পারিবেন। তিনিই মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে তহশীলদার,

সব্‌কালেক্টর, অথবা ডেপুটীকালেক্টরের সেরেস্তায় পাঠাইবেন বা নিজে নিষ্পত্তি করিবেন।

১৪। জুরর সহ জজ সর্ব্বপ্রকারের মোকদ্দমা করিবেন। এবং তিনি নিম্ন তিন বিচারালয়ের বিচারপদ্ধতিতে দোষ থাকিলে সংশোধন করিবেন।

১৫। সহস্র টাকার ঊর্দ্ধ না হইলে বা একমাসের অধিক কারাবাস না হইলে কোন মোকদ্দমার আপীল প্রধান বিচারকের নিকট উপস্থিত হইবে না। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে কাগজ পত্র দেখিয়া সংশোধন আবশ্যক হইলে করিতে পারিবেন।

১৬। বিচারক পুলীশের কার্য্যের যেরূপ দোষ গুণ বিচার করিবেন, তাহারই উপর কর্ম্মচারীর উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করিবে। অন্যথা বিচারক হাস্যাস্পদ হইয়া উঠেন এবং পুলীশও দুষ্ক্রিয়াশীল হইয়া পড়েন।

শিক্ষা-বিভাগ।

১৭। যে শিক্ষার দ্বারা হিন্দুর হিন্দুত্ব স্থির থাকে, ময়ূরের পুচ্ছ ধরিয়া বিড়ম্বিত হইতে না হয়, জাতীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্মজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, অথচ সংসারের আবশ্যকীয় বিষয় স্বচ্ছন্দে সংগৃহীত হয়, এইরূপ শিক্ষা এই রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করা হইবে।

প্রত্যেক একশত ঘরে একটি পাঠশালা, প্রত্যেক সব্‌কালেক্টরের কেন্দ্রে একটি করিয়া মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, ধর্ম্মশিক্ষার জন্য দেবালয়, চিকিৎসার জন্য দাতব্য ঔষধালয় ও কর্ম্মাক্ষম ব্যক্তির জন্য অন্নছত্র স্থাপিত হইবে। কালেক্টারের কেন্দ্রে ঐরূপ উচ্চশ্রেণীর সকল প্রকার আলয় উন্মুক্ত থাকিবে। রাজধানীতে সংস্কৃত, ইংরাজী, আরবী,

বাঙ্গালা ভাষা, শিল্প, বাণিজ্য, কল, কৌশল, ভূতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, রসায়ন প্রভৃতি শিক্ষার জন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় থাকিবে। রাজ্যের প্রত্যেক বালক ও বালিকা রাজার ব্যয়ে লিখিতে ও পড়িতে, হিসাব করিয়া কর দিতে ও গ্রহণ করিতে, দ্রব্যাদির বিনিময়ে মূল্যহিসাবে অর্থ দিতে সক্ষম হয়, এইরূপ শিক্ষা অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য পাইবে। দুর্ব্বল প্রজাকে যদি রাজকীয় কর্ম্মচারী বা ভূম্যধিকারী হইতে রক্ষা করিতে হয়, তবে শিক্ষা দেওয়া রাজার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। বিদ্যাবলে প্রজা মনুষ্যত্ব ও আত্মমর্য্যাদা লাভ করিতে পারে, নিজের স্বত্ব বুঝিয়া লইতে পারে। প্রজা সবল না হইলে, কেবল আইনের গুণে রক্ষা পাইতে পারে না। বিদ্যাবিহীন মনুষ্য পশুর সমান। এই রাজ্যের পর্ব্বতবাসী তাহার দৃষ্টান্তের স্থল। শিক্ষা বিহনে এই জাতি পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি পশুর ন্যায় পর্ব্বতগুহায় বা সামান্য কুটীরে বাস করিতেছে।

১৮। শিক্ষা বিভাগে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত থাকিবে। এই অর্থে ৪ জন যুবক কৃষি, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, কল কৌশল প্রভৃতি শিক্ষা করিবার জন্য প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে। ইহার মধ্যে একজন অন্ততঃ প্রতিবৎসরে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইবে।

১৯। ভাষা এক না হইলে জাতীয় গঠন হইতে পারে না। আমরা এখন প্রায় বাঙ্গালীর ন্যায় হইয়াছি, বিশেষ বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতের অনুরূপ। এই জন্য এই ভাষা এই রাজ্যে প্রচলিত হইবে।

স্ত্রীশিক্ষা।

২০। এই রাজ্যে প্রত্যেক বালিকা স্ত্রীলোকের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিবে; অর্থাৎ যে শিক্ষা দ্বারা ঈশ্বরে, স্বামীতে ও গুরুজনে

ভক্তি ও প্রীতি বৃদ্ধি হয়, অল্প আয়ে সন্তুষ্টচিত্তে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অভিজ্ঞতা হয়, সন্তান লালন পালন করিতে ও সুশিক্ষা দানে জ্ঞান জন্মে, দেবে ও সর্ব্বভূতে দয়ার উদ্রেক হয়, এমন শিক্ষা বালিকা-দিগকে প্রদান করিবে। কর্ম্মপটু, রন্ধনপটু, ধর্ম্মভীরু ও মিষ্টভাষিণী হইয়া যেন প্রফুল্ল-চিত্তে সংসারে লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁহারা সুখে বাস করিতে পারেন।

চিকিৎসা-বিদ্যালয়।

২১। এই রাজধানীতে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে। উপযুক্ত শিক্ষাভাবে ভারত হইতে এই বিদ্যা লোপ পাইতে চলিয়াছে।

২২। যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে, ডাক্তারি কলেজ ও চিকিৎসা-লয় স্থাপিত হইবে।

২৩। গো, অশ্ব ও অন্য ইতর জন্তুদিগের জন্য এক চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে এবং এস্থানে যুবকদিগকে শিক্ষা দিয়া এক এক তহশীল কেন্দ্রে কৃষকের সুবিধার জন্য পশুচিকিৎসার নিমিত্ত পাঠান হইবে।

কৃষি বিভাগ।

২৪। প্রত্যেক তহশীলদার, সবকালেক্টর ও কালেক্টরের নিজ নিজ কেন্দ্রে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংস্থাপিত করিয়া নানা প্রকার ফল, ফুল, শাক সবজী রোপণ করিয়া কৃষকদিগকে আহ্বান করতঃ তাহাদিগকে শিক্ষা দিবেন। প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ দশ জন কৃষকের দ্বারা নূতন নূতন বীজের চাষ করাইবেন। প্রত্যেক তহশীলদার কোন্ ভূমিতে কি শস্য উৎপন্ন করিলে প্রজা লাভবান হইবে, তাহা উপস্থিত থাকিয়া প্রদর্শন করিবেন। গ্রামের মধ্যে গোচারণ মাঠ ভিন্ন আর সকল স্থানই হয় চাষের, না হয় উদ্যানের উপযোগী করিতে হইবে। প্রত্যেক

প্রজা তাহার উচ্চভূমিতে অন্ততঃ চারিটী আম, লিচু, নারিকেল, তাল, পনস, বেল প্রভৃতি কোন প্রকারের উৎকৃষ্ট ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিবে। আবশ্যক হইলে প্রত্যেক প্রজা বিনা ব্যয়ে উদ্যান কেন্দ্রে চারা পাইবে।

২৫। বন্য বৃক্ষাদি কেহ ছেদন করিবে না। জ্বালাইবার জন্য ক্ষুদ্র বৃক্ষ, বা কয়লা ব্যবহৃত হইবে।

২৬। রাজা স্বয়ং পর্ব্বতে উৎকৃষ্ট আরণ্য বৃক্ষ—যথা শিশু, শাল, সেগুণ প্রভৃতি রোপণ করিবেন। উপত্যকা প্রদেশে, নদীতটে ফলবান বৃক্ষের উদ্যান করিবেন। এই কার্য্যে কাহারও মনোযোগ নাই, সুদূর ভবিষ্যতে আরণ্য ও ফলবান বৃক্ষের অভাব ভোগ করিতে হইবে।

২৭। কৃষির উন্নতি চেষ্টা কালেক্টরের প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি স্বয়ং ক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিবেন। তিনি যেমন কর সংগ্রহ করিবেন, সেইরূপে ভূমিতে করোৎপত্তির কার্য্যে সহায়তা করিবেন। তিনি জলাশয় খনন করাইবেন, পয়ঃপ্রণালীর উন্নতি সাধন করিবেন, পরে বীজ ও চারা সংগ্রহ করিয়া কৃষকদিগকে দিবেন, ও উৎসাহী কৃষকদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।

২৮। অনুর্ব্বর ভূমিতে প্রজাগণ ও কালেক্টর খর্জ্জুর বৃক্ষের বীজ ছড়াইয়া দিয়া বৃক্ষ উৎপন্ন করিবেন। ইহার রসে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করাইবেন। ইক্ষুর চাষও যত্নসহকারে করিতে হইবে।

২৯। যে কালেক্টরের সার্কেলে কৃষির সমূহ উন্নতি হইবে, তিনি রাজার নিকট সম্মানিত হইবেন; অন্যথা, তিনি অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন। কৃষির জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ। কৃষির অবনতি হইলে, দুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, জ্বর, আধিদৈবিক পীড়া (যথা plague) প্রাদুর্ভূত হইয়া রাজ্য বিনষ্ট হয়।

৩০। আলু প্রভূত পরিমাণে জন্মাইতে পারিলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বালুভূমিতে যথেষ্ট আলু হয়। প্রত্যেক কৃষক অন্ততঃ দশ কাঠার আলুর চাষ করিবে।

ধর্ম্মনীতি

৩১। ধর্ম্মের প্রভা মনুষ্যের অন্তর হইতে কমিয়া গেলেই, ইন্দ্রিয়গণ—যথা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি তাহার উপর আধিপত্য স্থাপন করে। এই জন্য বাল্যকাল হইতে ইন্দ্রিয়-সংযম, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ প্রভৃতি শিক্ষা করিতে হয়। মানুষের কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, তাহা যৌবনের পূর্ব্বেই জানা থাকা উচিত। বালকদিগকে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার জন্য, এই রাজধানীতে দেবালয়ের মধ্যে ধর্ম্মাশ্রম স্থাপিত হইবে। চরিত্রবান্ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য অথবা বৈষ্ণব যুবক সকল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া শিক্ষা আরম্ভ করিবে; শেষে জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া পাঠশালার ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে এবং আপনাদের আদর্শ চরিত্রের বলে তাহাদের চরিত্র গঠন করিবে।

৩২। কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন আদর্শ চরিত্র হিন্দুশাস্ত্রে অতি বিরল। মহাভারতের উপাখ্যান অংশ বাদ দিয়া, কৃষ্ণের চরিত্র বেদব্যাস যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই সংগৃহীত করিয়া বালকদিগের পাঠ্য হইবে। গীতা কেবল উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। নিষ্কাম হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে শিক্ষা না করিলে কোন জাতির উন্নতি হইতে পারে না।

৩৩। মহাভারত ও রামায়ণকে আদর্শ করিয়া, আদর্শ চরিত্র এখন গঠিত করিতে হইবে। রাজা, রামচন্দ্রের ন্যায় স্বার্থহীন ও প্রজা-

রঞ্জক হইবেন, প্রজা করভারে পীড়িত হইলে তাহা অপনয়ন করিবেন। প্রত্যেক মনুষ্য কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী ও কর্ত্তব্যনিরত, ভীষ্মের ন্যায় তেজস্বী, সংযতেন্দ্রিয় ও পিতৃপরায়ণ, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ, কর্ণের ন্যায় দানশীল, একলব্যের ন্যায় গুরুতে ভক্তিমান্, অর্জ্জুনের ন্যায় বীর, শৃঙ্গীর ন্যায় সত্যবাদী হইতে চেষ্টা করিবেন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী, বেদাধ্যায়ী, নির্ম্মল-শান্ত-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে দেবতার ন্যায় বিরাজ করিবেন এবং অন্য সকল জাতিকে শিক্ষা দান করিয়া সকলের নেতা ও পরামর্শদাতা হইবেন। ব্রাহ্মণের অধঃপতনেই অপর জাতি স্বেচ্ছাচারী ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। চরিত্রবান ব্রাহ্মণের অভ্যুদয়ে আবার হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপিত হইবে। রাজা অথবা প্রজা এইরূপ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিবেন।

সমাজ সংস্কার।

৩৪। পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দুকে চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত করিতে হইবে। বিদ্যা ও ধর্ম্মের নেতা বলিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। শাসনভার গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয় তন্নিম্ন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষি ও বাণিজ্যই বৈশ্যের অবলম্বন ছিল। তিন জাতির সেবা করাই শূদ্রের কর্ত্তব্য।

এখন এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে যে, এক জন অপরকে অস্পর্শীয় বলিয়া ঘৃণা ও দ্বেষ করিয়া থাকে। অন্ন গ্রহণ করা দূরে থাকুক, জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে আপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্ন গ্রহণ করিতেন। যে হিন্দু জাতি মহাসমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও বিস্তীর্ণ হইয়া একদিন সমগ্র ভারতে বাস করিয়াছিলেন, কালের পরিবর্ত্তনে সেই জাতি আপনার অঙ্গ এখন সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া তেজোহীন, প্রভাহীন, গাম্ভীর্য্যহীন হইয়া শৈবালপূর্ণ সংকীর্ণ নদীর ন্যায়

ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। যদি এখনও এই জাতির চৈতন্যোদয় না হয়, তাহা হইলে ইয়ুরোপের সংঘর্ষণে ইহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এই রাজ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবেন। যিনি বেদাধ্যয়ন করিয়া আত্মসংযমী হইয়াছেন, ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ পূর্ব্বক শুদ্ধ ও শান্ত ভাবাবলম্বন করিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবেন। অন্যথা তিনি যে জাতির বৃত্তি গ্রহণ করিবেন, সেই জাতির অন্তর্ভূত হইবেন।

ক্ষত্রিয় মধ্যে অসিজীবী ও মসীজীবী কায়স্থভুক্ত হইবে। তরবারি ও লেখনীর উপর রাজ্যশাসন নির্ভর করিতেছে।

বাণিজ্য ও কৃষি বৈশ্যের লক্ষণ; সুতরাং সৎগোপ, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, কংসবণিক, লৌহকার, তিলি, সাহা, চাষী কৈবর্ত্ত, তাম্বূলী, তন্তুবায়, উগ্র ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

শূদ্র দুই ভাগে বিভক্ত হইবে। একভাগ জলাচরণীয় যথা,—নাপিত, মালাকার, গোপ, তেলি, চণ্ডাল বা নমশূদ্র, চাষী রজক, চাষী যুগী, চাষী বাগ্দী প্রভৃতি। দ্বিতীয়ভাগ কর্ম্মদোষে জলাচরণীয় বলিয়া এখনও গণ্য হইতে পারে না। তাহারা মৎস্যজীবী কৈবর্ত্ত, সাধারণ রজক, শৌণ্ডিক, মাংসবিক্রেতা, চর্ম্মকার, হাড়ি, মেহতর, মুরদাফরাস প্রভৃতি।

বাভন, বৈদ্য, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী ও এইরূপ জাতি কার্য্যানুসারে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর জাতি বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩৪। প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর এক সভা প্রত্যেক গ্রামে আহূত করিয়া কর্ম্ম হিসাবে নিকৃষ্ট জাতিকে উৎকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টকে নিম্ন শ্রেণীতে আনিতে হইবে। সকলেই এক সৃষ্টিকর্ত্তার পুত্র। সকল পুত্রই যোগ্যতা অনুসারে কখন ঊর্দ্ধে উঠিবে, কখনও বা নিম্নে নামিবে।

স্রোতোহীন নদীর যে দুর্দ্দশা শেষে হইয়া থাকে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে জাতি সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে।

বিবাহ।

৩৬। পুরুষ চতুর্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে ও কন্যা ষোড়শ বর্ষে বিবাহ করিবেন।

৩৭। গার্হস্থ্য সুখের জন্য হিন্দু চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার মূলে দুইটী তত্ত্ব নিহিত আছে। প্রথমতঃ স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে বাল্যকাল হইতে বালিকা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ স্বামীর মৃত্যু হইলে, আথিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তাহাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হয়। হিন্দুর বিবাহে দুইটী অপূর্ণ আত্মা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। কেহ ইহ জীবনে সেই পূর্ণতা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। বিধবার বিবাহ প্রচলিত হইলেই হিন্দুর গার্হস্থ্য সুখ চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে। স্ত্রী আর সে পবিত্র চক্ষে স্বামীকে দৃষ্টি করিবে না। বিবাহ যেন চুক্তিমূলক হইবে। হিন্দুশাস্ত্রের মূলনীতি বিধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও সত্ত্বগুণাবলম্বী, প্রকৃতি ক্রিয়াশীল ও রজোগুণসম্পন্ন। হিন্দুর বিবাহে এই দুই গুণের সংযোগ হয়। সুতরাং হিন্দুর বিবাহে সৃষ্টিতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

৩৮। বিবাহে পিতা সন্তুষ্টচিত্তে যাহা কন্যার সহিত সম্প্রদান করিবেন, তাহাই স্বামী গ্রহণ করিবেন। কোনপ্রকার চুক্তি হইবে না ও চুক্তিভঙ্গ হইলে বিচারালয়ে তাহা গ্রাহ্য হইবে না; ও জাতি নির্ব্বাচনের সময় তাহাকে দণ্ডিত হইতে হইবে।

গো-সংরক্ষা।

৩৯। সংসারে গো সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। কৃষিকার্য্যে, শকট বহনে, পৃষ্ঠে দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতে গো জাতির তুল্য আর পশু নাই। বালক ও বৃদ্ধ ইহার দুগ্ধ পানে জীবন ধারণ করে। দুগ্ধে সর, নবনীত, ছানা, দধি, ক্ষীর প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোময়ে কৃষির উপযুক্ত সার হয় ও রন্ধনের কার্য্যও সম্পাদিত হয়। মৃত গোচর্ম্মে পাদুকা, শৃঙ্গে ও খুরে নানাবিধ অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। এহেন গোজাতিকে হিন্দু দেবতা বলিয়া যে পূজা করে, তাহা ন্যায়ানুমোদিত। যাহাতে এই গোজাতির উন্নতি সাধন হয় তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য। হিন্দু ও মুসলমান প্রজা এবং সভ্য-দিগের সম্মতিক্রমে এই নির্দ্দিষ্ট হইল যে, এ রাজ্যে কেহ গোবধ করিতে পারিবেন না। আহ্লাদের কথা যে, মুসলমান প্রজাগণ বলিতেছেন যে, কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশে যেরূপ গোজাতির পরিবর্ত্তে উষ্ট্র, মেষ, ছাগ প্রভৃতি পশু ইদের সময় বিনষ্ট হয়, সেইরূপ প্রথা তাঁহারাও এই রাজ্যে প্রবর্ত্তিত করিবেন। প্রতিবৎসর গোপ্রদর্শনী মেলা হইবে ও উৎকৃষ্ট গো দেখাইতে পারিলে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাজা নরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুর।

অভিষেকের পর প্রায় তিন মাস অতীত হইয়াছে। একদিন নরেন্দ্রলাল বাবু রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণশঙ্করকে লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শঙ্করী পুত্রকে দেখিবার জন্য বড়ই উদ্‌গ্রীবা হইয়াছেন; হইবারই কথা, কারণ দীর্ঘ কারাবাসের পর কৃষ্ণশঙ্কর তিন চারি দিন মাত্র নারায়ণগড়ে বাস করিয়াই, রঘুনাথগড়ে আসিয়াছিলেন। রাণী কমলকুমারী তাঁহার আগমন শ্রবণ করিয়াই পূর্ণচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"বৎস, উইলের মর্ম্মানুসারে যোগেশ্বরীর পাণিগ্রহণ কর। সম্মুখে ফাল্গুন মাস, দিন প্রশস্ত, তোমার অভিপ্রায় হইলে একদিনে ভাই ও ভগিনীর বিবাহ দিয়া জীবনের সমুদয় সাধ মিটাইব।"

এতদিন যেন পূর্ণচন্দ্র নিদ্রিত ছিলেন, কথা শুনিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল। হস্ত হইতে পা অবধি থর থর কম্পিত হইতে লাগিল, হৃদয় গুর্ গুর্ করিতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া রাজার যাহা কর্ত্তব্য, এতদিন তাহাই করিতেছিলেন। নিজের সুখে একেবারে উদাসীন ছিলেন; উইলের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন প্রতি পংক্তি, প্রতি অক্ষর তাঁহার স্মরণ-পথে পতিত হইল। তিনি বিবশ হইয়া নিরুত্তর রহিলেন, লজ্জায় মাতার দিকে মুখ ফিরাইতে পারিলেন না। কমলকুমারী একবার,

দুইবার, তিনবার প্রশ্ন করিলেন। অবশেষে পূর্ণচন্দ্র কহিলেন,—"না, বিবাহ করিতে হইবে, ইহা আমার মনেও উঠে নাই; আমি কি স্থির করিব তাহার নিশ্চয়তা এখনও নাই। নরেন্দ্রলাল বাবু যখন আসিয়াছেন, তখন প্রভাবতীর বিবাহ অগ্রে হউক।" কমলকুমারী আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, তবে বুঝিলেন, এ বিবাহে পুত্রের সর্ব্বতোভাবে সম্মতি নাই; অগত্যা তিনি সমারোহে প্রভাবতীর বিবাহের আয়োজন করিলেন।

এতদিনের পর শুভক্ষণে, প্রভাবতী সর্ব্বগুণসম্পন্ন কৃষ্ণশঙ্করকে আশ্রয় করিলেন; যেন হরিৎপত্রশোভিত সুন্দর ও বিশাল রসালকে, প্রদীপ্ত-প্রস্ফুটিত-শোভাশালিনী মাধবীলতা পরিবেষ্টন করিল। কমলা উভয়কে যথাযোগ্য বসন-ভূষণে ভূষিত করিলেন, শেষে উভয়ের গল-দেশে গজমুক্তাহার প্রদান করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সপ্তদিন অতীত হইলে পর, কন্যা মাতার নিকট বিদায় লইতে উপস্থিত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ-ধূলি পুনঃ পুনঃ মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। কমলকুমারী অতি কষ্টে মুখচুম্বন করিতে সমর্থা হইলেন। উভয়ে গলা ধরিয়া কতক্ষণ কাঁদি-লেন। সময় বসিয়া থাকিতে চাহে না। লগ্ন উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া কুলপুরো-হিত রাণীকে সংবাদ দিলেন। অগত্যা রাণী কন্যাকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন।

প্রভা পূর্ণচন্দ্রের কক্ষে গমন করিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিয়া ছল ছল নেত্রে কহিলেন,—"দাদা, আমার কি একটী কথা রাখিবে?"

পূর্ণ। কেন প্রভা, আজ বিষণ্ণ বদনে এমন মর্ম্মভেদী স্বরে একটী কথার ভিখারিণী হইয়াছ? তোমাকে আমার কি অদেয় আছে?

প্রভা। আমি যখন অনাথিনীর ন্যায় ছিলাম, তখনও তোমার যত্নের

ও আদরের ত্রুটী ছিল না; হতভাগিনী বলিয়া একটী কথাও উপেক্ষা কর নাই। ভগ্নীকে যেরূপ ভালবাসিতে হয়, ঠিক সেইরূপই ভালবাসিয়াছিলে? আজ কি বিধাতা আমাকে বিড়ম্বনা করিবেন?

পূর্ণ। এমন কাতরা, এমন দীনা হইয়া আমার সহিত আলাপ করিতেছ কেন? আমি তোমার নিকট যে রতিকান্ত সেই রতিকান্ত ত এখনও আছি।

প্রভা। দাদা, মা বড় হতভাগিনী, পিতার শোকে উন্মাদিনীপ্রায়, বিশেষতঃ আমি আবার চলিলাম। এখন তাঁহার দুঃখ সমুদ্রজলের ন্যায় উথলিয়া উঠিতেছে। এখন তুমি তাঁহার কষ্টের হেতু হইলে, তাঁহার হৃদয়ে দুঃখের স্থান হইবে না,—হয়ত সেই শোকে অসময়ে আমাদের নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে পারেন।

পূর্ণচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,—"প্রভা, আমি সকলই বুঝিয়াছি, তোমার চিন্তার বিষয় কিছুই নাই। আত্মসুখের জন্য যে দেবপ্রতিম পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়, তাহার ন্যায় নরাধম পশু এ পৃথিবীতে নাই। আমি স্বার্থত্যাগের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত, সেজন্য তুমি কেন অনুরোধ করিবে? আমি সকল বিষয় স্থির চিত্তে না দেখিয়া কোন কার্য্য করিব না।"

প্রভা আশ্বস্তা হইয়া পুনরায় চরণধূলি গ্রহণ করিলেন, পূর্ণচন্দ্র তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ লইয়া বিদায় দিলেন। তিনি কৃষ্ণশঙ্করকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"ভাই, প্রভা তাহার নিজের বাটীতে আপনার লোকের নিকট ফিরিয়া যাইতেছে, তাহার বিষয় আর কি বলিব? তবে আন্তরিক ইচ্ছা—তোমরা উভয়ে যেন চিরসুখী হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ কর।"

শিবিকা, গজ, অশ্ব, সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহারা অনতিবিলম্বে

দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। চারিদিনে নারায়ণগড়ে পৌছিলেন। শঙ্করী আহ্লাদে আটখানা হইয়া যথারীতি পুত্র ও পুত্রবধূকে বরণ করিয়া ক্রোড়ে ধারণ পূর্ব্বক অনবরত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতীর রূপ গুণ আজ পূর্ণমাত্রায় তাঁহার চক্ষে পড়িল। সেই নবনীত-কোমল অপূর্ব্বরূপরাশি আজ তাঁহাকে মোহিত করিল। সৌভাগ্যগর্ব্ব হৃদয় হইতে উথলিয়া উঠিল। তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম্য যেন আজ অপরূপ শোভা ধারণ করিল; আজ যেন সতীর পদরেণু পড়িয়া কৈলাস পবিত্র হইল।

কতক্ষণ পরে প্রভা কক্ষান্তরে গমন করিলে, বিনোদিনী দ্রুত আসিয়া তাঁহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিলেন, কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—"বোন্, আমার ন্যায় হতভাগিনী এ সংসারে কেহ নাই; আমি না বুঝিয়া তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি, তাহা মনে হইলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। ভগিনি, অল্পবয়সে আমি মাতৃপিতৃহীনা হইয়াছি,—পিতামাতার স্নেহ যে কেমন, আমি বুঝিতে পারি নাই। আমার কর্ম্মদোষে অবশেষে বিধাতা আমার প্রায়শ্চিত্তের জন্য, আমাকে স্বামীধনে বঞ্চিত করিয়াছেন।" এই বলিতে বলিতে দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। এই সময় বামা প্রভার পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিল,—"এ পাপিনীকে ক্ষমা না করিলে আজ এই দণ্ডে চক্ষের সাম্‌নে আত্মহত্যা করিব।" এই বলিয়া সে ভূমিতে মাথা ঠুকিতে লাগিল। প্রভা তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন; মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—"বামা, কাহারও উপর আমার অণুমাত্র রাগ নাই—আমি পূর্ব্বকথা সকল ভুলিয়া গিয়াছি, সে সব কথা তুলিবার আর আবশ্যক কি?" অবশেষে বিনোদিনীকে বলিলেন,—"দিদি, এখন এস আমরা পূর্ব্বকথা ভুলিয়া সকলে একমন ও একপ্রাণ হইয়া সুখে দিনপাত করি।" বামা এই সময় ভবকে লইয়া পুনরায় উপস্থিত হইলে পর, প্রভা

তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। বালক মধুর হাসিয়া বলিল, "মা, এই কি খুড়ী মা—এযে পিসি মা।"

এই সময় বাহিরে যেন উচ্চ হাসির শব্দ উঠিল। অনতিবিলম্বে কেশবশঙ্কর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শঙ্করী আহ্লাদে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। কাঁদ-কাঁদ মুখে কহিলেন,—"বাবার আমার পূর্ব্বের শ্রী আর নাই, মুখ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে; হাঁ বাবা, শরীরে কোন অসুখ হয় নাই ত?"

কেশ। না মা, আমি বেশ ভাল আছি, আমাকে নরকে বেশীদিন থাকিতে হয় নাই—আপীলে শীঘই মুক্ত হইয়াছিলাম।

শঙ্ক। তবে বাবা, আমাকে দুঃখিনী ক'রে এতদিন কোথায় ছিলে?

বিনোদিনীর হৃদয়-সরোবরে তরঙ্গ উঠিতেছিল। এই সময় তিনি বাহির হইয়া বলিলেন,—"এ কি লজ্জার ভয়ে এতদিন এস নাই?"

কেশ। সে কথা কি আবার জিজ্ঞাসা করিবে!

কেশব নিজ কক্ষে গমন করিয়া বিনোদিনীর হস্তে একটী ক্ষুদ্র বাক্স দিয়া বলিলেন,—"কখন ইহার চাবী খুলিও না—খুব সাবধানে সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিবে।"

বিনো। বলি এ কিসের বাক্স—খুলিব না কেন? তবে আনিবার আবশ্যক কি?

কেশ। অনেক কৌশলে দুর্দ্দমনীয় পাপকে ইহার ভিতর পূরিয়া রাখিয়াছি,—দেখ, যেন বাক্স ভাঙ্গিয়া কোন প্রকারে বাহির হইয়া না পড়ে, তাহা হইলে আবার তোমার বিপদ উপস্থিত হইবে।

বিনো। (হাসিয়া) আজ আমি নবজীবন পাইলাম। এমন

স্নেহমাখা, এমন সরল, এমন হাসি-হাসি কথা যে কি মিষ্ট, তাহার স্বাদ এতদিন পরে বুঝিতে পারিলাম।

কেশ। এখন প্রতিদিন এই মিষ্ট খাইয়া শেষে না তোমার ব্যারাম হয়, এই ভয়!

বিনো। এ পোড়া পেটের কি অসুখ আছে, না স্থানের অভাব আছে; দেখিব তোমার ভাণ্ডারে কত আছে।

কেশ। তা আমি জানি, স্ত্রীলোকদিগের পেটই সর্ব্বস্ব।

বিনো। যত পার বল, গ্রীষ্মের পর বর্ষা বড় ভাল লাগে।

এই সময় ভব আসিয়া বিপুল রবে "বাবা বাবা" করিয়া ডাকিতে লাগিল। কেশবশঙ্কর তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া অকৃত্রিম বিমলানন্দ উপভোগ করিলেন। এদিকে বামা চীৎকার করিয়া গৃহিণীকে কহিল,—"মা, বাবার আজ আহ্লাদের শেষ নাই, তিনি বৌভাতে লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন; গ্রামের লোকেরা শুনিয়া বলিতেছে, বড় লোকের বাটীতে বৌভাতে অন্নক্ষেত্র হয়, কিন্তু এ বৌভাতে স্বর্ণক্ষেত্র হইয়াছে। হাঁ মা, ক' কুড়িতে লক্ষ টাকা হয়?"

শঙ্ক। (হাস্য করিয়া) তুকুড়ি দশ টাকায় এক লাখ হয়।

বামা। (চকিত হইয়া) ও বাবা! সে যে অনেক টাকা। এত টাকা বাবা একেবারে দান করিতেছেন!

বাস্তবিক নরেন্দ্র বাবুর হৃদয় আজ বিশ্বজনীন প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। তিনি দেখিতেছেন, ভগবানের কৃপায় তাঁহার কোন মনোবাঞ্ছা জীবদ্দশায় অপূর্ণ রহিল না। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' তাহা তিনি বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছেন। হৃদয়বান্ ও ন্যায়বান্ ভূম্যধিকারী বলিয়া প্রত্যেক প্রজা তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি সহকারে পূজা করে। অগ্নির উত্তাপে স্বর্ণ যেমন বিশুদ্ধ হয়, কেশবশঙ্করের অবস্থাও তাদৃশ হইয়াছে। তাঁহার

সহিত বাক্যালাপ করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, যে অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার নাম কেশব রাখিয়াছিলেন, এতদিনের পর সেই অদ্বিতীয় কেশবের কৃপায় তাহা সার্থক হইয়াছে। কৃষ্ণশঙ্কর জগতে বীর ও ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য বলিয়া পূজিত ও ঘোষিত হইয়াছেন। শেষে করদ-রাজশ্রেষ্ঠ মহারাজা শশধর রাওএর গৌরবান্বিতা কন্যা তাঁহার পুত্রবধূ হইয়াছেন। ভগবানের দিকে তাঁহার ভালবাসা ও ভক্তির উৎস এমন ছুটিয়াছে যে, রোগশয্যায় অসমর্থ হইয়া তিনি তাঁহার দেওয়ানকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে কহিলেন,— "বসুজ মহাশয়, জীবনের শেষ ভাগে আমি উপস্থিত হইয়াছি, এখন প্রাণ থাকিতে থাকিতে জন্মভূমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য কোন চিরস্থায়ী কার্য্য করিয়া যাইতে পারিলে আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিব।" এই বলিয়া তিনি মুখে মুখে বলিতে লাগিলেন, বসুজ মহাশয় লিখিতে লাগিলেন। লেখা শেষ করিয়া দেওয়ানজী এইরূপ পাঠ করিলেন:—

"আমি সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় দেশের সর্বকিঞ্চিৎ উপকার সাধনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে বিশ লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিলাম। এই টাকার উপস্বত্বে—(১) প্রতিবৎসর ৪ জন বঙ্গীয়যুবক সিবিল সার্বিস ও মেডিকেল সার্বিসপরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে। কল, কৌশল, শিল্প, কৃষিতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ৭ জন যুবাকে ঐরূপ প্রতিবৎসর ইংলণ্ডে পাঠাইতে হইবে। তাঁহারা পাঠ সমাপন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইলে উপযুক্ত মূলধন দিয়া কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইবে।

(২) পুষ্করিণী খনন, বর্ত্মনির্ম্মাণ, বিদ্যা ও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়, বাঙ্গালা ও ইংরাজি চিকিৎসার জন্য দাতব্য ঔষধালয়ের ব্যয়, ধর্ম্মপরায়ণা নিঃস্বা স্ত্রী, সদ্‌গুণযুক্ত ও স্বধর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব প্রভৃতির, আবশ্যক হইলে, আজীবন ভরণপোষণের ভার ও দুর্ভিক্ষ-

পীড়িত লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের সাময়িক ভার বহন করিতে হইবে। ইতি”——

এই আশাতীত দানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জেলার কালেক্টর সাহেব অতিশয় সুখী হইয়া তৎক্ষণাৎ যথারীতি এই বিষয় তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল মহানুভব লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের গোচর করিলেন। তিনি অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়া, নরেন্দ্র বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া পত্র লিখিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজা বাহাদুর উপাধি দানে উৎসাহিত করিলেন। তিনি উচ্চ উপাধিতে ভূষিত হইলেন সত্য, কিন্তু মনের মধ্যে অতিদীনভাবে, কেবল নারায়ণকে স্মরণ করিয়া, কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে অধিকতর যত্নশীল হইলেন।

তৃতীয় খণ্ড।

শেষ জীবন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সংকল্প।

প্রাসাদের এক নির্জ্জন কক্ষে কৃষ্ণচন্দ্র উপবেশন করিয়া আছেন। মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে। শরীর উত্তপ্ত। মন নিতান্ত বিমগ্ন, যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। কোথায় কোন দিকে যে যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। দুঃখসাগরের বিশাল বক্ষে দাঁড়াইয়া ভাবিবার একটু স্থান পর্য্যন্ত নাই। আজ কুলপুরোহিত ভবানীশঙ্কর তাঁহাকে উইলের মর্ম্মানুসারী বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন,—"মহারাজ, যোগেশ্বরীকে বিবাহ করিয়া স্বর্গীয় অধীশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণ করিতে রাজ্ঞী অনুমতি করিয়াছেন। এই শুভ-কার্য্যে বিলম্ব হইলে, অথবা এককালে না হইলে, ভবিষ্যতে নানা আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। বিশেষতঃ রেসিডেণ্ট সাহেব কেবল রাজ্ঞীর অনু-

রোধে মহারাজার অভিষেক অনুমোদন করিয়াছিলেন। সমুদায় জানিতে পারিলে হয়ত নানা আপত্তি এখন উত্থাপন করিতে পারেন। এদিকে স্বর্গীয় মহারাজার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সন্নিকট হইয়াছে। যোগেশ্বরীকে বিবাহ না করিলে, আপনি পিণ্ডের অধিকারী হইতে সমর্থ নহেন।

পূর্ণচন্দ্র ভবানীশঙ্করের কথা শুনিয়া স্তব্ধ হইলেন। পরে কহিলেন,—"দেব! যখন রাজা হইবার পূর্ব্বেই আমি শরৎসুন্দরীকে বিবাহ করিব বলিয়া বাক্য দিয়াছি, তখন বিবাহ হইয়াছে বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। শাস্ত্রানুসারে কেবল পাণিগ্রহণ বাকী আছে। এখন আমি কেমন করিয়া দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিব?"

ভবা। দ্বিতীয় ভার্য্যা গ্রহণ করিতে শাস্ত্রে কোথাও নিষেধ নাই; দেশাচার বা লোকাচার-বিরুদ্ধও নহে।

পূর্ণ। কেমন করিয়া, দেব! এখন একজনকে অকারণে হৃদয় হইতে চিরনির্ব্বাসন করিয়া অপরকে গ্রহণ করিব? পুরুষ ও প্রকৃতি-যোগে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা সেই পুরুষের ও স্ত্রী সেই প্রকৃতির প্রতিবিম্ব মাত্র। একবার পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ হইলে, জীবনে ও মরণে তাহার বিয়োগ হয় না। একবার একজনকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলে আর দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণে স্বামীর অধিকার থাকে না। সেইরূপ স্ত্রীও দ্বিতীয় পতি গ্রহণে অধিকারিণী নহেন। আত্মায় আত্মায় যে মিলন, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সেই মিলনের নামই বিবাহ। দেব! আর কি আমার অন্য স্ত্রী গ্রহণে অধিকার আছে?

ভবা। বিবাহের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আপনি যেরূপ করিলেন, তাহাই শাস্ত্রসম্মত,—কিন্তু এদিকে যোগেশ্বরীকে বিবাহ না করিলেও দারুণ অশুভোৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। এখন কি কর্ত্তব্য, মহারাজ! স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন?

পূর্ণ। দেব; চিন্তা করিবার সময় আবশ্যক। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া পরে বলিব।

কুলপুরোহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহারাণার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযথ বিবৃত করিলেন।

এদিকে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, শরৎসুন্দরীর সহিত পরামর্শ করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, পূর্ণচন্দ্র দ্রুতপদে তাঁহার আলয়ে চলিয়া গেলেন।

তপন অস্তমিতপ্রায়। সন্ধ্যাগগনে দুই একখানি লাল মেঘ নীলাকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে। সেই লাল আভা বৃক্ষ, বল্লরী, নদী, পর্ব্বতচূড়া প্রভৃতি যে যে স্থানে পড়িয়াছে, তাহাকেই লাল করিয়াছে। সন্ধ্যার সেই লাল আভা বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া শরৎসুন্দরীর মুখখানিকে দ্বিগুণ লাল করিয়াছে। যেন বিশুদ্ধ স্বর্ণে কে রসায়ন দিয়াছে? যেন দিনান্তে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মুখ নত করিয়া গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া তিনি কি পড়িতেছেন। হস্তে পুস্তক আছে; কিন্তু মন পুস্তকে নাই। মন নানা দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। মৃদুবায়ুহিল্লোলে নদীবক্ষে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিয়া খেলা করে, সেইরূপ একটি একটি চিন্তার লহরী উঠিয়া শরতের অন্তর্জ্জগতে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কি যে চিন্তা করিতেছেন, তাহারও একটা শৃঙ্খলা নাই; কিন্তু যত প্রকারের চিন্তা উঠুক না, সকল চিন্তার শেষে 'অদৃষ্টে কি আছে' এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে পড়ে এবং মনে পড়িলেই মন কেমন আকুল হইয়া উঠে।

এই সময় পূর্ণচন্দ্র শরৎসুন্দরীর সম্মুখীন হইলেন। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পুলকে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। শরীর হইতে যেন অপূর্ব্ব তেজঃ নির্গত হইতে লাগিল। পূর্ণচন্দ্রের

বোধ হইল যেন অকস্মাৎ শতদল-পদ্ম তাঁহার সম্মুখে বিকসিত হইয়া উঠিল। কুন্দদন্তাবলি অরুণোষ্ঠের উপর বাহির হইল। যৌবন-বিভক্ত শরীর ঢলঢল করিল। এমন সরলতা, এমন সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখ দেখিয়া তাঁহার মনে হইল স্বর্গ হইতে যেন দেবকন্যা পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। শরৎসুন্দরী কি বলিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের গম্ভীর ও ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরে ত্রাস জন্মিল; কৃষ্ণা রজনীকে সম্মুখে দেখিয়া যেন সন্ধ্যা সহসা ম্লানা হইয়া গেল। তিনি অনুচ্চস্বরে বলিলেন,—"কান্ত, আজ কেন স্বভাবের অভাব ?" পূর্ণচন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"বিশেষ পরামর্শ আছে, তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নহি।" একটু পরে আত্মগত বলিলেন,—"এও আবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? এখন কি বিবেচনার সময় আছে ? আমাকে ধিক্, আর আমার পরামর্শকেও ধিক্।"

পূর্ণচন্দ্রের অন্তর যেন জ্বলন্ত অনলে ক্রমে পুড়িয়া উঠিল। শেষ চিন্তা স্মরণ করিয়া তিনি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ভীতিবিহ্বলা হরিণীর ন্যায় শরৎ মৃদুমধুর বচনে বলিলেন,—"কান্ত, আজ এত অশান্ত কেন ? মনে কি উদ্বেগ হইয়াছে, আমাকে বলিলে আমি কি কোন প্রতিকার করিতে পারিব না ?" পূর্ণচন্দ্র সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'মৃত্যুই এখন প্রতিকার,—কিন্তু তোমাকে দেখিলে আমার সকল কষ্ট সহ্য করিয়াও অমর হইতে ইচ্ছা হয়।"

শর। অন্ধকারে থাকিয়া আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমার শরীর ও মন অবশ হইয়া আসিতেছে, আর আমার যাতনা বৃদ্ধি করিও না। বিষয় যত গুরুতর হউক না, আমাকে বল, দেরি করিও না'।

পূর্ণ। পিতার উইলের কথা। তিনি উইলে লিখিয়াছেন যে, আমি যোগেশ্বরীকে বিবাহ না করিলে তাঁহার পুত্র বলিয়া গণ্য হইব না।

হস্ত, পদ ও মুখ-বদ্ধ হরিণীর উপর যদি কেহ সহস্র বাণ এক সময়ে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে সে যেমন নীরবে সহ্য করে, শরৎ-সুন্দরীও সেইরূপ নিঃশব্দে এই কঠিন বজ্রাঘাত হৃদয়ে ধারণ করি-লেন। দারুণ স্বপ্নের কথা ধ ধ করিয়া মনে উঠিল। তিনি চতুর্দ্দিকে আঁধার দেখিলেন; বুঝিলেন এ জন্মে আর শান্তি নাই। কষ্টের জন্যই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি মনে মনে অধীরা হইলেন, কিন্তু বাহ্যদৃশ্যে এত স্থির রহিলেন যে, পূর্ণচন্দ্রও তাঁহার হৃদয়ের অশান্তি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে শরৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন; গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"কান্ত, এই জন্য তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ? পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে।"

পূর্ণ। আমার এখন কি কর্ত্তব্য?

শর। যোগেশ্বরীকে বিবাহ করাই তোমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তোমার পিতৃ-আজ্ঞা পালন এবং চিরদুঃখিনী মাতাকে সুখী করা হইবে। তোমার জন্য মহারাজ শশধর ভগ্নমনোরথ হইয়া অসময়ে করাল কালের বশীভূত হইয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী চিরদিন জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হইয়া আসিতেছেন। তাঁহার মনে কষ্ট দিলে ঈশ্বরের রাজ্যে তোমার স্থান হইবে না। পুত্র হইয়া পুত্রের কার্য্য করিতে অযত্ন বা ত্রুটী করা পাপাত্মা ও কাপুরুষের ধর্ম্ম।

পূর্ণচন্দ্রের ম্লানমুখে হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি এত যোগের কথা জানিতে, আমি তা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। পুত্রের কর্ত্তব্য দেখাইলে, এখন শরতের উপর আমার কি কর্ত্তব্য, একবার তাহা বল দেখি?"

শর। যোগেশ্বরীকে বিবাহ করিলে শরতের কি ক্ষতি হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। রসালের সুখ না থাকিলে কি লতিকা কখনও সুখী হইতে পারে? তুমি স্থির থাকিলেই আমি শান্তিতে থাকিব।

পূর্ণ। আমার সমস্যা বড় গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

শর। এর আর সমস্যাই বা কি, আর চিন্তার বিষয়ই বা কি? পৃথিবীতে মাতা পুত্রের সাক্ষাৎ দেবী। পিতা মাতার সহিত অন্য কোন বস্তুর তুলনা করিলে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর হইবে। তোমার মত জ্ঞানী ব্যক্তির এমন গুরু ফেলিয়া কি লঘু দ্রব্যে মন দেওয়া উচিত? তুমিই না একদিন বলিয়াছিলে যে, মেসিদোনের রাজা বীর আলেক্জাণ্ডার তাঁহার মন্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন যে, মাতার এক বিন্দু চক্ষের জলে, তাঁহার শত শত অনুযোগ-পত্র ভাসিয়া যাইবে। লোকরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। পিতার সত্য পালনের জন্য প্রশান্তবদনে বনগমন করিলেন। দুর্দ্দান্ত ভীম ভ্রাতৃ-অনুরোধেই কেবল কুরুসভায় দ্রৌপদীর অবমাননা সহ্য করিয়া, শেষে দ্বাদশ বর্ষ বনবাসক্লেশ স্বীকার করিলেন। এও কি আবার আমায় তোমাকে বুঝাইতে হইবে? তুমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন না করিলে, তোমাকে লোকে কাপুরুষ বলিবে, এমন নির্ম্মল চরিত্রে কত দোষারোপ করিবে, তাহা আমার প্রাণ থাকিতে আমি কেমন করিয়া সহ্য করিব? না কান্ত, তাহা কখনও হইবে না। ঋষি-মহর্ষিরা যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তুমি তাহাই আশ্রয় কর।

শরৎসুন্দরীর মনে মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি এ সংসারে আর কোন ক্রমে পূর্ণচন্দ্রকে লাভ করিতে সমর্থা হইবেন না সেই জন্য ভাবিলেন, আমার সুখ ত জন্মের মত ফুরাইয়াছে, কিন্তু তাই

বলিয়া কান্তকে কেন অসুখী করিব? এখন তিনি সুখে থাকিলেই সকল দিক রক্ষা হইবে। এই জন্য শরৎসুন্দরী অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক মনের বেগ সংযত করিয়াও বুঝাইতেছিলেন। তাঁহার স্বর কম্পিত, ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ ও ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু উত্থিত হইতেছিল। নয়ন-প্রান্তে জলরাশি ইঙ্গিতের অপেক্ষায় যেন বসিয়া ছিল।

নীরবে গম্ভীরভাবে পূর্ণচন্দ্র বসিয়া রহিলেন। মুখে একটীও কথা নাই। শরীর অসাড় ও নিষ্পন্দ। দৃষ্টি স্থির ও নিম্নদিকে। অবস্থা দেখিয়া শরতের হৃদয় কেমন কম্পিত হইল, কিন্তু কোন কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। পূর্ণচন্দ্র উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছিলেন,—"বিধাতঃ, মনুষ্যের সুখ দুঃখ সকলই তোমার ইচ্ছার উপর। তুমি মনে করিলেই, উইলের ঐ পংক্তিদ্বয় তুলিয়া লইয়া আমার জন্য ইহকালে অনন্ত সুখ পরিমিত করিতে পারিতে। কিন্তু তোমার ইচ্ছা স্বতন্ত্র। দাবানলে দগ্ধ করাই তোমার সঙ্কল্প, তাহাও কেবল আমাকে নহে—অনেক লোককে—এক সময়ে—এক স্থানে। তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি কর, কিন্তু আমি এ দেহে প্রাণ থাকিতে আমার প্রতিজ্ঞা কখন ভঙ্গ করিতে পারিব না।" ক্রমে ভাবে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"আমি রাজ্য ছাড়িয়া প্রফুল্লচিত্তে বরং বনে বাস করিব, তথাপি এ হিরণ্ময়ী প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া একদণ্ড এ রাজ্যে বাস করিতে পারিব না। শরৎ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক; এ হৃদয়ে কোন কীট প্রবেশ করিয়া, এই প্রণয়কুসুম নষ্ট করিতে পারিবে না।"

এই সময় আকাশে বিজলী ক্রীড়া করিতে লাগিল। দূরে মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হইল। শন্ শন্ শব্দে বায়ু বহিতে লাগিল। মাঘের আকাশে অনৈসর্গিক ঘটনা সংঘটিত হইল। পূর্ণচন্দ্র উঠিয়া

দাঁড়াইলেন। দুই হাতে শরৎকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। তিনি স্থির পুত্তলীবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। কেবল ভাবিলেন,—"এই বুঝি শেষ আলিঙ্গন, ইহজন্মের সাধ এই শেষ হইল।" নিশা উত্তরোত্তর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র বিদায় হইলেন।

এতক্ষণ শরতের ধৈর্য্য ছিল। এখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। বাতাহত কদলীর ন্যায় শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িলেন। বোধ হইল যেন অসীম সমুদ্রের গম্ভীর জলে ঝাঁপ দিলেন! আজ আশালতা সমূলে ছিন্ন হইল!!

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—

দেবালয়ে।

বাটীর বাহির হইয়া পূর্ণচন্দ্র দেখিলেন যে, বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছে। একে শীতকাল, তাহাতে প্রবল বায়ু; সুতরাং শীতের মাত্রা এত অধিক হইয়াছে যে, পথে আর জনপ্রাণীর সমাগম নাই। তিনি দ্রুত রঘুনাথের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। এক তরুমূলে, এক দীনহীন ভিক্ষুকের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সহিত নিজের পরিহিত পরিচ্ছদ বিনিময় করিলেন। মনের ইচ্ছা যে, তিনি ছদ্মবেশে যখন মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ তাঁহার মনের একাগ্রতা নষ্ট করিতে পারিবে না। যখন মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, যেন কোন ব্যক্তি সেই অন্ধকার নিশীথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে। তিনি দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। পরিচ্ছদে তাহাকে ভদ্র লোক বলিয়া মনে হইল; কিন্তু সে পরিচ্ছদ যে অবয়ব আচ্ছাদিত করিয়াছে, তাহা অতি হীন বলিয়া বোধ হইল। আগন্তুক করুণস্বরে বলিল,—"মহাশয়, এইরূপে কি আমার সর্ব্বনাশ করিতে হয়? আমি দরিদ্র ভিক্ষুক বটে, কিন্তু আজ অবধি আমাকে কেহ চোর বলিয়া কখন অপবাদ দেয় নাই। আপনার আবশ্যক বলিয়া আমি আমার ছিন্ন বস্ত্র আপনার মূল্যবান পরিচ্ছদের সহিত বিনিময়ে সম্মত

হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনার অর্থ গ্রহণ করিতে আমার কোন অধিকার নাই।” এই বলিয়া জামার পকেট হইতে স্বর্ণমুদ্রা-সম্বলিত একটী ক্ষুদ্র ব্যাগ বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে দিবার উদ্যোগ করিল। পূর্ণচন্দ্র ভিক্ষুকের কথা শুনিয়া ও ব্যবহার দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন,—“এই জীর্ণ শীর্ণ দেহাভ্যন্তরেও এমন পবিত্র আত্মা বিরাজিত রহিয়াছে!” তিনি প্রফুল্লচিত্তে বলিলেন,—“ভাই, তোমার যে অঙ্গে এই জীর্ণ বস্ত্র জড়িত ছিল, যদি এই সামান্য অর্থে তাহার কিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারি, তাহা হইলেও আমি আপনাকে ধন্য বিবেচনা করিব। তোমার ইচ্ছা হইলে এই টাকা নিজ কার্য্যে বা কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যয় করিলে আমি চরিতার্থ হইব।” এই বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাত্রি অধিক হইয়াছে, বিশেষতঃ ভয়ানক শীত পড়িয়া গিয়াছে, এই জন্য মন্দিরে বা প্রাঙ্গণে লোকজনের সমাগম ছিল না বলিলেও হয়। তিনি মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বর্ত্তিকার উজ্জ্বল আলোকে দেখিলেন,—সেই নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি চারি হস্ত প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। তিনি বিষণ্ণ বদনে, গলবস্ত্রে, যোড়হস্তে, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—“প্রভো! আজ আমি দুস্তর বিপদ্-সাগরে পতিত হইয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছি। আজ তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে জ্ঞানোপদেশ দাও। দেব! এ সংসারে আসিয়া অবধি আজন্ম দুঃখ ভিন্ন সুখ উপলব্ধি করিবার অবসর হয় নাই। আমি কাতরে, করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেছি।” আজ তিনি কত কাঁদিলেন, বার বার কত সাধনা করিলেন, কিন্তু মূর্ত্তি প্রস্তরবৎ স্থির রহিলেন। নৈরাশ্যের স্রোতে তিনি ভাসিয়া গেলেন, চক্ষু হইতে দর দর জল পড়িতে লাগিল,

চতুর্দ্দিক আজ শূন্য দেখিলেন। একান্ত ভগ্ন হৃদয়ে তিনি মৃত্তিকা হইতে উঠিলেন। প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিয়াছেন, এমন সময় ভগবানের পূর্ব্বকথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়াছিলেন - "অনন্ত সময়ের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র এই সংসারের স্থিতি।" তখন বিগলিতচক্ষে, উৰ্দ্ধমুখে, করযোড়ে বলিলেন,—"প্রভো! তবে কি এ সংসারে আমার আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল? তবে কি আমি এ জীবনে কেবল দুঃখভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য, তোমার লীলা বুঝিতে অক্ষম।" তিনি আর বলিতে পারিলেন না। ভাবে কণ্ঠ রোধ হইল। নিতান্ত বিমগ্ন হৃদয়ে, অধোমুখে দেবালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদাভিমুখে চলিয়া গেলেন। গুপ্ত দ্বার দিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

তিনিও চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় শিবিকারোহণে রাণী কমলকুমারী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথকে ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করত, চক্ষুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে অস্ফুট শব্দে হৃদয়ের দারুণ বেদনা নিবেদন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এই ভাবে প্রার্থনা করিয়া তিনি বহির্গত হইলেন। সদানন্দ তাঁহার জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাণীকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি আসনে উপবেশন করিয়া তদ্গতচিত্তে ভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন। রাণী উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন মা, এমন ব্যস্ত হইয়া এ শীতে আজ মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছ?"

রাণী। গুরুদেব! আপনি ত অন্তর্য্যামী, সকলই জানিতেছেন—আজ ঘোর বিপদ্-সাগরে পতিতা হইয়া দেবতার ও আপনার শরণ লইতে আসিয়াছি। আজ আমাকে রক্ষা করুন।

গুরু। এক ভগবানই সকলের রক্ষাকর্ত্তা। তিনি সময়ে সময়ে এমন অবস্থার সৃজন করেন যে, মনুষ্য তাহার কোন কারণ আবিষ্কার করিতে পারে না। কেন তিনি ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কহিতে প্রলোভন দিলেন? কেন তিনি দুর্য্যোধনকে সূচ্যগ্র ভূমি দান করিতে নিষেধ করিলেন? কেন তিনি দেবোপম রামচন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া তাঁহাকে ও সীতাকে অসীম দুঃখে ভাসাইয়া দিলেন? কেন তিনি রাবণকে দুর্ব্বৃত্ত করিয়া সবংশে নিধন করিলেন? এই সকল তত্ত্ব তিনিই জানেন। এ সংসারে মনুষ্যকে তিনি এ রহস্য ভেদ করিতে দিবেন না। তবে মনুষ্যকে শান্তি দিবার জন্য এই সংসারে তিনি নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যখন সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, ফলে ও নিষ্ফলে সমান তৃপ্তি, জীবনে ও মৃত্যুতে একই ভাব হইবে, তখনই নিষ্কাম ধর্ম্মের সুখ মনুষ্য অনুভব করিবে। মা, এই দুই দিনের সংসারে সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি?

রাণী। প্রভো, আমি সমুদায় বুঝিতেছি, কিন্তু আমার দেব-দুর্ল্লভ পুত্রকে কিছুতেই অসুখী দেখিতে পারিব না। কিছুতেই সে পুত্র বিহনে আমি একদণ্ড জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আপনি আমার পূর্ণচন্দ্রকে নিষ্কাম ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন, যেন আমাদের জীবিতকাল সুখে ও শান্তিতে চলিয়া যায়।

গুরু। মা, আমি যে এতকাল ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বন করিয়া ভগবানের পূজা করিবার চেষ্টা পাইলাম, তাহা আমার বৃথা বোধ হইতেছে। যে দিন আমি প্রথমে এই মন্দিরে পূর্ণচন্দ্রকে দেখিলাম, তখনই বুঝিলাম কোন যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসী বা অভিশপ্ত ইন্দ্র সুরলোক হইতে মর্ত্তে আগমন করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মচারী না হইলেও সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন, রাজকোষে এত অর্থ সঞ্চিত থাকিতেও

অদ্যাবধি এক কপর্দ্দকও আত্মসুখে ব্যয় করেন নাই, সামান্য লোকের ন্যায় পদব্রজেই একাকী ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান, কোন বিষয়ে আসক্তি দেখি নাই, কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সাধনের জন্য জীবন সমর্পণে প্রস্তুত; রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি তাঁহার করতলগত, ঈশ্বরে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি। এই মাত্র তিনি দীন হীন ভিক্ষুকের বেশে এই নিদারুণ শীতে মধুসূদনের পূজা করিয়া চলিয়া গেলেন। মা! আমি কি তাঁহাকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত গুরু? তিনি কখনও এ জীবনে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন না; কখনও আত্মসুখের জন্য ক্ষুদ্র কীটকেও কষ্ট দিবেন না। যাও মা, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া অহরহঃ তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাক। তিনি সকল যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর; তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

রাণী আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। নিরানন্দে মন পূর্ণ হইল। বিষণ্ণবদনে ও অপ্রসন্নমনে রাজবাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হুতাশনে আহুতি।

পরদিন প্রাতঃকালে মহারাজা পূর্ণচন্দ্র একাকী কক্ষে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় কুলপুরোহিত ভবানীশঙ্কর সম্মুখীন হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে দেখিয়াই গম্ভীর ও রুক্ষ স্বরে বলিলেন। "দেব, আমি বিবাহ করিব না এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন। আজ হইতে আমি সিংহাসন শূন্য করিলাম। আজ হইতে সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া আমি সত্বর বনগমন করিব। আপনারা উইলের মর্ম্মমতে কার্য্য করুন।"

কুলপুরোহিত তাঁহার বাহ্যাকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন যে, মহারাজা সমুদায় রাত্রির মধ্যে একবারও চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই। সমস্ত রাত্রি কেবল উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া, শেষ এই অতৃপ্তিকর, এই অশুভকর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেমন করিয়া রাণীকে এমন অশুভ সংবাদ প্রদান করিবেন, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হইলেন। দুর্ম্মুখের এক কথায় একদিন অযোধ্যা ছারখার হইয়াছিল। শোকে ও দুঃখে রাম অভিভূত হইয়াছিলেন। সীতা বনবাসিনী হইলেন। অযোধ্যাপুরী চিরদিনের জন্য আঁধার হইয়া গেল।

আজ ভবানীশঙ্কর সেই দুর্ম্মুখের ন্যায় রাণীর সমীপে উপস্থিত হইয়া এই দুঃখের সমাচার প্রদান করিলেন। রাণী তাঁহার কথার কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। কোন প্রশ্নও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বলিতে কি, তাঁহার বাক্‌শক্তি লোপ পাইয়াছিল। পূর্ব্বেই তিনি শরৎ ও পূর্ণচন্দ্রের প্রণয় জানিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে পুত্রের অচল ও অটল ভাব দেখিয়া হতবুদ্ধিপ্রায় হইলেন। চলিতে চলিতে অবসন্ন পথিক অকস্মাৎ অপার মরুভূমি সম্মুখে দর্শন করিয়া যেমন গমন-আশা ত্যাগ করত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ে, সেইরূপ কমলকুমারী কপোলে হস্তার্পণ করিয়া কতক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া, যে কক্ষে শশধর প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার বন্ধ করিলেন। মৃত্যুসময়ে স্বামী যে স্থানে পদপ্রান্ত রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপবেশন করিয়া অতি পবিত্রভাবে রাণী অন্ততঃ দিনান্তে একবার তাঁহাকে স্মরণ করিতেন। আজ সেই পবিত্র ক্ষেত্রে তিনি দণ্ডায়মানা হইয়া অনর্গল রোদন করিতে লাগিলেন, পরে কথঞ্চিৎ রোদন সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—"প্রভো, এই উত্তপ্ত মরুভূমে একাকিনী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যখন স্বর্গে গমন করিলে, তখন পুত্রকন্যার দর্শন-লাভই আমার একমাত্র অবলম্বন ছিল। এখন প্রাপ্ত পুত্রকে কোন্ প্রাণে কাঙ্গালিনী বনবাস দিবে? মহারাজ, আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন তুমি এমন কঠোর আদেশ উইলে লিপিবদ্ধ করিয়া গেলে? যখন তুমি আমার কথা রাখিলে না, তখনই আমার মনে কত কথাই উঠিয়াছিল; তখনই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, শেষে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। এখন তুমি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সকল দায় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ। চির-উৎসবময় রাজপুরীকে দুঃখে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছ। আমাকে জীবনে মারিয়া গিয়াছ। মরিয়া ছিলাম তাহা সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন এমন হৃদয়-বিদারক শেল কেমন করিয়া বক্ষে ধারণ করিব?"

আর তাঁহার বাক্য স্ফুরিত হইল না। চক্ষু হইতে অনর্গল জল

পড়িয়া মৃত্তিকা প্লাবিত করিল। তিনি উঠিলেন না, দ্বার খুলিলেন না এবং আহারও করিলেন না। একদণ্ডে রাজপুরী বিষাদময়ী হইয়া উঠিল। হাসি-হাসি ফুটন্ত মল্লিকা ফুল যেন শুকাইয়া গেল। উজ্জ্বল গগনে কে যেন কালী ঢালিয়া দিল।

সেই দিন হইতে পূর্ণচন্দ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিলেন। মস্তক হইতে উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন; রাজদণ্ডকে বিদায় দিলেন; রাজভূষণ, রাজবসন পরিত্যাগ করিলেন। প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের মোহর অর্পণ করিয়া কহিলেন,—"মন্ত্রিবর, আপনি বিচক্ষণ ও সর্ব্বদর্শী, সকল শাস্ত্রে আপনার অধিকার আছে, বিশেষতঃ স্বর্গীয় মহারাজার আপনি বিশ্বস্ত সহচর। এই জন্য এই রাজ্য আপনার উপর অর্পণ করিলাম, ভবিষ্যতে মহারাণী বা প্রভাবতীর হাতে সমর্পণ করিবেন।"

মন্ত্রী। মহারাজ! এমন সুসময়ে, এমন অমঙ্গলকর আদেশ কেন?

পূর্ণ। মন্ত্রিবর। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে আমি অক্ষম হইয়াছি; সুতরাং আমি অল্পদিনের মধ্যে রাজ্য হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া কোন দূর দেশে গমন করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি।"

কেমন ধীরে ধীরে, কেমন প্রশান্ত বদনে, কেমন ধৈর্য্য সহকারে তিনি মন্ত্রী অযোধ্যানাথকে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিলেন! যেন তিনি এই সংসারে অচল অটল ও অজেয়। মন্ত্রী একেবারে নির্ব্বাক্ হইলেন। তিনি দেখিলেন,—পূর্ণচন্দ্র যেন রাহুগ্রস্ত সূর্য্যের ন্যায় নিষ্প্রভ! যুগলচক্ষু রক্তবর্ণ, কখন কুঞ্চিত, কখন বিস্ফারিত হইতেছে। তিনি বুঝিলেন,—শরৎসুন্দরীর সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য এই হৃদয়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ণচন্দ্রের চেতনা হরণ করিয়াছে। সেই

চঞ্চল দামিনী বসন্তের আকাশ জলদজালে অন্ধকার করিয়া ঘোর নিনাদে রাজপুরে পতিত হইয়া সমুদায় রাজ্য প্রজ্বলিত করিয়াছে। আর রক্ষা নাই। অযোধ্যানাথ বুঝিলেন,---আর রক্ষা নাই। তিনি সাহস করিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না। মোহর গ্রহণ ও নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

আর যোগেশ্বরী এ দুঃখের পুরীতে কি করিতেছেন? নিজ কক্ষের বাতায়নপথে স্থির প্রদীপের ন্যায় মিটিমিটি জ্বলিতেছেন। রূপের আলোয় সমুদায় রাজপুরী উদ্ভাসিত না হউক, কিন্তু তাঁহার কক্ষটি সমুজ্জ্বল হইয়াছে। হরিৎপত্র-পরিবেষ্টিত ঈষৎ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় যেন হেলিয়া দুলিয়া পড়িতেছেন। সমুদায় উদ্যানের শোভা হয় নাই সত্য, কিন্তু গাছের কি সুন্দর শোভাই হইয়াছে। দূর হইতে এ কুসুম দেখিতে পাইবে না, কিন্তু নিকটে আসিলে সৌন্দর্য্য ও সৌরভে বিমোহিত হইবে। ভাবুক হইলে গলিয়া যাইবে। এ দেবদুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য কি অমৃতময়, তাহা পবিত্র চক্ষে না দেখিলে কেহ বুঝিবেন না। শরৎসুন্দরী নীল নভোমণ্ডলের উজ্জ্বল চন্দ্রমা। তেজে সমুদয় জগৎ প্রকাশিত। সরোবরে প্রস্ফুটিত শতদল-পদ্মের ন্যায়। দর্শকের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমেই আকর্ষিত হইবে। শরৎসুন্দরী শারদীয় আকাশের পূর্ণচন্দ্র। যোগেশ্বরী সন্ধ্যাগগনের উজ্জ্বল তারকা।

সেই বাতায়নে উপবেশন করিয়া যোগেশ্বরী একগাছি কণ্ঠমালা টিপিতেছেন, আর ভাবিতেছেন। অসম্বন্ধ চিন্তা,—তাহার শৃঙ্খলা নাই।

বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র। প্রণয়-বিপণি মধ্যে ক্রয় বিক্রয় হয় এ কথা বলিলে বিশ্বাস হয় না, অথচ প্রণয় বস্তুটা কি তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহার হৃদয়কলি প্রভাত-কমলের ন্যায় না প্রস্ফুটিত, না অপ্রস্ফুটিত। প্রণয়ীজনকে দেখিতে

ইচ্ছাও হয়, অথচ দেখিবার সময় লজ্জা কোন মতে সে দিকে চক্ষু উঠাইতে দেয় না। যে দিন শুনিলেন যে, পূর্ণচন্দ্রকেই তাঁহার বরণ করিতে হইবে, সেই দিন হইতে যেন নূতন নূতন কল্পনা, নব নব ভাব মনে উদয় হইতে লাগিল। বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে, অথচ বিবাহ করিলে কি সুখ আছে তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন না। একখানি উজ্জ্বল ছবি সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত করিলে তাহার দৃশ্য যেমন ফুটে-ফুটে ফুটে না, এ বালিকাহৃদয়ও সেইরূপ—ফুটে-ফুটে, ফুটে না,—বুঝে-বুঝে, বুঝে না।

যোগেশ্বরী বসিয়া আছেন। মুখ ভূতলের দিকে। গণ্ডযুগলে লাল আভা। সুন্দর চম্পকবর্ণের উপর লাল আভা বড় মনোরম দেখাইতেছে। সুন্দর মুখশ্রী। তাহাতে বালিকা-বয়সের সরলতার শোভা যোলকলায় বিরাজিত। নয়ন আকর্ণ। উজ্জ্বল তারা দুইটি নীল,—নীলোৎপলের ন্যায় নিবিড় নীল,—স্বচ্ছ সলিলে যেন হেসে হেসে ভেসে ভেসে বেড়াইতেছে। নাসা যেমন পরিষ্কার, তেমনই চিকণ। লাল অধরের উপর শ্বেত মুক্তাদন্তের শোভা দেখিয়া মনে হয়, কে যেন অশোক পুষ্পের উপর মতির মালা গাথিয়া রাখিয়াছে।

শরৎসুন্দরীকে পূর্ণচন্দ্র ভাল বাসিতেন, এ সংবাদ তাঁহার কর্ণে এখনও উপস্থিত হয় নাই। যোগেশ্বরী সেই বাতায়নপথে বসিয়া সেই কণ্ঠমালা টিপিতেছেন, আর ভাবিতেছেন,—মহারাজা আমাকে বিবাহ করিবেন না কেন? আমার ত অনিচ্ছা নাই, অমত নাই,—তবে কেন তাঁর অনিচ্ছা হইল? আমি কি তাঁহার অযোগ্যা? অযোগ্যা বৈ কি? তিনি রাজরাজেশ্বর, আমি ভিখারিণী। আমার এ সংসারে কে আছে? আহা! দুঃখিনীকে লোকে ভালবাসে না কেন? দ্বারে দ্বারে, ঘরে ঘরে দুঃখিনী ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে,

সকলেই তাহাকে দূর দূর করিতেছে,—আহা! এত দুঃখ তার কপালে কে লিখিল?—এইরূপ আবোল তাবোল ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন,—"মহারাজ কি আমায় ভালবাসেন না—আমি ত তাঁহাকে বড় ভালবাসি।" একবার সচকিতে চারিদিক্ দেখিয়া পুনরায় বলিলেন,—"আমি যদি তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, তবে কেন তিনি আমাকে ভাল বাসিবেন না? মাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম, তিনিও আমাকে তেমনই ভাল-বাসিতেন। মল্লিকাকে আমি একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারি না, সেও আমার নিকট দিনরাত্রি থাকিতে পারিলে বড় সুখী হয়। তবে কেন মহারাজ আমাকে ভাল বাসিবেন না? তবে কি আমি একেবারে আশা হারাইলাম? কিন্তু আমার যত্ন কোথায়? আমি একবারও তাঁর মুখপানে চাহিতে পারি না; তাঁর নিকট দিয়া হাঁটিতে পারি না; এমন কি, একদিনও সুমুখে বাহির হইতে পারিলাম না—আর তা আমি কোনকালেও পারিব না। আমি সকল পারি, কিন্তু প্রেম ভিক্ষা করিতে পারিব না। তিনি ভাল বাসুন বা নাই বাসুন, আমি চিরদিন তাঁহাকে ভাল বাসিব, চিরদিন আমার হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করিব, চিরদিন তাঁহাকে পূজা করিব। তিনি বিবাহ করুন বা নাই করুন, আমি তাঁহাকে ভিন্ন এ সংসারে আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। তিনি ভিন্ন যোগেশ্বরী চিরকুমারী থাকিবে, তাহার এ ব্রত এ জীবনে কেহ কখনও ভঙ্গ করিতে পারিবে না।"

কতক্ষণ এই রকম চিন্তা করিয়া যোগেশ্বরী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন। যেন একখানি ছোটখাট স্বর্ণপ্রতিমা হেলিতে দুলিতে চলিয়া গেল।

শীতের নির্ম্মল নদীস্রোত বর্ষাসমাগমে যেমন কলুষিত হয়, সেই-রূপ রাজধানীর সুখস্রোতে বিষাদের কালিমা উত্থিত হইয়া সকলকে অসুখী

করিল। ক্রমে ক্রমে চারিদিকে এই সংবাদ ছুটিয়া গেল। পূর্ণচন্দ্রের দুর্ব্বল চিত্তের জন্য কেহ নিন্দা করিল, কেহ বলিল,—"তুমি মহারাজা, তুমি ত অনায়াসে যথেচ্ছ বিবাহ করিতে পার। এর জন্য রাজ্য ত্যাগ বা বনগমনই কেন? কেহ প্রেমের, কেহ যৌবনের, কেহ শরতের রূপের নিন্দা বা প্রশংসা করিতে লাগিল। সকল স্থানেই পূর্ণচন্দ্র সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা আরম্ভ হইল। মেয়ে-মহলে এই আন্দোলনের তরঙ্গের আধিক্যটা বড় অধিক। সুমুখীর গর্ব্বে পা উঠিতেছে না; প্রতি কথায় স্বামীকে রূপের গৌরব দেখাইতেছেন। কালিন্দীর কিছুই নাই, কি লইয়া অহঙ্কার করিবে? উঠিতে বসিতে শতমুখে কেবল শরতের রূপের শ্রাদ্ধ করিতেছে।

এই তরঙ্গ-কোলাহল রেসিডেন্টের কর্ণ-বিবরে এতদিন প্রতিঘাত করে নাই। অকস্মাৎ একদিন শুনিতে পাইয়া মহাব্যস্ত হইয়া, তিনি অযোধ্যানাথকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে কাপ্তান লুইস বলিলেন,—"মন্ত্রী মহাশয়, এইরূপে কি আমায় বঞ্চনা করিতে হয়? আপনাদিগকে বিশ্বাস করি বলিয়া কি, মৃত মহারাজার উইলের সমুদায় বৃত্তান্ত গোপন করিতে হয়? যদি আমি বুঝিতাম যে, যোগেশ্বরীকে বিবাহ না করিলে মহারাজ পূর্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসিতে পারিবেন না, তাহা হইলে কি আমি অভিষেকে সম্মতি দিতাম? এখন এ বিষয় ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ণে পৌঁছিলে মহা অনর্থ উপস্থিত হইবে।

অযো। কাপ্তান সাহেব, আমি কি করিব? আমার দোষই বা কি? মহারাণী আপনার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কর্ম্ম করিয়াছেন। উইলের ইংরাজি অনুবাদ আপনার সেরেস্তায় আছে,—আমাদের অপরাধ?

কাপ্তান তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—"অপরাধ যাহা

হয় একজনের হইয়াছে, সেজন্য আসে না। এখন যাহাতে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়,তাহার আয়োজন করুন। নতুবা শেষে মহা গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা। হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা লর্ড হার্ডিঞ্জ সহজে এই বিষয় ছাড়িয়া দিবেন না। এই প্রবঞ্চনার জন্য হয়ত এই রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। এক্ষণে আপনারা সাবধানে কার্য্য করুন।”

অযো। আমি এখনই মহারাণীকে বিশেষ করিয়া বলিব।

কাপ্তা। শুদ্ধ তাহা নহে, এই ফাল্গুনমাসের মধ্যে বিবাহ না হইলে আমি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট প্রদান করিব।

অযোধ্যানাথ মহাব্যস্ত ও যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করিলেন। রাণী কমলকুমারী উপস্থিত হইলে পর, অযোধ্যানাথ যোড়হস্তে, কম্পিতকলেবরে, ভগ্নস্বরে কাপ্তানের আদেশ, অনুরোধ ও কর্ত্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তিনি ভীতিবিহ্বলা হইয়া কহিলেন,—“মন্ত্রী, কোন পরামর্শ কি নাই?”

অযো। মহারাজ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মহল হইতে আজ একপক্ষ কোথাও বহির্গত হ’ন নাই। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। রাজকার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সর্ব্বদা কহিতেছেন যে, সন্ন্যাসী বা বনবাসী হইয়া তীর্থ বা অরণ্য আশ্রয় করিব। তিনি যে সহজে বিবাহ করিবেন, আমি ত বোধ করি না।

রাণী কিছুই প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। অযোধ্যানাথ পুনরায় বলিলেন,—“যাহাতে মহারাজা বিবাহ করেন, তাহার ব্যবস্থা আমি করিতেছি। আমি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার মনের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়া দিব।” রাণী নিরুত্তর রহিলেন। অযোধ্যানাথ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। যাইবার সময়

ভাবিতে লাগিলেন, রাজ্য রক্ষা করিতে হইলে, নানা প্রকার কল কৌশল প্রকাশ করিতে হয় ;—কিন্তু সে অবলা, তাহার দোষ কি ? বিশেষতঃ বন্ধুর কন্যা ;—যে স্থানে এক জনের বিনাশে শত শত জনের বা রাজ্যের শান্তি হয়, সে স্থানে অকর্ত্তব্যও কর্ত্তব্য হয়। একটী অনর্থ দ্বারা যদি বহু অনর্থ নিবারণ করা যায়, তাহা হইলে একটী অনর্থ সম্পাদন করা যুক্তিসিদ্ধ।” দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ও আক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন, “হায় ! স্বর্ণপ্রতিমা জলে ভাসাইবার ভার কি শেষে আমার স্কন্ধে পড়িল ?”

রাজ্ঞী নিজ কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাহ্যাকৃতি দেখিয়া জনৈকা দাসী ব্যাকুলা হইয়া চীৎকার করিল। দশজন আসিয়া উপস্থিত হইল। মস্তকে ও মুখে শীতল জল বিক্ষেপে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল। তিনি বিকৃত স্বরে কহিলেন,—“আশা নাই—আশা নাই—দীপ একেবারে নিবিল ! এতদিন ধরিয়া যখন পূর্ণচন্দ্র রাজ্য পরিত্যাগ ও বনবাস স্থির করিয়াছে, তখন আর আশা নাই—আশা নাই। মহারাজ ! আমার জন্য তোমার পার্শ্বে স্থান রাখিও। নিশ্চয় বলিতেছি, যে দিন পুত্র রাজ্য হইতে বহির্গত হইবে, সেই দিন আমারও প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।”

সেই দিন হইতে কমলকুমারীর বাহ্যাকৃতি এমন জীর্ণশীর্ণ ও মনের এমন পরিবর্ত্তন হইল যে, তাঁহাকে চিনিতে পারা দুরূহ হইয়া উঠিল।

এ দিকে মহারাজার একই ভাব ও একই প্রতিজ্ঞা। যে দিন শুনিলেন যে, যোগেশ্বরীকে বিবাহ না করিলে রেসিডেণ্ট রিপোর্ট করিবেন, সেই দিন তিনি তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইবার আয়োজন

করিলেন। মৃত্তিকা-রঞ্জিত কৌপীন, বিভূতি, তুলসীর মালা প্রভৃতি সংগ্রহ করিলেন। মাতাকে বন্দনা করিয়াই তিনি যাত্রা করিবেন। কিয়দ্দিন এই ভাবে যাপন করিয়া, শেষে শরৎসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করত বারাণসীবাসী হইবেন,—এইরূপ সংকল্প করিয়া ক্ষুদ্র একখানি লিপি প্রণয়িনীকে লিখিলেন। তদুত্তরে তিনি নিম্নলিখিত দুই পংক্তি-মাত্র উত্তর পাইলেন ঃ—

"সুখে দুঃখে ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গিনী হইয়া ইহলোকে ও অনন্ত লোকে বাস করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি।"

সমুদায় বিষয় মনে মনে স্থির করিয়া, এক দিন প্রাতঃকালে তিনি মাতার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—জীর্ণা শীর্ণা এক স্ত্রীলোক মৃত্তিকায় পড়িয়া আছেন। চক্ষু প্রায় নিমীলিত। শরীরে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলের চিহ্ন রহিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে, সেই অসীম-লাবণ্যময়ী, সেই সদানন্দপূর্ণা, সেই তেজঃ-সম্পন্না মহারাণী কমলকুমারী আজ দীনা হীনা, বিকৃতবদনা হইয়া অভাগিনীর ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িয়া আছেন। মাতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষে অবিরল ধারায় বারি বিগলিত হইতে লাগিল। এক নিমেষে মনের পরিবর্ত্তন হয়,—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। পূর্ণচন্দ্রের মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"আমার ন্যায় নরাধম, কাপুরুষ সংসারে আর নাই। আমিই না ঈশ্বরদাসকে স্ত্রৈণ ও মাতৃহন্তারক স্থির করিয়া উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম? এখন দেখিতেছি, ঈশ্বরদাস হইতে আমি শতগুণে নরাধম। আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ, চিরদুঃখিনী মাতার প্রাণনাশে কৃতসংকল্প, এই বৃহৎ রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিতে উদ্যত। আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান কিছুমাত্র নাই। নিজের সুখের জন্য,

স্বার্থের জন্য, অধার্ম্মিক নরহত্যাকারীর ন্যায় নির্ম্মম হৃদয়ে স্নেহময়ী মাতার—আমার জীবনস্বরূপিণী, আমার আনন্দদায়িনী মাতার কণ্ঠচ্ছেদ করিতে উঠিয়াছি। আমা অপেক্ষা আর কে অধিকতর নৃশংস, পামর, অপদার্থ জীব এ জগতে আছে? রাম, তুমিই ধন্য। পিতার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রই রাজবেশ, রাজভূষা ছাড়িয়া বনে গমন করিলে! ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ, তুমি সর্ব্বাগ্রগণ্য! তুমি অযাচিত হইয়াও আত্মসুখোৎসর্গ ও উর্ম্মিলারে উপেক্ষা করিয়া, কেবল ভ্রাতার সেবা করিবার জন্য চতুর্দ্দশ বর্ষ বনের দারুণ ক্লেশ সহ্য করিলে! পিতৃপরায়ণ ভীষ্ম, তুমি কেবল পিতাকে সুখী করিবার জন্য চিরজীবন কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া রহিলে! তোমার ত্যাগস্বীকার অসামান্য, অলৌকিক ও অভূতপূর্ব্ব! পুণ্যবান্ নলরাজা, তুমি ইন্দ্রাদি দেবতার পরিতুষ্টি সাধনের জন্য, দময়ন্তীর আশাতেও জলাঞ্জলি দিয়াছিলে! এ সংসারে যে ত্যাগ স্বীকার করিতে না পারে, সে ঘৃণ্য, সে কিসের মনুষ্য—সে পশু—”

কঙ্কাল-পর্য্যবসিত কমলকুমারীকে দেখিয়া পূর্ণচন্দ্রের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল। শরৎসুন্দরীর উপদেশ মনে পড়িল। এই প্রখর স্রোতে শরৎসুন্দরী ডুবিলেন না। ডুবিয়াও ডুবিলেন না, আবার ভাসিয়া উঠিলেন। তিনি বিকৃত বুদ্ধিতে ভাবিতে লাগিলেন,—“যোগেশ্বরীকে বিবাহ করিলে কি ক্ষতি হইবে,—শরৎ আমারই,—চিরদিন আমারই হৃদয়ে থাকিবে;—তবে কেন পিতা মাতার আজ্ঞা অবহেলা করি?”

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি যুগ্মহস্তে, দৃঢ়বচনে, সকরুণ-নেত্রে বলিলেন—“মা, তোমার সেবক আজ্ঞা-পালনের জন্য পাদমূলে দণ্ডায়মান—অনুমতি করুন, কি করিতে হইবে?”

কমলকুমারী চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। পূর্ণচন্দ্রের কেমন ত্রাস জন্মিল; মনে হইল, তিনি আর অধিক কাল বাঁচিবেন না। তিনি পুনরায় কহিলেন,—"মা, অনুমতি করুন—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" রাণী উঠিয়া বসিলেন। পুত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিলেন। তখন দরদর চক্ষুজল পড়িয়া উভয়ের শরীর সিক্ত হইল। কতক্ষণ পরে মাতা কহিলেন,—"বৎস, তুমি চিরজীবী হইয়া সুখে থাক,—আমার অসাড় প্রাণে জীবন সঞ্চার হইল,—আমি যে আবার তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে দেখিতে ইহসংসার হইতে চলিয়া যাইব, সে আশা আমার ছিল না।"

বিবাহের সংবাদ মুখে মুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দিন স্থির হইল! অপ্রস্ফুটিতা যোগেশ্বরীর হৃদয় তরঙ্গতাড়িত নর্ম্মদাবক্ষের ন্যায় নাচিয়া উঠিল। জ্বলন্ত শেলের ন্যায় এই সংবাদ শরৎসুন্দরীর কর্ণে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে হুতাশন জ্বালিয়া দিল। সে অগ্নি আর নির্ব্বাপিত হইল না। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, মস্তক ঘুরিয়া গেল। চক্ষে আঁধার দেখিলেন। শরীর এমন দুর্ব্বল ও লঘু বোধ হইল, যেন সে দেহ তাঁহার নহে বলিয়া মনে হইল।

এ বিবাহে কোন আড়ম্বর হইল না। একজনও নিমন্ত্রিত হইলেন না। কোন স্থান হইতে কোন আত্মীয়ের সমাগম হইল না। এমন কি, প্রভাবতীও সংবাদ পাইলেন না। রাজগুরু হৃষীকেশ ও পুরোহিত ভবানীশঙ্কর যথাশাস্ত্র নিরপরাধিনী যোগেশ্বরীকে পূর্ণচন্দ্ররূপ হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। অযোধ্যানাথের রাজনৈতিক কৌশলবিস্তারের পূর্ব্বেই নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ সম্পন্ন হইল।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিবিয়া গেল।

অবলা সরলা শরৎসুন্দরীর সকল আশা এ জীবনের তরে চলিয়া গিয়াছে। আর আশা ভরসা নাই। পূর্ণচন্দ্র বিবাহ করিয়াছেন। সেই কুটিল রজনীর কুটিল স্বপ্ন এত দিনের পর সত্য হইল। তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন,—"পূর্ণচন্দ্র এক রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া কোথায়, কোন্ অরণ্যে লুকাইয়া গেলেন, তাহা তিনি নদীর অপর পার হইতে স্থির করিতে পারিলেন না। এত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, কিন্তু হতাশ হৃদয়ের কাতরধ্বনি আকাশে মিলাইয়া গেল। পূর্ণচন্দ্র নয়ন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও দেখিলেন না।" এত দিনের পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সেই স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। এ দুঃখ কি তাঁহার রাখিবার স্থান আছে? সেই কমল-নয়ন এখন অশ্রুপূর্ণ; সেই উজ্জ্বল লোহিতাভ গণ্ডদেশ শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বসনে যত্ন নাই, পড়িতে মন নাই, নিদ্রায় সুখ নাই, আহারে তৃপ্তি নাই। সেই কুঞ্চিত কেশদামের অপূর্ব্ব শ্রী কোথায় চলিয়া গিয়াছে; সে বেণী আর নাই। শরৎ মুক্তকেশী হইয়াছেন। শরৎসুন্দরী যে আকণ্ঠহৃদয়ে পূর্ণচন্দ্রকে ভাল বাসিয়াছেন, তাহা অভাগিনী জননীর এখন বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়াছে। পিতাও বুঝিতে পারিয়াছেন। শরতের রাত্রিতে নিদ্রা নাই; নিদ্রাগতা হইলেও স্বপ্নে—"কান্ত, প্রণয়ের এই পরিণাম হইল!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন; কাঁদিয়া মাতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইতেন।

আজ তিনি আপন শয়নকক্ষের বাতায়নে উপবেশন করিয়া আকাশে চাহিয়া আছেন। সে বিস্ফারিত নেত্রযুগল দেখিলে বোধ হয়, সংসারের কোন বিষয়ে তাঁহার আসক্তি নাই; যেন পৃথিবী হইতে তাঁহার সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়াছে। সংসারে এমন কোন প্রিয়বস্তু নাই, যাহাতে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে। সত্য,—আকাশের দিকে নয়ন ফিরাইয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখিতেছিলেন না। তাঁহার পদ হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত স্থির। বাহ্য জগতের এই ভাব, কিন্তু অন্তর্জ্জগতের ভাব অধিকতর ভয়ঙ্কর। মন স্থির নয় অথচ অস্থির নয়; অন্বেষণ করিবার কোন বস্তু নাই; চিন্তা করিবার কোন বিষয় নাই। যখন সমূলে আশা নির্ম্মূল হইয়াছে, তখন আর কল্পনার বিষয় কি আছে?—কি বা হইতে পারে? আকাশের চারিদিক্ ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায় পরিপূরিত। দিবাভাগে যেন রাত্রি উপস্থিত। জল পড়ে-পড়ে, কিন্তু পড়িতেছে না। দূরে—অতিদূরে মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে আকাশ গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। এক একবার ক্ষণপ্রভা নয়ন ঝলসিয়া দিতেছে। প্রকৃতির এই অবস্থার সহিত তাঁহার মানসিক ভাবের তুলনা হইতে পারে।

ক্রমে ক্রমে তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় অরুণবর্ণ ধারণ করিল। গণ্ডযুগল লোহিত হইয়া আসিল। নয়নতারা নিশ্চল হইল। শ্বাসাবরোধ হইয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম করিল। এইরূপ ভাবে দুই তিন মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল। গভীর হৃদয়বিদারক দুঃখ তাঁহাকে আলোড়িত করিতেছিল, তাহার সন্দেহ ছিল না। সৌভাগ্যক্রমে চক্ষু জলে প্লাবিত হইল। ঝর্ ঝর্ করিয়া বারিধারা উন্নত পয়োধরে পড়িতে লাগিল। স্ফুটিতোন্মুখ কমল-কোরক যেন ঈষদবনত মস্তকে নিষিক্ত বারিধারা গ্রহণ করিয়া বিশাল উরুদেশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক, সমবেদনা প্রকাশ করিতে

লাগিল। এই বারিধারার সহিত দুঃখের গুরুভার যেন কমিয়া আসিল। হৃদয় অনেক শান্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ কপোলে হস্তার্পণ করিয়া মৃত্তিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাস্তবিক তিনি কিছুই দেখিতেছিলেন না। বাস্তবিক তাঁহার বাহ্যজ্ঞানই ছিল কি না সন্দেহের স্থল। মানসপটে পূর্ণচন্দ্রের মধুর মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই মনশ্চক্ষু দিয়া দেখিতেছিলেন। কতক্ষণ নীরবে থাকিয়া গদ্গদ স্বরে কহিলেন,—"নাথ, অভাগিনীকে কি জন্মের মত ভাসাইয়া দিলে? চির-কাঙ্গালিনী করিলে? আমি কি করিয়াছি? কি দোষের দোষী? নাথ, বিবাহ করিবার পূর্ব্বে এখানে কতবার আসিয়াছিলে, কত কথা কহিয়াছিলে, তাহা কি মনে নাই? আমাকে কি জন্মের মত ভুলিয়া গেলে? আর এখানে আসিবে না? আর দেখা হইবে না? হায়! হায়! একি হ'ল? কেন এমন হ'ল। ঈশ্বর, কি দোষ করিয়াছি? নাথ, আমার কি অপরাধ হ'ল? বিধি, কি পাপে আমায় এমন কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিলে? জন্মান্তরে কোন সতীর কি পতিহত্যা করিয়াছিলাম, সেই পাপে আমায় এই যাতনা দিলে? উঃ—কি দুঃখ, এ যে আর সহ্য হয় না মা? বুক ফাটিয়া যে আমার প্রাণ বাহির হয়! ও মা—"

কণ্ঠাবরোধ হইল। আর মুখে বাক্য স্ফুরিত হইল না। নীল নয়নোৎপল হইতে মুক্তাধারার ন্যায় অবিরল জল পড়িতে লাগিল। অঞ্চলপ্রান্তে দুই চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! প্রবল স্রোতের গতি কি বস্ত্রখণ্ডে রুদ্ধ হইতে পারে? নয়ন মুছিতে মুছিতে পতিপ্রাণা পুনরায় বলিলেন,—"কান্ত, তোমার কোন দোষ নাই। আমি পাপের যাতনা ভোগ করিতেছি। তুমি জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছ, তাহাতে দুঃখিত নহি; কিন্তু কেমন করিয়া তুমি সে ভালবাসা একেবারে

ভুলিয়া গেলে? নির্দ্দয় হইয়া কেমন করিয়া এতদিন না দেখিয়া রহিলে? পূর্ব্বে যখনই তুমি আসিতে, তখনই বলিতে,—'শরৎ, এক মুহূর্ত্ত এক যুগ।' এখন যে কত মুহূর্ত্ত, কত দিন অতীত হইল; কই আর ত একবারও আসিলে না, একবারও দেখিলে না? তবে আর এ পোড়ার মুখ কাহার নিকটে দেখাইব? আঃ—মরি ত এখন বাঁচি! আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই। তুমি যখন পর হইয়াছ, তখন এ সংসারে আর আমার কে আছে? এ সংসারে আর আমার আবশ্যক কি? আমার দুঃখ কি আর কেহ বিমোচন করিতে পারিবে? এমন করিয়া আমি কতকাল পৃথিবীতে বাস করিব?"

পূর্ণেন্দুবদনা থামিলেন। একটু পরে অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"হৃদয়নাথ! তুমি আমার—এই যে তুমি আমার হৃদয় ও মন অধিকার করিয়া রহিয়াছ! এই যে তোমার জ্বলন্ত ছবি আমার অন্তরে শোভা পাইতেছে! তোমার প্রতিমূর্ত্তি যেন আকাশময় বিরাজিত রহিয়াছে। নয়নোন্মীলন করিলেই যেন তোমাকেই দেখি। দেখিতেছি,—তুমি কাঁদিতেছ; কেন নাথ! বিবাহ করিয়াছ বলিয়া কি দুঃখিত হইয়াছ? পিতার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, মাতার চিত্ত বিনোদন করিয়াছ, পুরুষের কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়াছ। তুমি কাপুরুষ নও—তবে কেন কাঁদ? কেন বারংবার ক্ষমা চাহিতেছ? আমি তোমারই,—ইহকালে ও অনন্তকালে আমি তোমারই,—তোমা ভিন্ন আমি কাহাকেও জানি না; তুমি আমার সর্ব্বস্ব, সুখে দুঃখে চিরদিন আমি তোমারই। কান্ত, কত কাঁদিতেছ,—কত বিলাপ করিতেছ,—যেন কি কুকর্ম্ম করিয়াছ মনে করিয়া আপনাকে কত তিরস্কার করিতেছ! এ আমার দোষ,—'আমার অদৃষ্টের দোষ—বিধাতা বিমুখ হইয়াছেন। এ প্রণয়শৃঙ্খল সহজে ছিন্ন হইবে না। মৃত্যু হইলেও এই শৃঙ্খল থাকিবে। সেখানেও

তোমার ধ্যান করিব,—সেখানেও অনন্যমনা হইয়া তোমার নাম করিয়া অন্ততঃ দিনান্তে একবিন্দু অশ্রু নিক্ষেপ করিব—”

এই সময় ব্রজসুন্দরী গৃহে প্রবেশ করিয়া, দুই চক্ষে কন্যার দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। শরৎ মাতাকে দেখিয়া এক পার্শ্বে মুখ লুকাইলেন। দুঃখে ও লজ্জায় মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া মুখের চমৎকার শ্রী বিনির্গত করিল। তিনি বলিলেন,—“শরৎ, কেবল এই ঘরে বসিয়া কাঁদিলে কি হইবে? সংসারে কি সকলেই সুখী হয়? সকলকারই কি একজন্মে মনের সমুদায় সাধ পূর্ণ হয়? তুমি এমন সুবোধ হইয়া কেন অশান্ত হইবে? সময় প্রতীক্ষা কর। সহ্য করিবার জন্যই মানুষের জন্ম। চল মা,—চল—আজ দেবালয়ে স্বামীজী কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যা করিবেন, তুমি তাহা শুনিয়া নিজের চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারিবে; ভগ্নহৃদয়ে অনেক শান্তি লাভ করিবে। সেই রাজার রাজা, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি, ত্রিভুবনের রক্ষাকর্ত্তা নারায়ণের পদতলে আজ তোমার আকাঙ্ক্ষা, তোমার প্রেম, তোমার অভিলাষ উৎসর্গ করিবে; যাহা তাঁহাকে ভক্তিভরে দিবে, তাহার দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ ইহজন্মে বা পরজন্মে লাভ করিয়া সকল বাসনা বিবর্জ্জিত হইয়া, সুখ ও শান্তির আধারস্বরূপ মুক্তি লাভ করিবে। তুমি ত মা, গীতা পাঠ করিয়াছ। আমি আর বেশী কি বুঝাইব?”

শর। মাথা ধরিয়াছে—শরীর কেমন কেমন করিতেছে।

ব্রজ। এ আবার কি হ’ল? মুখ দেখি?

মুখ তুলিবার তাঁহার সাধ্য কি? মাতা স্বয়ং যাইয়া তাঁহার মুখোত্তোলন করিলেন। তাঁহার স্পর্শে অধিকতর প্রবল বেগে চক্ষু হইতে জলধারা বহিতে লাগিল। ব্রজসুন্দরী চমকিত হইয়া বলিলেন,—“এই যে গা গরম হইয়াছে—কেঁদে কেঁদে বাছার জ্বর হইল!” ভবিষ্যৎ

আশঙ্কা করিয়া মা শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভক্তিভরে বিষ্ণুকে স্মরণ করিলেন। জননী স্নেহের আধারস্বরূপিণী। পাগলিনী কন্যাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করাইয়া দিলেন। কন্যা কম্পিতস্বরে বলিলেন,—"মা, বড় শীত ক'চ্চে।"

"তাইত, এ আবার কি হ'ল!" বলিতে বলিতে দুঃখিনী মাতা তাঁহার গাত্র লেপে আবৃত করিলেন। তিনি অনন্যমনা হইয়া নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক, কখন তাঁহার মস্তকে, কখন হস্তে, কখন কপালে হস্ত প্রদান করিয়া শীতোষ্ণ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কখনও বা সাংসারিক কার্য্য বিশৃঙ্খল না হইতে পারে, এজন্য দাসীদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। রমানাথ জ্বরের সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইলেন; তবে এইমাত্র জ্বর আরম্ভ হইয়াছে, চিকিৎসক ডাকিবার আবশ্যক নাই মনে করিয়া সময় প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

এদিকে কন্যার চক্ষু মুদ্রিত; কিন্তু তিনি নিদ্রিত ছিলেন না। চক্ষু বুজিয়া দেখিতেছিলেন,—'পূর্ণচন্দ্র তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাতরে, করপুটে ক্ষমাভিক্ষা করিতেছেন,—চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া গিয়াছে; শরৎ যেন অভিমানিনী হইয়া নতবদনে বসিয়া আছেন; কি বলিয়া যে তাঁহাকে আহ্বান করিবেন, কি বলিয়া যে তাঁহাকে বুঝাইবেন, ভাষায় যেন একটী অক্ষরও অন্বেষণ করিয়া পাইতেছেন না।'

কুমুদিনীর সহচরী আকাশভ্রমণকারিণী তারকাসুন্দরী সমভিব্যাহারে ক্ষীণ শশধর বিমানপথে উদিত হইলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর। প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায়। শশাঙ্কের জ্যোতিঃ গবাক্ষের ক্ষুদ্র রন্ধ্র দিয়া শরতের মুখে পড়িয়াছে। মাতা তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন। রমানাথ সেই কক্ষের অপর পার্শ্বে অন্য শয্যায় শয়িত ছিলেন। সকলেই

নিদ্রিত। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ। এমন সময় শরৎসুন্দরী বিকৃত স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"মা, ঐ কান্ত চলিয়া যান,—ধর মা—তাঁহাকে ধর।" স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! মাতা কন্যার কণ্ঠস্বরে জাগরিত হইয়া মুখের নিকট মুখ রাখিয়া সস্নেহে বলিলেন,—"মা, কি হ'য়েচে?" রমানাথ প্রদীপ উদ্দীপ্ত করিয়া কন্যার নিকটে আসিলেন। গাত্রে হস্ত দিয়া বলিলেন,—"তাই ত,—গা যে ভয়ানক গরম—মা, কি হ'য়েচে?"

কন্যা যেন বিস্মিতা হইয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। কোথায় সে সমুদ্র—আর কোথায় সে তরণী—কিছুই নাই। তিনি তাঁহার শয়নমন্দিরে শুইয়া আছেন; মাতা কপালে হাত দিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন; পিতা দাঁড়াইয়া হতাশ হৃদয়ে কি ভাবিতেছেন। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, স্বপ্ন দেখিয়াছেন; তথাপি বিশ্বাস হইতেছে না। এক এক বার বোধ হইতেছে,—এখনও যেন এক বিশাল বালু-ভূমে তিনি শয়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন। পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রমণীকে সঙ্গে লইয়া কোন্ অজ্ঞানিত পথে চলিয়া যাইতেছেন। তরণী অদৃশ্যপ্রায়। সন্দেহ দূর করিবার জন্য জননীকে বলিলেন,—"মা, এ কোন্ দেশে এসেছি?"

ব্রজ। কেন মা, চিন্তে পাচ্চ না?—এ যে তোমার ঘর।

শর। কান্ত কোথায়?

ব্রজ। তিনি বাড়ীতে। তাঁর কথা কেন মা, পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কর?

শর। আমার ঘরে—উঃ—যদি সত্য হইত ত, আমি কি করিতাম? আঃ—জগদীশ্বর!

ব্রজ। কি মা—কি হ'য়েচে?

শর। না কিছুই নয়—স্বপ্ন দেখিয়াছি!

পরদিন প্রাতঃকালে প্রধান রাজবৈদ্য নীলকমল দাস নিদানমতে ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। দাস মহাশয় সাক্ষাৎ শিব। নিদানে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। রাজধানীর সমুদায় লোক তাঁহাকে ভক্তি ও বিশ্বাস করিত। রোগী তাঁহার হাতে পড়িলে নিশ্চিন্ত হইত। এ দিকে দুই দিন গত হইল; রোগের শমতা হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভয়ানক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। তৃতীয় দিবসে পূর্ণ মাত্রায় বিকার আসিয়া স্বর্ণপ্রতিমা শরৎসুন্দরীকে আক্রমণ করিল। বৈদ্য বিমুখ হইলেন। সার্জ্জন জেনারেল আশুতোষ 'টু লেট' (Too late) বলিয়া চলিয়া গেলেন। ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। এ কি! স্বর্ণলতা কি জন্মের মত ধরণী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত না কি? মাতঃ বসুন্ধরে! তাহা হইলে তুমি একটী রত্ন হারাইবে। অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়া আপনার মুখ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছ,—আজ সেই উজ্জ্বলতা কি নষ্ট হইবে? তোমার সেই গর্ব্ব কি খর্ব্ব হইবে? তোমার মুখ কি মলিন হইবে? তোমার কন্যাকে, মা—তুমি রক্ষা কর।

শরদিন্দুসম শরৎকুমারীর সে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য নাই। নয়নের সেই স্নিগ্ধ, সুবিমল জ্যোতির হ্রাস হইয়াছে। পঙ্কিল সরোবরে পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, আজ বন-করীর পদদলনে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বের রমণীয়তা ও মধুরতা কে যেন মুখমণ্ডল হইতে হরণ করিয়া লইয়াছে; তবে আকর্ষণী শক্তি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ভুজ-মৃণাল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোমলতা এখনও নষ্ট হয় নাই। কণ্ঠ শুষ্ক, কিন্তু স্বর এখনও মধুময়। কামিনী শয্যায় শয়ন করিয়া কেবল পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছেন; যাতনায় অস্থির হইয়া কোমলকণ্ঠে 'মা—মা' বলিতেছেন। মা নিকটে বসিয়া অবিশ্রান্ত নেত্রবারি বিসর্জ্জন

করিতেছেন। কন্যার শব্দ শুনিবা মাত্র, মুখের নিকট মুখ লইয়া বলিলেন,—"কেন মা—অমন ক'চ্চ কেন?"

"মা, আমি কোথায়?"

"এই যে আমার কাছে—তোমার ঘরের ভিতরে।"

"বাবা কোথায়?"

"ঐ যে দাঁড়াইয়া তোমাকেই দেখিতেছেন।"

ধীরেধীরে—"মা, কান্ত কোথায়?"

ব্রজসুন্দরী উত্তর দিলেন না; কেবল স্বামীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। রমানাথ বলিলেন,—"মহারাজ বিবাহ সম্পন্ন করিয়াই 'শান্তিনিকেতনে'র দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অযোধ্যানাথই রাজ কার্য্য সম্পাদন করেন। কেহ তাঁহার নিকট যাইতে পারে না। আজ এক মাস হইল, তিনি শান্তিনিকেতনে আবদ্ধ আছেন। আমাদের এ বিপদের কথা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। তাঁহারও প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে। এ বিষম বিপদ্ যে কোথায় নিবৃত্ত হইবে, তাহা ভগবান্‌ই বলিতে পারেন।"

ক্রমে শরতের নিদ্রাকর্ষণ হইল। মাতার গাত্র হইতে তাঁহার হস্ত শয্যার উপর পড়িয়া গেল। চক্ষু না মুদ্রিত, না বিকসিত রহিল। মুখ ক্রমে ক্রমে পাংশুবর্ণ হইয়া আসিল। ক্ষণে ক্ষণে বদন-মণ্ডল এমন বিকট, এমন ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল যে, নিগূঢ়চিত্তে দেখিলে বোধ হইত, দুর্দ্দান্ত যমকিঙ্করের সহিত জীবাত্মার শেষ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। কামিনী অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"মা, প্রাণ যায়—প্রাণ যায়—প্রাণ কেমন করে—আর যাতনা সহ্য হয় না—বুক যায়—বুক ফাটিয়া গেল—কান্ত, তুমি কোথায়? এস নাথ, শেষ আলিঙ্গন করি—জন্মের শোধ একবার দেখা করি। যে শৃঙ্খলে

বাঁধা আছি, তাহা কি কখন ভাঙ্গিবে? পরজন্মে তুমিই পতি হইও। ভগবান্, অধিনীর মরণসময়ের এই এক প্রার্থনা সফল করিও। এ জন্ম ত চিরদুঃখে চলিয়া গেল, পরজন্মে যেন সুখী হই। মা—তুমি সে সময় মা হইও,—বাবা, তুমি বাবা হইবে। তোমাদের স্নেহ, আদর, ভালবাসা আমি কখনও ভুলিব না।”—এই বলিয়া দুই হস্তে মাতার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। ধীরে ধীরে ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—“হা নাথ, কি সুখে তোমাকে প্রথম স্বপ্ন-কথা বলিয়াছিলাম;—যেন এখনও দেখিতেছি,—যেন মালা লইয়া তোমার গলায় দিতে যাইতেছি, তুমি ‘প্রাণাধিকে!’ বলিয়া আলিঙ্গন করিতে উঠিলে—না, আর না,—আর ভাবিব না,—বৃথা চিন্তা করিয়া আর কি হইবে?—”

আর তিনি বলিতে পারিলেন না। তৃষ্ণায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া গেল। আকণ্ঠ জল পান করিয়া পুনরায় বলিলেন,—“মা, কান্তকে যে চিঠি লিখিয়াছি, তাহা কি পাঠাইয়াছ? তাহাতে এই নিরাশ প্রাণের কতই উচ্ছ্বাস আছে; তাহার প্রতি ছত্রে আমার চক্ষের জল আছে।” মাতাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া নিতান্ত আকুল হইয়া কহিলেন,—“এখনও পাঠাও নাই?—সন্ধ্যা যে উপস্থিত—তবে কি তাঁহার সহিত এজন্মে আর দেখা হইবে না? আহা! তিনি আমায় বড় ভালবাসিতেন, সে ভালবাসা আমি কখনও ভুলিব না।—মা, এখনই চিঠি পাঠাইয়া দাও—একবার তাঁহাকে দেখিব—ইহজন্মের শেষ আলিঙ্গন করিব।—মা, শুনচ না? এখনই চিঠি পাঠাইয়া দাও—”

মা ভাবিতেছেন, চিঠি কাহার নিকট কোথায় পাঠাইবেন; এ রাজধানীতে একমাসের মধ্যে কেহ মহারাজার উদ্দেশ পায় নাই। তথাচ তিনি বলিলেন “মা, এখনই পাঠাইয়া দিতেছি।”

"মা, তোমার একতিল সময় আমার এক বৎসর মনে হই-তেছে ;—আমি আর কতক্ষণ বাঁচিব ?"

দাসীর হস্তে পত্র দিয়া মা বলিয়া দিলেন—"যেরূপে পার বাছা, এই পত্রখানি এখনই মহারাজার হস্তে দিয়া আসিবে। তিনি শান্তি-নিকেতনে আছেন।"

অর্দ্ধঘণ্টা মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিয়া শরৎসুন্দরী পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিলেন। শরীর নিঃস্পন্দপ্রায়। হস্তপদ শীতল। শ্বাস ভয়ানক প্রবল। চক্ষু ঊর্দ্ধগামী। নাড়ী নাই। পিতা মাতা কন্যার পার্শ্বে বসিয়া নেত্রজল বিমোচন করিতে লাগিলেন। ব্রজসুন্দরী একবার সেই বিশুষ্ক কমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। চীৎকার করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন।

শরৎসুন্দরীও একবার বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যেন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ সতেজে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,— "মা কান্তকে ধর—ঐ পলাইয়া যাইতেছেন—লজ্জাতে আসিতে পারিতেছেন না ;—কান্ত, একবার এস—লজ্জা কি ? দেখ—আমি কোন্ মহাদেশে কাহার সঙ্গে যাইতেছি—আমি এ দেশে সে দেশে সর্ব্বত্র তোমারই—মা, ধর—ধর—ঐ চলিয়া গেলেন—বাবা—মা কান্—ত"

স্বর বদ্ধ হইল। জন্মের মত শরৎসুন্দরী নিস্তব্ধ হইলেন। জন্মের মত জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গেল। নিশ্বাস আর বহিতেছে না। স্বর্ণলতা স্পন্দহীন—জড়বৎ। চক্ষু নিশ্চল, ওষ্ঠ ঈষদ্বিকসিত, মুকুতা-দন্তের সে আভা তাহার ভিতর হইতে এখনও নির্গত হইতেছে। তিনি যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সৌন্দর্য্য হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু এখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বোধ হয় যমরাজ বিশ্ববিমোহন রূপে মুগ্ধ

হইয়া বিনষ্ট করিতে অক্ষম হইয়াছেন। অথবা এমন অমূল্য সৌন্দর্য্য হরণ করিয়া পৃথিবীকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিতে দুরন্ত নিষ্ঠুর যমেরও মমতা হইতেছে।

শরৎ-জননী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমে পড়িয়া গেলেন। রমানাথ 'হাহাকার' করিতে লাগিলেন। এ দুঃখের সময় প্রতিবেশিগণ কোথায়? সকলে গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া বাতায়নের নিকট বসিয়া তাঁহাদের রোদনধ্বনি শুনিতেছে। কেহ কেহ যথার্থই দুঃখিত হইয়া সমবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ বা ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে লাগিল,—"চিরদিন কেউ নয়—ভবে এসে ভবের খেলা করা—খেলা ফুরুলেই চলিয়া যাওয়া।" তিনি এমনই স্বরে ও ভাবে বলিতেছেন যেন, তিনি চিরকালই এই ভবে ধূলিখেলা করিবেন। যাহা হউক, দুই চারি জন স্বজাতি প্রতিবেশী উপস্থিত হইয়া মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া শ্মশানাভিমুখে চলিলেন। ব্রজসুন্দরী সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ও কেশ উৎপাটন করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—❧—

শ্মশানে।

একদণ্ড অবকাশ পাইয়া দাসী প্রথমেই তাহার এক আত্মীয়ের বাটীতে যজ্ঞোপলক্ষে গমন করিল। রাজস্বসচিবের দাসী বাটীতে উপস্থিত,—গৃহস্বামীর গর্ব্বের শেষ নাই। সকল লোকই তাহাকে ঘিরিয়া বসিল এবং শরৎ ও পূর্ণচন্দ্রের বিচিত্র প্রেমের কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। প্রথমে—সময় নাই, এইজন্য অনিচ্ছায় গল্পের আরম্ভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল : কিন্তু শ্রোতাদিগের ব্যগ্রতায় বাধ্য হইয়া পুনঃ বসিতে হইল। রাত্রি যখন নয়টা, তখন তাহার চৈতন্য হইল। মহাব্যস্ত হইয়া রাজবাটীর দিকে দৌড়িয়া গেল।

সিংহদ্বার মুক্ত। দুই পার্শ্বে লণ্ঠন জ্বলিতেছে। দ্বারবান্ সশস্ত্রে পাহারায় ব্যস্ত ; তাহাকে দেখিয়া বলিল,—"তোম্ কোন হ্যায় ?" দাসী সংক্ষেপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিল,—"পাঁড়েজী, আমাকে কি শান্তিনিকেতন দেখাইয়া দিতে পারিবে ?" স্থান পরিত্যাগ করিয়া পাঁড়েজী একপদ অন্যত্র যাইতে পারে না, এই কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া, অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া শান্তিনিকেতনের স্বর্ণচূড়া দেখাইয়া দিল। দাসী চলিতে চলিতে এক দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সিঁড়ি-অন্বেষণে ব্যস্ত হইল। দূরে দূরে এক একটী লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, জনমানবের সমাগম ছিল না যে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে।

অতিকষ্টে শেষে সিঁড়ি অবলম্বন করিয়া উপরে উঠিয়া দেখিল,---চারিদিকে কক্ষাশ্রেণী, লণ্ঠনের আলোতে মর্ম্মরপ্রস্তরের মেজিয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে। একে স্ত্রীলোক, তাহাতে কখনও রাজবাটীতে আসে নাই, সুতরাং তাহার মনের চাঞ্চল্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শান্তিনিকেতন তাহার পক্ষে মহা অশান্তির কারণ হইয়া উঠিল। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, একে একে প্রতিকক্ষায় প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। এক একবার প্রত্যাগমনের ইচ্ছা হইতে লাগিল; কিন্তু ফিরিয়া যাইয়া সেই অনন্তশয্যাশায়িনী শরৎসুন্দরীকে কি উত্তর দিবে, তাহা বুঝিতে পারিল না। আবার কক্ষায় কক্ষায় প্রবেশ করিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে দেখিল,---এক গৃহের এক পার্শ্বে এক বালক প্রস্তরের উপর পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। দাসী তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহাকে বলিল,—"মহারাজা কোথায়?" বালক ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কেন, তিনি কি আমায় ডাকিয়াছেন? তাঁহার যে মাথার ঠিক নাই—তিনি যে মধ্যে মধ্যে বিকৃত রবে চীৎকার করেন!" দাসী বলিল,—"না, তিনি তোমাকে ডাকেন নাই, তাঁহার এক পত্র আমার নিকট আছে—আমি দিতে আসিয়াছি।" বালক বলিল,—"তবে ঐ ঘরে যাও।" অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাহাকে বুঝাইয়া দিল।

নির্জ্জন গৃহ। কোনপ্রকার শব্দ নাই। মেজিয়াতে কার্পেট বিস্তৃত। একদিকে কিংখাপ-সংযুক্ত রৌপ্যনির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক, তাহাতে ক্রেপের চতুষ্কী অর্দ্ধমুক্ত রহিয়াছে। স্বর্ণঝালর কৌমুদীবসনা নদীর ন্যায় প্রদীপ-আভায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মধ্যস্থলে সুবৃহৎ টেবিল। তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলিকা এমন সুসজ্জিত রহিয়াছে যে, দেখিলেই বোধ হইবে যেন চন্দ্রকিরণে কুঞ্জবন-শোভিত যমুনা-পুলিনে কৃষ্ণ

বংশীবাদন করিতেছেন। সেই সুমধুর স্বর শ্রবণ করিয়া, গোপিকাগণ যেন তাহাদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। যে যে স্থানে আছে, তন্ময় হইয়া যেন তাহারা সেই অবস্থায় কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কেহ বা উল্লাসিত প্রাণে, বিস্ফারিত নয়নে সেই সর্ব্বজন-মন-মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করিতে করিতে চৈতন্য হারাইয়াছে। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছে। টেবিলের উপর স্বর্ণ-সামাদানে এক বৃহৎ আলো জ্বলিতেছিল। কার্পেটে উপবেশন করিয়া, সতৃষ্ণ-নয়নে, একাগ্রমনে, যুক্তকরে এই দৃশ্য পূর্ণচন্দ্র দেখিতে ছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন,—"গোপিকাগণ, তোমরাই ধন্য! স্বামী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সংসারের সমুদয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, তোমরা তোমাদের হৃদয়ের প্রীতি ও ভালবাসা, সেই বিশ্বের অধিপতি কৃষ্ণকে সমর্পণ করিতে আসিয়াছ। আমি এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম করিয়াও ত, হে কৃষ্ণ! আমার এই সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র প্রেম তোমাকে নিঃস্বার্থভাবে অর্পণ করিতে পারিলাম না। এ প্রাণের দারুণ আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, গঙ্গা ও যমুনা যেমন একত্রে মহাসমুদ্রে পড়িয়াছে, সেইরূপ আমি ও শরৎসুন্দরী অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া তোমার বিশ্বপ্রেমে জীবন ভাসাইয়া দিব। প্রভো! সে আশা, সে সঙ্কল্প ত আমার সফল হইল না। আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র স্রোত যে নিরাশার মরুভূমে শুকাইয়া গেল!" তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আর চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

এই সময় দ্বারদেশে দাসী উপস্থিত হইয়া অনুচ্চস্বরে কহিল,—"মহারাজ—"

উত্তর নাই।

দাসী। মহারাজ—মহারাজ—

পূর্ণ। কে মহারাজ—মহারাজ করিয়া চীৎকার করে?—আমি মহারাজ নহি—রাজ্যের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।

দাসী। মহারাজ—

পূর্ণ। আবার মহারাজ?—এই সকল অবাধ্য ভৃত্যেরা আমাকে মহারাজ—মহারাজ করিয়া পাগল করিল,—আমি কি অষ্টপ্রহর মহারাজ—কখন কেউ কান্ত বলিয়া ডাকিবে না?

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাসীর কলেবর কাঁপিয়া উঠিল। হাতের পত্র ভূমে পড়িয়া গেল। পূর্ণচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"কে আবার এই রাত্রিতে স্ত্রীলোকের দ্বারা পত্র পাঠাইয়াছে? আমার কি একদণ্ড বিশ্রামের সময় নাই?" ভগ্নকণ্ঠে যোড়হস্তে দাসী কহিল—"মহারাজ! এ শরৎসুন্দরীর পত্র।" তিনি বিকৃত স্বরে কহিলেন—'শ-র-ত।' আর যেন দাড়াইবার শক্তি রহিল না; তিনি বসিয়া পড়িলেন; কতক্ষণ পত্র পড়িতে সাহস হইল না। অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয় কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটু শীতল হইয়া পত্রোদ্ঘাটন করিলেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল:—

"প্রাণেশ্বর!

প্রাণেশ্বর বলিবার আর আমার ক্ষমতা নাই। এখন আমি অতি দীনা; মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছি। সেই স্বপ্ন—কান্ত—সেই রজনীর কুটিল স্বপ্ন এত দিনে সফল হইয়াছে। তুমি নদী পার হইয়া চলিয়া গেলে, আমি পর পারে রহিলাম—কাঙ্গালিনীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে জাগরিত হইয়া দেখি, তুমি পার্শ্বে বসিয়া আছ। হায়! তখন আশার ছলনায় মুগ্ধ হইয়া সকল শোক ভুলিয়া গেলাম। সেই দিন হইতে স্বপ্নের কথা মনে হইলেই প্রাণ চমকিয়া উঠিত। এখনও

কত বিকট, কত ভীষণ স্বপ্ন দেখি। তখন তুমি সান্ত্বনা করিয়াছিলে। এখন আমার কে আছে? আমি ভিখারিণী।

তুমি বিবাহ করিয়াছ, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু কেন তুমি আমায় ভুলিয়া গেলে? সেই দিন হইতে আর আসিলে না,—সেই দিন হইতে এ পোড়ার মুখ আর দেখিলে না! এখন আমার বাঁচিবার ফল কি? আমার মৃত্যুই প্রার্থনীয়। যাঁহাকে মনের সহিত ভালবাসিতাম, যাঁহাকে চিরদিনের জন্য বন্ধু বলিয়া জানিতাম, যাঁহার পদতলে ইহকাল ও পরকালের জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম, যাঁহাকে স্বামী মনে করিয়া সুখী হইতাম, তিনিই যদি আমাকে হতাদর করিলেন, তবে আমার এ জীবনে কাজ কি? মরিতাম—উদ্বন্ধনে মরিতাম, কিন্তু আমি মরিলে জননীর কি দশা হইবে? আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা। পিতা শোকে আচ্ছন্ন হইবেন। কে তাঁহাকে বুঝাইবে? জগতে তাঁহাদিগের আর কেহ নাই।

কিন্তু এত ভাবিয়া, এত বুঝিয়া, নিজের দুঃখ হৃদয়ে সম্বরণ করিয়াও তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাদিগকে ভাসাইয়া চিরদিনের জন্য চলিলাম। আমার উৎকট পীড়া হইয়াছে। আর বাঁচিব বলিয়া বোধ হইতেছে না। কান্ত, পিতাকে রাখিয়া চলিলাম। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন,—তাঁহার কেহ নাই। তুমি তাঁহাকে যত্ন করিও,—তুমি তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিও। আমি তাঁহার বড় আদরের ধন ছিলাম। তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। এক দণ্ড আমি চক্ষের অন্তরাল হইলে তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। না জানি, আমা বিহনে, মা কতই না কাঁদিবেন। তুমি 'মা' বলিয়া তাঁহার দুঃখ ঘুচাইও। আমি জন্মের মত চলিলাম! ইহজন্মে কি আর তোমার মুখ দেখিতে পাইব না? মরিতে এখন আমার দুঃখ হইতেছে।

বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত তোমাকে কতবার দেখিতাম ; নিকটেও বসিতাম ; কত কথায় দিন কাটাইতাম। আমার সকল সাধ ফুরাইল। কান্ত! তুমি দয়া ও ধর্ম্মের অবতার। ধর্ম্মরক্ষা করিতে গিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়াছ। আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এখনও তুমি ভালবাস। এখনও সেই ভাব তোমার হৃদয়ে অবিচলিত রহিয়াছে। প্রাণেশ্বর! আর এক কথা—তাহা হইলে আমি চিরদিনের তরে বিদায় হই।

মরিতে আর আমার দুঃখ কি? তবে এ মৃত্যুসময়ে তোমার মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ আমার অন্তরে থাকিয়া যাইবে—এ দুঃখ আমি মরিলেও ভুলিতে পারিব না। এখনও সময় আছে। শীঘ্র আসিয়া একবার দেখা দাও। আমি তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে পিতামাতার কোলে শুইয়া মরিব, এই বাসনা।—উঃ—'কান্ত' বলিয়া ডাকা আমার কি ঘুচিয়া যাইবে? কি সর্ব্বনাশ! আমি কোথায় যাইতেছি? আমি কি অনন্ত পথের পথিক হইয়াছি? এই যে মৃত্যু আমার সম্মুখে! কান্ত! রক্ষা কর—রক্ষা কর—মৃত্যুর অসহ্য যন্ত্রণা!

আমি মরিলে তুমি দুঃখিত হইবে না। তোমার জীবন বহু মূল্যের। আমার হস্তস্থিত অঙ্গুরী অঙ্গুলিতে দিয়া অভাগিনীকে স্মরণ রাখিবে; আমার এই শেষ ভিক্ষা। কান্ত! আর লিখিতে পারি না। চক্ষে আর দেখিতে পাই না,—হস্ত কেমন অবশ হইয়া আসিতেছে, মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।—

ইহকালের ও পরকালের তোমারই সঙ্গিনী।"

পত্র পড়িয়া পূর্ণচন্দ্র স্পন্দহীন হইলেন। চক্ষু পত্রের উপর, কিন্তু দৃষ্টি সে দিকে ছিল না। ক্রমে তাঁহার মোহ হইল। কতক্ষণ তিনি

পড়িয়া রহিলেন। চৈতন্যের উদয় হইলে তিনি ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিলেন,—"কি—শরৎ আমার জন্য অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করিবে, আর আমি এমনই নরাধম যে, প্রাণসর্ব্বস্ব হৃদয়নিধিকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত! শরৎ, তুমি মৃত্যুমুখে, আর আমি অক্ষতশরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছি! কি কঠিন প্রাণ! কি পাষাণ হৃদয়! আমি এখনই তোমার সম্মুখীন হইব। তুমি আমারই,—তুমি আমার জীবনের প্রদীপ—তোমা ভিন্ন এ হৃদয় আর কাহারও নয়,—কখনও হইবে না। আমি সেই কান্ত তোমারই—" এই বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া আসিল। আর কথা কহিতে পারিলেন না। চক্ষুজলে বুক ভাসিয়া গেল। কতক্ষণ পরে তিনি উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন, হাতে অসি লইলেন. কক্ষের বাহিরে আসিয়া কহিলেন,—"আজ সকলকে বিসর্জ্জন দিলাম,—আজ অভিন্ন হৃদয়ে, উভয়ে এক সঙ্গে, প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া মহাসাগরের উদ্দেশে চলিব—প্রভো! তুমি আমার এই বাসনা পূর্ণ কর।" এই বলিয়া তিনি সোপানে পদ-প্রসারণ করিলেন। বালক ভৃত্য মহারাজার অসম্বন্ধ প্রলাপ শুনিয়া ভীত হইল, ব্যস্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

যখন পূর্ণচন্দ্র প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি দশটা। বায়ু প্রবল বেগে বহিতেছে। আকাশে একটীও নক্ষত্র নাই। ক্ষীণ চন্দ্র লুকাইয়া পড়িয়াছে। মেঘ উত্তরোত্তর গভীরতর হইতেছে। যামিনী বিভীষিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রকৃতির অনৈসর্গিক ভাব উপস্থিত হইয়াছে। তিনি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। মাধবীলতা, মল্লিকা, যূথী, মালতী, গোলাপ, রজনীগন্ধা প্রভৃতি পুষ্পলতাগণ বায়ুভরে তাঁহার পদতলে পড়িয়া যেন সকাতরে বলিতেছে,—"রাজ্যেশ্বর! আমাদিগকে অনাথিনী করিয়া এ অন্ধকারে, এ বাতাসে আজ তুমি

কোথায় যাইতেছ ?” সিংহদ্বারে প্রহরী বন্দুক স্কন্ধে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মহারাজকে দেখিবামাত্র নতশির হইল। বিবাহের পর মহারাজা উন্মত্ত হইয়াছেন, এই সংবাদ রাজধানীতে প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার বেশভূষা ও অন্ধকার রাত্রে তাঁহাকে একাকী অসি হস্তে রাজবাটীর বাহির হইতে দেখিয়া তাহার সন্দেহের উদয় হইল। বিগলে ফুঁ দিবা মাত্র জমাদার উপস্থিত হইল। তখন তাহাকে সে তাহার সন্দেহের কথা বলিল। কথা শুনিয়া জমাদার উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গেল।

যখন তিনি শরৎসুন্দরীর বাটীর সন্নিকট হইয়াছেন, তখন প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল। নিবিড় নীল কাদম্বিনী যেন আলুলায়িত কেশে উপস্থিত হইয়া, সংসারের শান্তির সহিত ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সময় চতুৰ্দ্দিক্‌ উদ্ভাসিত করিয়া বিজলী চমকিয়া উঠিল। মহানির্ঘোষে নিকটস্থ পৰ্ব্বতোপরি এক বটবৃক্ষে অশনি পতিত হইল। এক নিমেষে যেন সংসার জ্বলিয়া উঠিল। পর নিমেষে গভীর অন্ধকারে মেদিনী নিমগ্ন হইল। সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিয়া যেমন সৈনিকেরা গোলা বা তীর নিক্ষেপ করে, সেইরূপ ভীমা কাদম্বিনী এতক্ষণ স্থির থাকিয়া গভীর শব্দে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। ধরা ভাসিয়া গেল।

দুই তিন লম্ফে পূর্ণচন্দ্র শরৎসুন্দরীর বাটীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ। প্রথমে আঘাত, পরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না। দ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বহির্দ্দিকে তালা বন্ধ। তখন হৃদয় একান্ত অশান্ত হইয়া উঠিল। মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তমোগুণে মন পরিপূর্ণ হইল। বহির্জ্জগতের ভয়ঙ্কর ভাব অপেক্ষা অন্তর্জ্জগতের ভাব চতুর্গুণ ভীষণ হইল। তিনি এক লম্ফে সুদীর্ঘ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিলেন। বাটীর মধ্যে

প্রবেশ করিয়া চারিদিকে আঁধার দেখিলেন। কেহই দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। তিনি অন্ধকারে প্রতিকক্ষায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া আকণ্ঠ হৃদয়ে 'শরৎ—শরৎ' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। বৃষ্টির শব্দ ভেদ করিয়া নৈশ গগনে সেই স্বর ছড়াইয়া পড়িল। আকাশে যেন প্রতিধ্বনি উঠিল—'শেষ'। হতাশ হইয়া, আকুল কণ্ঠে বলিলেন,—"তবে কি আমার শরৎ নাই? তবে কি শরৎ চিরদিনের জন্য ইহসংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে? তবে কি অভাগা আর দেখিতে পাইবে না? কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ঙ্কর চিত্র! একেবারে আর আসিবে না? আর ফিরিবে না? যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে—আর ফিরিবে না? উঃ—সংসারের নিয়ম কি কঠিন! এ কঠোর নিয়মের কে সৃষ্টি করিল? কি উদ্দেশ্যে এ সৃষ্টি কে করিল?" তিনি বিকট হাস্য করিলেন। ঐশিক নিয়মে যেন তিনি ব্যঙ্গ করিলেন। তিনি উন্মাদের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"শরৎ—এ সুখের গৃহে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে না, কিন্তু কে আমার ইচ্ছার প্রতিরোধ করিতে পারে? আমি শ্মশানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। দেখিব,—এ সংসার কেমন করিয়া সুখের প্রতিবন্ধক হয়? দেখিব—কোন্ যম আমাকে প্রতিরোধ করিতে পারে? কোন্ বিধি আমার প্রতিবাদী হয়?" এই বলিয়া সেই ঝড়ে, সেই বৃষ্টিতে ক্ষিপ্তের ন্যায় শ্মশানাভিমুখে দৌড়িলেন।

রাজধানীর এক পার্শ্বে একটী খণ্ডশৈল আছে। তাহারই শিখরদেশে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বৈতরণীর তটে, বটবৃক্ষের নিম্নে, লৌহ-নির্ম্মিত চুল্লির উপর চিতা সজ্জিত। সংসারের এই মহাতীর্থ অবলম্বন করিয়া, এই নগরের মনুষ্যগণ পরলোকে যাত্রা করিয়া থাকে। স্বর্ণপ্রভা

শরৎসুন্দরী চিতায় শয়ন করিয়া আছেন। পিতা, মাতা,' আত্মীয় বন্ধুগণ এতক্ষণ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়াছিলেন, কিন্তু অশনিপতনে ও বায়ুর বেগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়াতে ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল দেখিয়া, অগত্যা, অতি অনিচ্ছায় তাঁহারা নিকটবর্ত্তী শ্মশান-গৃহে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। রমানাথ বুঝিলেন, বিপদ্ কখন একাকী আইসে না।

ঝড়ে ও অন্ধকারে পূর্ণচন্দ্র পথ হারাইলেন। বনের মধ্যে পড়িয়া দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইলেন। কতক্ষণ ঘুরিতে ঘুরিতে শ্মশানের আলো দেখিতে পাইয়া তীরবেগে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। বন্য বৃক্ষের ঘর্ষণে পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া দরদর বেগে রুধির বাহির হইতে লাগিল। কোনক্রমে বটবৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—ধূধূ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে। শরৎসুন্দরী তদুপরি শয়ন করিয়া শান্তভাবে নিদ্রা যাইতেছেন। অগ্নি তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে পারে নাই। যেন প্রকৃতি সন্তপ্ত হইয়া বায়ু দ্বারা অগ্নিশিখা দূর করিয়া দিতেছেন। মৃণাল-বিচ্ছিন্ন পদ্মের ন্যায় শরৎ-সুন্দরী শ্মশানে শোভা পাইতেছেন। তিনি দক্ষিণ হস্তে একখানি ক্ষুদ্র গীতা ধারণ করিয়া যেন—'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ"—পাঠ করিয়া কান্তকে আত্মার অবিনশ্বরত্ব বুঝাইতে চেষ্টা পাইতেছিলেন।

আকর্ণ চক্ষুকে বিস্ফারিত করিয়া পূর্ণচন্দ্র একবার চারিদিকে দেখিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অদ্ভুত তীব্র জ্যোতিঃ নির্গত হইল। মুখ কেমন বিকট হইল। সর্ব্বশরীরে অস্বাভাবিক তেজ ক্রীড়া করিতে লাগিল। তিনি নিবিষ্টচিত্তে দেখিলেন,—শরতের স্বর্ণ-অঙ্গে অগ্নির 'আঁচ' অবধি লাগে নাই। তবে মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। জীবন নাই,

তথাচ মৃত মুখ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তিনি যে দিকে কেন গমন করুন না, তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন মৃত মুখ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। চক্ষু অর্দ্ধবিকসিত। ওষ্ঠদ্বয় ঈষৎ বিভিন্ন। শ্বেতদন্তশোভা তাহার ভিতর হইতে তখনও নির্গত হইতেছিল। অগ্নির আভা পতিত হইয়া তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দেখাইতেছিল। তিনি চিতা আলো করিয়াছিলেন।

সেই মূর্ত্তি দেখিয়া পূর্ণচন্দ্রের মনে হইল, তিনি যেন তাঁহাকে কি বলিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন; কহিলেন—"শরৎ—স্বর্ণকমল—কাষ্ঠের উপর শয়ন করিয়া কেন অসহ্য যাতনা সহ্য করিতেছ? তুমি কি নিদ্রিতা? আমার কথা কি শুনিতে পাইতেছ না? কান্তগতপ্রাণা, একবার উঠ। আমি ভিখারীর ন্যায় দ্বারে দণ্ডায়মান। একবার নয়ন উন্মীলন কর।—আমাকে কি দেখিতে ইচ্ছা হয় না? একবার কথা কও, কথা কহিবার কি সাধ নাই? একবার হাস, হাসিতে কি প্রাণ চায় না? কেবল শুইতে এতই বাসনা? এই কাষ্ঠশয্যায়, এই নির্জ্জন প্রান্তরে, এই বৃষ্টিতে, এই ঝড়ে, অনাবৃত হইয়া শুইতে এতই বাসনা? শরৎ! এ কি অভিমান? আমি নরাধম, প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী বলিয়া কি, জীবিতেশ্বরি! এতই রাগ—এতই অভিমান যে, যোড়হাতে ভিক্ষা করিতেছি, তথাপি কথা কহিবে না? তবে কি আর এ পাপাত্মার মুখ দেখিবে না?" হো—হো করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

প্রবল বাতাসের বেগে চিতার আগুন গর্জ্জিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই অগ্নিপ্রভায় শরতের দেহ অধিকতর লাবণ্যযুক্ত হইল। পূর্ণচন্দ্র আত্মস্মৃতি লাভ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—"প্রাণেশ্বরি, চিরদিনের জন্য গিয়াছ;—আর আসিবে না। ঈশ্বরের কঠোর নিয়মের পরি-

বর্ত্তন নাই। একবার গেলে, কেহই ফিরিয়া আসে না। কি কঠোর নিয়ম !! কিন্তু এ কঠোর নিয়মে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? এ সংসারে আমার আর আবশ্যক কি? যে সংসারে শরৎ জলাঞ্জলি দিয়াছে,—সে সংসারে আমার আবশ্যক কি? চল—আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি। চল—উভয়ে অনন্ত লোকে অনন্ত কাল একত্রে থাকিব। বিচ্ছেদ কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইবে না। চল—যে দেশে মৃত্যু নাই, যে দেশে বিচ্ছেদ নাই, যে দেশে কেবল শান্তি ও সুখ, চল—সেই দেশে---আমরা দুইজনে তথায় বাস করিব। উঃ—বুক আমার ফাটিয়া যাইতেছে। এ কি সহ্য হয়? একজন আমার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল—আর আমি অক্ষত শরীরে তাহার সম্মুখে এখন অবধি দণ্ডায়মান! এই কি কৃতজ্ঞতা! এই কি প্রেম! এই কি নিঃস্বার্থভাব! এই কি অনুশোচনা! কখনই নয়—কখনই নয়—"

ক্রমে তাঁহার বিকৃতবুদ্ধি উপস্থিত হইল। তিনি তর্জ্জনগর্জ্জন করিয়া, বাহু আস্ফালন করিয়া কহিলেন, "কখনই নয়—কখনই নয়—এই অক্ষত শরীর এখনই ক্ষত হইবে। এই প্রাণ, ঐ প্রাণে এখনই মিশাইবে, এই দেহ তোমার সঙ্গে এক চিতায় ভস্মীভূত হইবে। প্রাণেশ্বরি—এস, একবার আলিঙ্গন করি। একবার হৃদয়ে হৃদয় স্পর্শ করিয়া অন্তরের প্রজ্বলিত অগ্নি নির্ব্বাপিত করি। এস, এক শয্যায় দুই জনে শয়ন করিয়া সংসারের খেলা শেষ করি। এস প্রাণেশ্বরি—" এই বলিয়া চিতার উপর লম্ফ প্রদান করিলেন। দুই হস্তে অতি দৃঢ়রূপে শরতের দেহ বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, কহিলেন,—"চল—এক সঙ্গে, এক শকটে উভয়ে পরলোকের যাত্রী হই।"

উচ্চ গিরির এক প্রান্তে শ্মশান। চিতার নিকট হইতেই পর্ব্বতের গাত্র নিম্নে লম্বমান হইয়া সুবর্ণরেখা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

লোহার রেলিংএ ঐ সঙ্কটজনক স্থান সুরক্ষিত ছিল। কিছুদিন হইল, রেলিং ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, এখনও প্রস্তুত হইয়া স্বস্থানে রক্ষিত হয় নাই। পূর্ণচন্দ্র শরৎসুন্দরীকে যেমন আলিঙ্গন করিয়াছেন, অমনি চিতা মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অগ্নি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইল। তিনি শরতের দেহ ধারণ করিয়া অতি বেগে মুক্ত স্থানে পতিত হইলেন। এমন বিপদ্‌সঙ্কুল স্থানে তিনি উপনীত হইলেন যে, আত্মপ্রাণ রক্ষা করিতে হইলে, শরতের দেহ পরিত্যাগ ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। ঘোর সঙ্কট সমুপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি কেবল ভাবিলেন,—"প্রাণেশ্বরি, জীবিত অবস্থায় তুমি ত আমার সঙ্গিনী হইলে না—এখন মৃত শরীর হৃদয়ে ধারণ করিয়া সুখে ও শান্তিতে ইহ-লোক ত্যাগ করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাও আমার অদৃষ্টে হইল না। তুমি কি আমাকে ফেলিয়া একাকিনী চলিয়া যাইবে? একি কখনও হইতে পারে? এ জীবনে সবে মাত্র তোমার আলিঙ্গন সেই একবার প্রথম লাভ করিয়াছিলাম, আর এই মৃত দেহে শেষ আলিঙ্গন, লাভ করিতে গিয়াছিলাম—তাহাতেও কি এত বিড়ম্বনা!"

এক তিল সময়ের জন্য এই চিন্তা করিতে অবকাশ মাত্র পাইলেন। যখন দেখিলেন যে, শরৎসুন্দরীর দেহ সহিত পর্ব্বতের গাত্র অতিক্রম করিয়া নিরাপদ্ স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলেন না, - যখন বুঝিলেন যে, হয় শরতের দেহ পরিত্যাগ,—না হয় সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণরেখা-নদীতটে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে, তখন তিনি অতি হৃদয়ভেদী স্বরে, করুণ-কণ্ঠে,মনে প্রাণে চীৎকার করিলেন,—"**অন্তিমে কৃষ্ণ** হে—"

অকস্মাৎ চপলার আলোকে জগদ্ভাসিত হইল। তিনি নয়ন বিস্ফা-রিত করিয়া যেন দেখিলেন,—পর্ব্বতের পার্শ্বে, শূন্য প্রদেশে, নবনীল-জলধর-কান্তি-সংযুক্ত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী এক বিরাট মূর্ত্তি সুপ্রসন্ন-

মুখে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন। সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া পূর্ণচন্দ্রের নয়ন যেন ঝলসিয়া গেল। অন্তরে অমৃতের স্রোত বহিতে লাগিল। ক্ষণেকের মধ্যে চপলার আলো নিবিয়া গেল। ঝড়ে, বৃষ্টিতে ও অন্ধকারে দিক্ ভরিয়া গেল। পূর্ণচন্দ্রের কণ্ঠস্বর নীরব হইল।

কতক্ষণ পরে ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। রমানাথকে অগ্রসর করিয়া অপর সকলে শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। চিতার অবস্থা ও দেহের অন্তর্ধান দৃষ্টি করিয়া, দানব ও পিশাচের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই ভয়ে সকলে ঘন ঘন 'হরি'ধ্বনি দিতে লাগিল। কেবল রমানাথ ও ব্রজসুন্দরা নির্ভীক হৃদয়ে চিতার চারিদিকে দেহান্বেষণে ব্যস্ত রহিলেন।

পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশে এই সময় ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। যেন সহস্র লোক চাৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে গগন পরিব্যাপ্ত হইল। একটি, দুইটি, তিনটি করিয়া ক্রমে ক্রমে সহস্র মশাল জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মধ্যে 'হুঙ্কর হুঙ্কর' শব্দে বাহকেরা শিবিকা আনয়ন করিতে লাগিল। সৈনিকেরা মশাল লইয়া অগ্রপশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। ঘোটকারোহণে এক প্রকাণ্ডদেহবিশিষ্ট অশ্বারোহী দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আলোকে তাঁহার অসির ফলা প্রতিফলিত হইল। রমানাথ দেখিলেন, সেনাপতি অমরসিংহ উপস্থিত। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,— "সেনাপতি মহাশয়, আপনি শ্মশানে কেন?"

অমর। মহারাজ শ্মশানে আসিয়াছেন, আপনি কি দেখিয়াছেন?

রমা। বৃষ্টির জন্য আমরা এতক্ষণ শ্মশানগৃহে অপেক্ষা করিতেছিলাম,—তাঁহাকে ত দেখি নাই। মহারাজ শ্মশানে আসিলেন কেন?

অমর। আপনারই কন্যার উদ্দেশে, তিনি একাকী প্রাসাদের বাহির হইয়াছেন।

রমানাথের শরীর রোমাঞ্চিত হইল; তিনি বলিলেন, "তবে কি তিনিই শরৎসুন্দরীর দেহ চিতা হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছেন?"

অমর। সে কি অসম্ভব কথা বলিতেছেন, মহাশয়?

রমা। আমার একবার মাত্র বোধ হইয়াছিল—কে যেন করুণ-কণ্ঠে 'অন্তিমে কৃষ্ণ হে' বলিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে চীৎকার করিয়াছিলেন।

অমরনাথ তখনই আলো লইয়া সৈন্যদিগকে নিম্ন প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। শিবিকা নামাইয়া বাহকেরা বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিল।

আলো লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া বন অনুসন্ধান করিতে করিতে এক সিপাহী চীৎকার করিয়া উঠিল। দশজন একত্র হইয়া দেখে—মহারাজ পূর্ণচন্দ্র বজ্রমুষ্টিতে শরৎসুন্দরীকে ধরিয়া আছেন। রুধিরাক্ত কলেবর। ব্রহ্মরন্ধ্র প্রায় চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৈনিকেরা আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উভয় দেহ বটবৃক্ষমূলে আনয়ন করিল। শিবিকার কপাট মুক্ত করিয়া, রাণী কমলকুমারী আলুথালু বেশে বাহির হইলেন। দুই হাতে মৃত পুত্রের দেহ কোলে তুলিয়া লইলেন।

পূর্ণচন্দ্রের সে চমৎকার সৌন্দর্য্য আর নাই। মস্তকে ক্ষত, শরীরে ক্ষত, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। কমলকুমারী পুত্রের অবয়ব দেখিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় গুর্‌গুর্‌ করিয়া উঠিল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মস্তক ঘুরিয়া গেল। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হইয়াছিল। পুত্রের বিবাহ হইয়া গেলে পর যখন বুঝিতে পারিলেন, কেবল তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য পুত্র অভ্যন্তরে আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দুঃখের পরিসীমা রহিল

না; স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। শরীর কঙ্কালে পরিণত হইল।

আজ এই নিশীথে পুত্রকে কোলে লইয়া যখন দেখিলেন,—তাঁহার প্রাণ নাই, শ্বাস বন্ধ, দেহ নির্জ্জীব জড়পিণ্ডের ন্যায়, তখন বিকৃত রবে "ও—বাবা—পূর্ণচন্দ্র" বলিয়াই ভূমে আছড়াইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা একেবারে চলিয়া গেল। পুত্রবৎসলা মাতা পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন।

এই দুঃসময়ে সেনাপতি অমরনাথ অকুতোভয়ে ও বিপুল ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মহারাজার স্বজাতীয় যুবা ও বৃদ্ধ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইটী পর্য্যঙ্কে শয্যা প্রস্তুত হইল। একের উপর পূর্ণচন্দ্র ও শরৎসুন্দরীর দেহ স্থাপিত করিয়া, দ্বিতীয়ে রাণীর দেহ সযত্নে রক্ষিত হইল। সৈনিকেরা মশাল হস্তে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া মস্তক হেট করিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও সর্ব্বশেষে উভয় পর্য্যঙ্ক মন্থরগতিতে প্রাসাদাভিমুখে চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যেই এই দুর্ঘটনা রাজধানীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল। নগরবাসী কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ, সকলে দলে দলে ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানাভিমুখে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। রমণীগণ স্ব স্ব বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পর্য্যঙ্ক যেমন নগরের মধ্যে পৌঁছিল, অমনি ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল। কৃতজ্ঞ হৃদয় হইতে অবিরত শোকোচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"হায় মহারাজ, তুমি অল্পদিন মাত্র রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া আমাদের মন প্রাণ হরণ করিয়া লইয়াছিলে। তুমি আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া যে ছদ্মবেশে আমাদের বাটীতে

আসিয়া, আমাদের সঙ্গে মিশিয়া, আমাদের সুখদুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমাদের সকল দুঃখ ও অভাব মোচন করিতে। হায়! আজ তোমা বিহনে ও রাণীর অবর্ত্তমানে আমরা কোথায় যাইব?" এই সময় একদল সামান্যজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ পর্য্যঙ্কের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মৃত দেহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। সজল নয়নে বলিতে লাগিল,—'মহারাজ, তোমার করুণা, তোমার ভালবাসা আমরা কখনও ভুলিব না। তুমি জাতিনির্ব্বিশেষে আমাদিগকে পালন করিতেছিলে; আজ আমরা যথার্থই অনাথ হইলাম।" স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেই অঞ্জলি ভরিয়া পুষ্প ও পুষ্পের মালা উভয় পর্য্যঙ্কে ভক্তিভরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে উভয় খট্বা রাজবাটীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল। যে সন্ন্যাসী আজীবন কৌমার্য্যব্রত ধারণ করিয়া নির্লিপ্ত ভাবে ও উদ্যম সহকারে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, আজ সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ হৃষীকেশ দণ্ডায়মান হইয়া অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তিনি অতি কষ্টে শয্যার উপর পুষ্প প্রক্ষেপ করিয়া, পবিত্রচিত্তে একবার মহারাজার ও রাণীর মুখাবলোকন করিয়া তপ্তশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তখন বাহকেরা অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যানে চলিয়া গেল।

সকলে চলিয়া গেলে পর ও অশীতিপর বৃদ্ধ মহর্ষি একাকী সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে যোড়হস্তে, ঊর্দ্ধমুখে, বিষণ্ণচিত্তে বলিলেন—"বিভো! মোহমুগ্ধ হইয়া আজ যে অপরাধ করিলাম, তাহা মার্জ্জনা কর। এ সংসার তোমার লীলাক্ষেত্র। তুমি যাহা করিতেছ তাহাই সত্য। আমি না বুঝিয়া আজ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া তোমার কার্য্যে প্রতিবাদ করিলাম। দেহীর পক্ষে আত্মসংযম কি ভয়ঙ্কর!" ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন বুঝিতে পারিয়াই

যেন তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইলেন। অমনি তাঁহার মোহ অপনীত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—সত্য, ধর্ম্ম ও নীতি প্রচারের জন্য ভগবানের ইচ্ছায় পৃথিবীতে সাধুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাঁহারা এই পৃথিবীতে তাঁহার আদেশে সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। ভগবান্ স্বয়ং ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নিজের দেহ রচনা করিয়াছিলেন এবং কার্য্যসমাপনান্তে ব্যাধের বাণাঘাতে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। বীর ও ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্য অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস শরশয্যায় শয়ন করিয়া সূর্য্যের উত্তরায়ণে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। বীরাগ্রগণ্য কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন হিমালয়-শিখর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। পবিত্র দাম্পত্যপ্রণয় ও প্রজাবাৎসল্য শিক্ষা দিবার জন্য রাম ও সীতা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে আজীবন কষ্টভোগ করিলেন। ভগবান্‌কে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয় তাহা শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু চৈতন্য প্রেমে বিভোর হইয়া, সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া, 'হা কৃষ্ণ—হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিতে আসিয়া জিজস্ ক্রাইষ্ট লৌহকীলকে প্রোথিত হইয়াছিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া তিন দিন পরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সুখ ও দুঃখ কেবল মনের ভাব বা বিকার মাত্র। মহাত্মারা দুঃখে কাতর না হইয়া বরং দুঃখে পতিত হইলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন। দুঃখের মধ্যে দীনব্যক্তি দীনবন্ধুকে যেমন দেখিতে ও বুঝিতে পারেন, সম্পদের সময় তাঁহাকে তেমন ভাবে আজ অবধি কয় জন লোক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন?

হৃষীকেশ সংযতহৃদয়ে, প্রসন্নমনে বলিলেন,—"ধর্ম্ম, নীতি, প্রেম,

কর্ম্ম ও শাসন শিক্ষা দিবার জন্য, পূর্ণচন্দ্র—তুমি জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। তোমার কর্ত্তব্য তুমি সমাপন করিয়া তাঁহারই ইচ্ছায় আজ চলিয়া গেলে।" এইরূপে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া মহর্ষি ধীর পদবিক্ষেপে দেবালয়াভিমুখে চলিয়া গেলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

——(*)——

যৌবনে যোগিনী।

বিবাহের দিন হইতে যোগেশ্বরী এক রাত্রিও সুখে নিদ্রা যান নাই, এক দিনও তিনি স্বামীর সহিত একটী কথাও কহিতে সময় পান নাই, একদিনও তাঁহার নিকট যাইবার জন্য অবকাশ পান নাই। তিনি একাকিনী শয্যায় শয়ন করিয়া কেবল অবিশ্রান্ত ভাবিতেন— "কেন, তিনি আমায় ভালবাসেন না? আমি ত তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, তাঁহাকে দেখিলেই যে আমার ভালবাসা উথলিয়া উঠে, তবে তিনি ভালবাসিবেন না কেন?" রাণী কমলকুমারীর যত্নে ও বন্দোবস্তে পূর্ণচন্দ্র ও শরৎসুন্দরীর প্রেমের কথা যোগেশ্বরী কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই। যখন শুনিলেন,—পূর্ণচন্দ্র রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ভাবিলেন,— "নিশ্চয়ই তাঁহার অসুখ হইয়াছে—আমি ত তাঁহার দাসী, তবে কেন তিনি সেবার জন্য আমাকে আহ্বান করিতেছেন না? আমি আপনা হইতে যাইব। যদি রুষ্ট হন? আমার ঘোর সঙ্কট। এ সঙ্কটে আমি কি করিব?"

অদ্য রজনীতে তিনি বুঝিয়াছেন, কি কারণে পূর্ণচন্দ্র তাঁহাকে ভালবাসেন নাই। আজ তিনি বুঝিয়াছেন যে, পূর্ণচন্দ্র শরৎসুন্দরীর প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, শেষে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। আজ তিনি বুঝিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত বিবাহ কেবল নাম মাত্র; পিতার আজ্ঞা-

পালন ও মাতার চিত্তবিনোদের জন্য। এই সকল বুঝিয়াও তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"শরৎসুন্দরীকে যদি এত ভালবাসিতেন, তবে কেন তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিলেন না? আমার ত কোন আপত্তি ছিল না। তাঁহাকে সুখী দেখিলেই ত আমার সুখ। তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইলেই ত আমার আনন্দ। তাঁহার সেবা করিতে পারিলেই ত আমার জীবন সার্থক হইত। কেন তবে তিনি বিবাহ করিলেন না? আমি দুজনেরই চরণ পূজা করিতাম। তিনি যাহাকে ভালবাসিতেন, আমিও তাঁহাকে ভালবাসিতাম। হায়! হায়! আগে যদি জানিতাম, এ কথা ঘুণাক্ষরে যদি কেউ আমাকে বলিত, তাহা হইলে আমি এই প্রাণ আগেই বিসর্জ্জন দিতাম। তাহা হইলে তাঁহার বিবাহে ত প্রতিবন্ধক পড়িত না! জীবন দিয়া যদি জীবিতেশ্বরের উপকার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে ত আমার পরলোকে, অনন্তকালে অনন্ত সুখ হইত? এখন আমি অক্ষত শরীরে বাঁচিয়া আছি। এ জীবনে এখন আর কি করিতে পারিব? এ জীবনের এখন আর কি মূল্য রহিল? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমিই স্বামিঘাতিনী—আমিই স্বামীর সর্ব্বনাশ করিয়াছি—"

এই বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। সে রাত্রি অবিশ্রান্ত কাঁদিলেন। কেবল ভাবিলেন,—"আমিই স্বামিঘাতিনী—পতির সুখের জন্যই বনিতা; সর্ব্বস্ব ত্যাগ, এমন কি জীবন ত্যাগ করিয়া পতির তুষ্টি সাধন করিবে। কেন আমি প্রাণ দিয়া স্বামীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিলাম না?" রাত্রিশেষে তিনি মল্লিকাকে আহ্বান করিলেন। সে এক অবিবাহিতা বালিকা, তাঁহারই সমবয়স্কা ও বাল্যসহচরী। সে যোগেশ্বরীর বড় অনুগতা ছিল। সে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন,—"মল্লিকে,—শুনিলাম রাণী মা ও মহারাজাকে উদ্যানে আনিয়াছে—সকল

লোকেই দেখিতে যাইতেছে। সত্য—তিনি আমাকে ভালবাসিতেন না, কিন্তু তাহা হইলেও ধর্ম্মতঃ তিনি আমার প্রাণবল্লভ ছিলেন; আমি কি একবার তাঁহাকে জন্মশোধ দেখিতে পাইব না? আমি কি একবার তাঁহার চরণ পূজা করিতে পারিব না? আমার পাপ কি এতই গুরুতর যে, সকলেই সেই মহাত্মার মৃতশরীর দেখিবে, আর এ অভাগিনী কেবল বঞ্চিতা হইবে?"

মল্লিকা কাঁদকাঁদ মুখে কহিল,—"সই—সেখানে অনেক লোক। আমি গিয়াছিলাম। রাজ্যের সমুদায় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত। কেমন করিয়া সেখানে যাইবে? যাইতে কি কেউ তোমাকে দিবে?"

যোগে। আমার আর লজ্জা কি ভাই? লজ্জাই ত আমার কাল। লজ্জায় আমি কখন মুখ তুলিয়া তাঁহাকে দেখি নাই। দেখা ত আমার ঘুচিয়া গেল। কিন্তু আমি একবারও কি সে মৃতমুখ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইব না?

মল্লি। সই, তবে একটু বোস,—আমি জানিয়া আসিতেছি।

বালিকা চলিয়া গেল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"সই, লোকজন সকলেই চলিয়া যাইতেছে; পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, এখনই তুমি যাইতে পারিবে।"

অল্প পরে দুইজন দাসী অনাথিনী মহারাণীকে লইতে আসিল। তাহারা অগ্রে, মধ্যে যোগেশ্বরী, পশ্চাতে মল্লিকা প্রভৃতি অন্য পুরস্ত্রীগণ যাইতে লাগিলেন। পুষ্করিণীর তীরে, সুদীর্ঘ আম্রবৃক্ষের নিম্নে দুইটী চন্দন কাষ্ঠের চিতা সজ্জিত হইয়াছে; তদুপরি তিনটী আবৃত দেহ লম্বমান রহিয়াছে।

রাজপুরোহিত ভবানীশঙ্কর ভিন্ন তথায় আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না। তিনি নব রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মা,

মহারাজ শশধর রাও বাহাদুর আজ নির্ব্বংশ হইয়াছেন,—প্রাচীন রাজবংশ এত দিনে ধ্বংস হইল। অদৃষ্টই সকলের মূল। আপনি এই বংশের বধূ। সৎকার্য্যের ভার আপনার উপর অর্পিত হইয়াছে। আপনি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া যথাবিধি সৎকার করুন।”

যোগেশ্বরী দেখিলেন—প্রথমে রাণী, দ্বিতীয়ে পূর্ণচন্দ্র ও শরৎসুন্দরী একত্রে এক চিতায় শয়িত রহিয়াছেন। তিনি স্বামীর আচ্ছাদনবস্ত্র উন্মোচন করিলেন। অনিমেষ লোচনে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পদতলের দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, স্বামীর পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন,—“মহারাজ, যদি শরৎসুন্দরীকে বিবাহ করিতে, তাহা হইলে এ রাজপুরী অন্ধকার হইত না। কেন তুমি বিবাহ করিলে না? কাহার মুখাপেক্ষা করিলে? আমি কি তোমার অন্তরায় হইয়াছিলাম? আমার জন্যই কি তোমার সুখে প্রতিবন্ধক পড়িল? তবে আমিই এই সোণার দেহ ছারখার করিলাম? আমি কি শেষে স্বামিঘাতিনী হইলাম? মহারাজ, আমি কাতরে, আমি বিনয়ে, আমি চরণে ধরিয়া তোমার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। মহারাজ, যাহা হইয়াছে, তাহা ফিরাইবার সাধ্য কাহারও নাই। তুমি এখন স্বর্গে চলিলে। তথায় তুমি দিদি শরৎসুন্দরীর সহিত অনন্তকাল বাস করিবে। কিন্তু আমার একটী ভিক্ষা আছে। আমায় কি তুমি তোমাদের সেবার জন্য পরকালে নিযুক্ত করিবে? আমি তোমাদের সেবা করিতে পারিলেই আপনাকে সুখী মনে করিব। আমি আর কিছুই চাই না; আমি আর কিছু জানি না।”

যোগেশ্বরী আকাশে মুখ তুলিয়া কহিলেন,—“জগদীশ্বর, অভাগিনীর পিতৃ ও শ্বশুরকুল নিধন হইল। এখন তাহার জগতীতলে দাঁড়াইবার স্থান নাই। এ জন্মের জন্য আমার কোন প্রার্থনা নাই। তবে যদি

মরি—মরিয়া যদি নারীজন্ম গ্রহণ করি, তবে পূর্ণচন্দ্রের সেবা করিয়াই যেন সে জন্ম কাটাইতে পারি।”

তিনি পুনরায় স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইলেন। করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন—“আহা! —তেমন সুন্দর দেহ একেবারে শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে! ক্ষতে ক্ষতে শরীর পূর্ণ!” ঝর্‌ঝর্ করিয়া তাঁহার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভাবিলেন,—“আহা! ঐ শরীরে কি দারুণ আঘাতই লাগিয়াছে।”

তিনি রাণীর পদপ্রান্ত ধারণ করিয়া ‘মা—মা’ রবে কতক্ষণ রোদন করিলেন। শেষে শরৎসুন্দরীর পদপ্রান্তে দাড়াইয়া কহিলেন,—“দিদি, ধন্য তোমার জন্ম, ধন্য তোমার প্রেমশিক্ষা, ধন্য তোমার পুণ্য-বল—সেই বলে তুমি পূর্ণচন্দ্রকে সঙ্গে লইলে। যে দেশে সপত্নীর ভয় নাই, বিচ্ছেদ নাই, সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা নাই—সেই দেশে দুইজনে বাস করিতে চলিলে। তোমার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে? আমার দুঃখ যে, তোমার সেবা করিয়া স্বামীকে সুখী করিতে পারিলাম না।”

বৃদ্ধ পুরোহিত কহিলেন,—“মা, দুঃখ করিলে কি হইবে? একদিন ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র নিধন হইয়াছিল; রাবণের সহস্র সহস্র বংশধর হত হইয়াছিল। জন্মিলেই মৃত্যু আছে। নিয়তি কে খণ্ডন করিবে? উঠুন—বেলা হইল—অগ্নিক্রিয়া সমাপন করুন।’

যোগেশ্বরী রোদন সম্বরণ করিলেন। শাস্ত্রবিহিত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। শাটী দূরে ফেলাইয়া দিলেন, সীমন্তের সিন্দূর পুঁছিয়া ফেলিলেন। অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন। শ্বেত পট্টবস্ত্র ধারণ করিলেন। এই সময় ভাবিতে লাগিলেন,—“মহারাজ কেন সতীদাহ রাজ্য হইতে উঠাইয়া দিলেন? তাহা না হইলে আজ কেমন সুখে স্বামীর বক্ষে শয়ন করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া যাইতাম!”

শ্বেত পট্টবস্ত্রে যোগেশ্বরীকে সন্ন্যাসিনীর ন্যায় দেখাইল। আলুলায়িত কেশ পদতলে লুটাইয়া পড়িল। তাঁহার মুখ গম্ভীর। দৃষ্টি স্থির। গণ্ডযুগল ক্ষণেক লোহিত, ক্ষণেক শ্বেতবর্ণ ধারণ করিতেছিল। তাঁহাকে তৎকালে আম্রবৃক্ষের নিম্নে দেখিয়া বোধ হইল, যেন সাবিত্রী মলিন-মুখে উদাস-হৃদয়ে স্থির ও গম্ভীর ভাবে মৃত পতি সত্যবানের মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন।

দ্বাদশ দিন অতীত হইয়াছে। প্রেতোদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি যাহা করণীয় ছিল, তাহা সমুদায় সম্পন্ন হইয়াছে। রাজা নরেন্দ্রলাল বড় পীড়িত ছিলেন বলিয়া প্রভাবতী ও কৃষ্ণশঙ্কর এই সময় আসিতে পারেন নাই। আগামী কল্য তাঁহারা রাজধানীতে পৌঁছিবেন। কাপ্তান লুইস প্রতি কক্ষায় চাবি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সকল স্থানেই দিবা-রাত্রি সিপাহী পাহারা দিতেছে।

রাত্রিতে যোগেশ্বরীর চক্ষে নিদ্রা নাই। ভাবনা চিন্তায় বালিকা জর্জ্জরীভূতা হইলেন। তিনি কোন দোষ করেন নাই, অথচ ভাবি-তেছেন– সকল দোষই তাঁহার। "আমিই সোণার সংসার ছারখার করিলাম"—এই চিন্তা সর্ব্বক্ষণ অহরহঃ তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল।

আজ দ্বিপ্রহর নিশীথে তিনি মুক্ত বাতায়নে বসিয়া ভাবিতেছেন,— "আমিই সোণার সংসার ছারখার করিলাম। কেন আমি জন্মি-লাম? জন্মিলাম ত মরিলাম না কেন? জন্মিলাম ত অন্যকে সুখী করিতে পারিলাম না কেন? জন্মিলাম কি তবে পরের অনর্থ সাধনে? জন্মিয়াই ত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী সমুদায়—যে যেখানে ছিল—সক-লকেই বিনাশ করিলাম। আসিলাম রাজপুরে। ভাবিলাম এইবার সুখ হইবে। ওমা—সে সুখ কোথায়? মহারাজ শশধরের প্রাণ

হরণ করিলাম। আমি জীবিত থাকিয়া কাহাকেও সুখ দিব না, এই জন্য বুঝি, তিনি উইলে আমার নাম লিখিয়া গেলেন। তিনি তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিলেন, কিন্তু আমি কি করিলাম? অভাগিনী শরৎসুন্দরীর বক্ষ বিদীর্ণ করিলাম। পূর্ণচন্দ্রের মুখ হইতে অমৃতের আধার কাড়িয়া লইলাম। তাহাতেও ক্ষান্ত হইলাম না; শেষে তাঁহাকে অতি ভীষণভাবে হত্যা করিলাম। তাহার পর আনন্দদায়িনী মাতা কমলকুমারীকেও বিসর্জ্জন দিলাম। আর অধিক দিন এই পুরীতে থাকিলে, রাজপ্রাসাদে আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূত করিব। হয়ত প্রভাবতীর বিপদ্ ঘটাইব। যেখানে এ অভাগিণী যাইবে, সেইখানে বিপদ সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। তবে আমি কোথায় যাইব? কাহার আশ্রয় লইব? না—না—আশ্রয় লইব না। আশ্রয় লইলেই আশ্রয়-তরু উন্মূলন করিব। আর লোকালয়ে যাইব না। আমি বনচারিণী সন্ন্যাসিনী হইয়া যোগসাধনা করিব। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার পাপ গুরুতর”—

তিনি উঠিলেন। অতি শুভ্র পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। কেশ মুক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া দিলেন। হস্তে ত্রিশূল লইলেন। তিনি যৌবনে যোগিনী সাজিলেন। ধীরে ধীরে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন। নিঃশব্দে বাহির হইলেন। প্রাঙ্গণে নামিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। জন্মের মত রাজপুরী পরিত্যাগ করিলেন।

যখন তিনি সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রহরী অন্ধকারে মনুষ্যের পদশব্দ ও আকৃতি অনুমান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ‘কোন্ হ্যায়’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তিনি উত্তর দিলেন না। নদীর স্রোতের ন্যায় একভাবে চলিতে লাগিলেন। তখন সে লণ্ঠন লইয়া

দৌড়িয়া আসিল। তাঁহার পথাবরোধ করিয়া কহিল,—"তুমি কে? এ অন্ধকারে, এ নিশীথে, তুমি কে?"

যোগেশ্বরী আকর্ণ চক্ষুযুগলকে ঘূর্ণায়মান করিয়া কহিলেন,—"পথ ছাড়—আমার পথে বাধা দিও না—আমি ফিরিয়া গেলে এ রাজপুরী পুড়িয়া একেবারে ছারখার হইবে।" সৈনিক পুরুষ চমকিয়া উঠিল। তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। শঙ্খিনী, ডাকিনী, যোগিনী বলিয়া মনে হইল। তথাচ সাহস করিয়া কহিল,—"মা—তুমি কে?" তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি অলক্ষ্মী; এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাজ্যে প্রবেশ করিব—পথ ছাড়!" প্রহরী মহাভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। যোগেশ্বরী নির্ব্বিঘ্নে সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

মল্লিকা যোগেশ্বরীর মনের গূঢ় অভিসন্ধি জানিত। সেইজন্য সখীর কক্ষার নিকট এক একবার বেড়াইয়া আসিত। অতি প্রত্যূষে শূন্য কক্ষ দেখিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। শতশত লোক চারিদিকে ছুটিয়া গেল। নগরের প্রত্যেক পল্লী, প্রত্যেক রাস্তা অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু অনাথিনী যোগেশ্বরীকে কেহই দেখিতে পাইল না। জন্মের মত তিনি রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই অপ্রস্ফুটিত কুসুমকলি মরুভূমে শুকাইয়া গেল। স্বর্ণলতিকা আশ্রয়-হীনা হইয়া ছিন্নভিন্ন হইলেন। মহারাজ শশধরের এক অক্ষরে প্রকাণ্ড রাজপুরী মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

পরদিন প্রভাবতী ও কৃষ্ণশঙ্কর উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—সুখের রঘুনাথগড় গাঢ় তিমিরে আবৃত হইয়াছে; রাজপ্রাসাদ জনশূন্য প্রান্তরের ন্যায়। তাঁহারা কতক্ষণ নীরবে ক্রন্দন করিলেন।

উইলের মর্ম্মানুসারে প্রভাবতী সিংহাসনাধিকারিণী হইলেন; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতা হইয়া তাঁহার প্রাপ্য কৃষ্ণশঙ্করকে অর্পণ করিলেন। সুতরাং তিনি রাজা হইলেন।

যথাসময়ে বিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে মঞ্জুর আসিল। কৃষ্ণশঙ্কর স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। প্রভাবতী তাঁহার বামে বসিলেন। ছত্রধর মণিময় ছত্র মস্তকে ধারণ করিল। গম্ভীরভাবে অযোধ্যানাথ ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। কাপ্তান লুইস গাব উপস্থিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত মেডেল রাজার বক্ষে ঝুলাইয়া দিলেন। কৃষ্ণশঙ্কর ও রাণী উভয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিলেন। একটী মাত্র তোপ গর্জ্জিয়া উঠিল, তাহাতেই লোকে বুঝিতে পারিল যে, রাজ-দরবার শেষ হইল। রাজা নরেন্দ্রলাল কি তাঁহার স্ত্রী কেহই এ রাজ-দরবারে উপস্থিত হন নাই। পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁহারা পূর্ণচন্দ্রকে ভালবাসিতেন, কি বলিয়া তাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করিবেন? নরেন্দ্রলাল পুত্রের এই উন্নতিতে সর্ব্বান্তঃকরণে সুখী হইতে পারিলেন না।

কৃষ্ণশঙ্কর ভাবিতেছেন আর নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন।

ভাবিতেছেন,—"এ রাজ্য কাহার ছিল? কাহার মুখের অন্ন আমি গ্রাস করিলাম? নিয়তি! তোমার চক্র ভয়ঙ্কর। এই চক্রে তুমি কত রাজ্য, কত রাজমস্তক, কত প্রাসাদ চূর্ণ করিতেছ, আবার কত মস্তকে রাজছত্র ধরাইতেছ। তোমার চক্র ভয়ানক ঐন্দ্রজালিক। ভীমসিংহ, আজ তোমার গণনা সত্য হইল। আজ আমি রাজা হইলাম। তুমি জীবিত থাকিয়া সৎপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিলে, একজন অদ্বিতীয় বীর বলিয়া পূজিত হইতে।"

রমানাথ অবসরবৃত্তি গ্রহণ করিয়া রামনারায়ণ ও পদ্মমুখীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী চলিয়া গেলেন। মহারাজ কৃষ্ণশঙ্কর রায় যোগেশ্বরীর উদ্দেশে চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া একে একে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তিনি মহাশ্মশানের রাস্তা অতি প্রশস্ত করিয়া দিলেন, লৌহের রেলিং দ্বারা শ্মশানের দুই দিক্ দৃঢ় করিয়া বাঁধাইয়া দিলেন। শরৎসুন্দরীর চিতার উপর এক বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরের স্তম্ভ উত্তোলন করিলেন। স্বর্ণমসী দ্বারা লিখিয়া দিলেন,—

'শরতের পূর্ণচন্দ্র।'